প্রকাশকের নিবেদন

'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' বইখানির পরিবর্ধিত সংস্করণের দ্বিতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হলো। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে বিগত ১৯৮১ সনে। বইখানি প্রকাশে অনিবার্য নানা কারণে কিছু দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। উল্লেখ্য, প্রয়াত লেখকের অনুজ শ্রীমিহির-রঞ্জন সেনগুপ্তর সক্রিয় সহযোগিতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডের শব্দসূচি ও নির্দেশিকা বিন্যাসে ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করেছেন অমলেন্দু ঘোষ, গ্রন্থাগারিক। নানা অসুবিধার মধ্যেও ছাপাখানার সহযোগিতার কথাও স্মরণীয়। পাঠক সমাজে বইখানির প্রথম খণ্ডের মতো আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডটিও সমাদৃত হবে বলে আমাদের ভরসা। ইতি—

কলিকাতা, ১৯৮৪ ফেবরুয়ারি

বিষয় সূচি

১

মহাবিদ্রোহ : বাংলায় বিদ্রোহের পরিস্থিতি

মে মাসে বিদ্রোহীরা যখন দিল্লি দখল করে ও বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করল, সেই সময় বাংলা দেশেও ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার মতো অনেক উপকরণই ছিল। এই অভ্যুত্থানের মাত্র এক বৎসর পূর্বে ঘটেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ, যা বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার নীলচাষী ও অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে ইংরেজ সরকার, জমিদার ও নীলকরদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ জমাট বেঁধে উঠেছিল ও বিস্ফোরণের বারুদ প্রস্তুত ছিল, তাতে একটা কেন অনেকগুলো বিদ্রোহ-ই হতে পারত। প্রকৃতপক্ষে, নীলচাষীদের যে আন্দোলন মহাবিদ্রোহের পরই চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল তার প্রস্তুতি এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।[১]

কিন্তু, বাংলায় বিদ্রোহের এই অনুকূল অবস্থাতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব ও উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো কোনো ব্যক্তি বা দল ছিল না। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা বিদ্রোহের কথা বলতেন, তাঁদের এই সময় কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ শুরু করার কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় কোথাও একবার বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেলে, সেখানে একটা ব্যাপক অভ্যুত্থানের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। "রাজশাহি ডিভিসনে সব সময়ই একটা আশংকা ছিল। সমস্ত নদীয়া ডিভিসনেও কৃষ্ণনগর ও যশোহরের মধ্য দিয়ে একটা অশান্তভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্ধমান ডিভিসনেও ছোটনাগপুরের সীমানায় অর্ধবিদ্রোহ অবস্থায় ছিল। আসামেও বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছিল এবং সেখানে খুবই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হতো কিন্তু সময় থাকতেই সেখানকার ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছিল, প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং অনেককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, এবং গোপনে ও ঠিক সময়ে ইংরেজদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল। বাংলা দেশে এমন একটা জিলা ছিল না যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়ে যায়নি বা ঘোরতর বিপদের আশংকা করেনি।"[২]

১৭ই মে—মিরাট বিদ্রোহের সাতদিন পরের ঘটনা। কলকাতায় এসপ্ল্যানেড ময়দানে যে ২৫-তম বাহিনী অবস্থান করছিল, তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি ফোর্ট উইলিয়ামের ২য় ও ৭০-তম বাহিনীর সঙ্গে ঐ দুর্গ দখল করে কলকাতায়

বিদ্রোহ ঘোষণা করবার কথা আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দমদম থেকে ৫৩-তম ইংরেজ বাহিনীকে নিয়ে এলো এবং পরদিন বিদ্রোহভাবাপন্ন সিপাহিরা কিছু করবার পূর্বেই ২৫-তম বাহিনীকে নিরস্ত্র করে বরখাস্ত করা হলো। কয়েকদিন পর ৭০-তম বাহিনীকেও এইভাবে নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হলো।

২৫ মে তারিখে ব্যারাকপুরে ৭০-তম ও ৪৩-তম সিপাহি বাহিনী দরখাস্ত করে সরকারকে জানালো যে, দিল্লির বিদ্রোহী সিপাহিদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে যে কোনো সময়ে তারা যাত্রা করতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, রাজভক্তির এরকম উদাহরণ দেখে সরকার খুবই পুলকিত হয়েছিল। জুন মাসের প্রথম দিকে আবার এইসব সিপাহিরা সরকারের কাছে আদেবন করল যে, তাদের এখনই দিল্লিতে পাঠানো হোক, চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি তাদের নেই। বাস্তবিকই সরকার যখন এই দুটি সিপাহি বাহিনীকে এনফিল্ড রাইফেল দ্বারা সজ্জিত করে দিল্লি পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল, ঠিক সেই সময় ১৩ জুন সন্ধ্যার সময় জেনারেল হিয়ার্সে গভর্নর-জেনারেলকে জরুরি খবর পাঠালেন, বিশ্বস্তসূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন যে, ব্যারাকপুরের সিপাহিরা ঐ রাত্রেই বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই রাত্রে কলকাতা ও চুঁচুড়া থেকে ইংরেজ সৈন্যদের দুটি বাহিনী ব্যারাকপুর নিয়ে যাওয়া হয় ও পরের দিন প্রত্যুষে যথারীতি কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে সিপাহিদের নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হয়।

ব্যারাকপুরে যখন ১৪ জুন তারিখে সিপাহিদের নিরস্ত্র করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কলকাতায় ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের ভেতর মুহূর্তের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল যে, ব্যারাকপুরের বিদ্রোহী সিপাহিরা কলকাতা আক্রমণ করতে আসছে। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে একটা ভয়ংকর আতংকের সৃষ্টি হলো। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উন্মাদের মতো ফোর্ট উইলিয়াম ও বন্দরের জাহাজগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই কাজে বড় বড় সরকারি অফিসাররাই ছিলেন অগ্রণী।[৩] এই জনরবের ফলে কলকাতায় ইংরেজ বীরপুরুষদের যে কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তা একজন সমসাময়িক ইংরেজ লেখকই সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন :

"কলকাতার সর্বত্রই অত্যধিক আতংক বিশৃংখলা ও হতাশা, ভয়ংকর ভয়ংকর জনরব চারদিকে প্রচারিত হচ্ছে। সকলেই বিশ্বাস করে বসে আছে যে, ব্যারাকপুরের সিপাহিরা দ্রুতবেগে কলকাতার দিকে ছুটে আসছে, শহরতলিগুলিতে সমস্ত লোক বিদ্রোহ করছে, অযোধ্যার নবাব তাঁর লোকজন নিয়ে গার্ডেনরিচ অঞ্চলে লুঠ করছেন, ইত্যাদি। সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারিরাই এই কাজে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারিরা ও গভর্নর-জেনারেলের কাউনসিলের সভ্যরা ছুটোছুটি করে পরস্পরের ঘাড়ের উপর পড়ছিলেন; কেউ

বা পিস্তলে গুলী ভরতে ব্যস্ত, কেউ বা দরওয়াজার ব্যূহ রচনা করছিলেন; কাউনসিলের সভ্যরা তাঁদের পরিবার সমেত গৃহত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় নিচ্ছিলেন; এবং তাদের একধাপ নিম্নস্তরের অথচ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁদের উপরওয়ালাদের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে উর্ধ্বশ্বাসে ফোর্টের দিকে দৌড়তে লাগলেন, যদি কোনো মতে ফোর্টের কামানগুলির নিচে একটু মাথা গোঁজার স্থান পাওয়া যায়। সর্ব-রকমের ও রংবেরঙের ঘোড়াগাড়ি, পালকি ইত্যাদি রিকুইজিশান করে রিফিউজি-দের কাল্পনিক হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শহরতলিগুলিতে দেখতে দেখতে প্রত্যেক খ্রীস্টানের বাড়ি খালি হয়ে গেল। তখন এই অবস্থায় মাত্র আধ ডজন খানেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক শহরের তিন চতুর্থাংশ অনায়াসে ধ্বংস করে দিতে পারত।"[৪]

কলকাতায় ইংরেজ সমাজে এই প্রকার অশোভন আতংকের একটা কারণ ছিল। মিরাট ও দিল্লির ঘটনায় ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, ভারতবর্ষে তাদের সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ নেই। সকল ভারতবাসীই প্রত্যক্ষ কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে তাদের শত্রু। জুন মাসে যখন বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ এত ব্যাপক দেখে লর্ড ক্যানিং খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গভর্নর-জেনারেলের কাউনসিলের সভ্য গ্র্যান্ট ক্যানিং-কে বারবার জানাতে লাগলেন, কলকাতার আশে-পাশে যেসব সিপাহি বাহিনী আছে তারা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়; দমদমে সিন্ধু প্রদেশের আমিরের লোকেরা, গার্ডেনরিচের অযোধ্যার নবাবের লোকেরা, কলকাতার মুসলমানরা এবং 'এই মহানগরীর সর্বশ্রেণীর বদমাশরা' ভয়ানক ভীতির কারণ। "বিদ্রোহ দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করছে এবং ক্রমশই আমাদের নিকট এসে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমনকি সামান্য একটা রাস্তার গণ্ডগোলের ফলেও এই রাজধানীতে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেতে পারে। শুধু বাংলাতেই নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে"।[৫]

ইংরেজদের সৌভাগ্য যে, সিপাহিদের সব কটা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা পর পর ব্যর্থ হয়ে গেল এবং জনসাধারণও ইংরেজদের এই আতংকের মুহূর্তে অগ্রসর হয়ে এলো না। ভারতবাসীর দুর্বলতার এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্রথমেই অযোধ্যার নবাব তাঁর মন্ত্রীদ্বয় আলি নকী খান ও টিকত রাওকে গ্রেফতার করে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী করে রাখল। আরো বহুসংখ্যক লোক এইভাবে বন্দী হলেন।[৬]

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে অযোধ্যার রাজা মানসিংহ ও কয়েকজন তালুক-দার কলকাতায় এসে অযোধ্যার নবাব ও কয়েকজন সিপাহি প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করার জন্যে একটা প্রেস-আইন পাশ করা হলো, যার দ্বারা সরকার যে-কোনো ছাপা লেখা বাজেয়াপ্ত করতে পারত এবং যেসব প্রেসে সংবাদপত্র ও বই ছাপানো হতো, তাদের সরকারি লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হলো। এই প্রেস-আইনের জোরে সরকার 'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'দুরবীন', 'ভাস্কর', 'সুলতান-উল-আকবর' পত্রিকাগুলির মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের রাজদ্রোহ প্রচারের জন্যে সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্ত করল। জুলাই মাসের মধ্যে 'গুলশান-ই-নও-বাহার' ও আরো কয়েকখানা পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হলো। কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রভাবশালী 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকাও বন্ধ করে দেওয়া হলো। সেপটেম্বর মাসে 'হারকুরু' পত্রিকাকেও বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হলো। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই যে বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা সংবাদপত্রের উপর সরকারের এই প্রচণ্ড দমন-নীতি থেকেই বেশ বোঝা যায়।

বহরমপুরে ২৩ জুন একটা গুজব রটল যে, সেখানকার সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে। "মুর্শিদাবাদ শহরে রাজদ্রোহমূলক কতকগুলি প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সৈন্য সেখানে পাঠানো হলো। "সরকারকে নবাব সাহায্য করলেন ও আশংকা দূরীভূত হলো।" বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাসি করে ম্যাজিস্ট্রেট অনেক মারণাস্ত্র ধরতে পেরেছিলেন।[৭]

এই সময়ে আরো অনেক স্থানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। "যশোহর জেলার অনেক স্থানে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। সেপটেম্বর মাসে জেলার নীলকরদের মধ্যে ১০০টা বন্দুক বিতরণ করা হলো। বারাসতে অযোধ্যার নবাবের কয়েকজন অনুচরকে গ্রেফতার করা হলো।"[৮] ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের পর যে ৩৪-তম বাহিনীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তারই তিনটি বাহিনী কোম্পানি (৩০০ সিপাহি) চট্টগ্রামে ছিল পাণ্ডের ফাঁসির ছ-মাস পরে ১৮ নভেম্বর এই সিপাহিরা সেখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। "তারা ধনাগার লুণ্ঠন করে ও জেল ভেঙে কয়েদিদের খালাস করে, শহরের অধিবাসীদের কোনোরকম ক্ষতি না করে, ত্রিপুরা পাহাড়ের ধার দিয়ে সিলেট হয়ে কাছাড়ের দিকে চলে গেল এবং সেখানে কয়েকজন ধরা পড়ল, আর প্রায় সকলেই গুর্খা বাহিনী ও কুকি স্কাউটদের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হলো"।[৯]

ত্রিপুরার রাজা ঈশানমানিক্য বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে ইংরেজ সরকার খবর পেয়েছিল, কিন্তু কোনো সঠিক প্রমাণ তারা পায়নি। কাছাড়ে যাবার পথে সিপাহিরা ত্রিপুরা ও সিলেটের জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল।

সিপাহিদের লক্ষ্য ছিল মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চল দখল করা। সেই দিকে যাবার পথে সিলেট থেকে ১০০ মাইল দূরে লাটু নামক স্থানে মেজর বিং-এর

অধীনে একটা ইংরেজ বাহিনী সিপাহিদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। লাটুর যুদ্ধে মেজর বিং সমেত ইংরেজদের পক্ষে অনেক লোক নিহত হয়েছিল। লাটুর ব্যূহ ভেদ করে বিদ্রোহীরা কাছাড়ে পৌঁছলো ও সেখানে ২৩ ডিসেম্বর, ১২, ২২ ও ২৬ জানুয়ারিতে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করলো।[১০]

এই সময়ে মণিপুরের রাজকুমার চাইহুম (নরেন্দ্রজিত) বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এর ফলে মণিপুরের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। ইংরেজরা মণিপুরের আরো কয়েকজন রাজকুমার এবং দেওয়ান রাণা সিংকে বন্দী করলো ও তাঁদের আলিপুর সেনট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল। আলিপুর জেলে তখন বহু রাজবন্দী ছিলেন।

এতগুলি যুদ্ধে ৩০০ সিপাহিদের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হয়েছিল। অবশিষ্টরা রাজকুমার নরেন্দ্র সিংকে নিয়ে মণিপুর রাষ্ট্রে প্রবেশ করলো। লক্ষ্মীপুর নামক স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের শেষ যুদ্ধে তারা প্রায় সকলেই নিহত হলো। যে কয়জন বেঁচে ছিল তারা পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। "তারা কোনো রকমেই খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারছিল না। তাদের কয়েকজনকে মৃত অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল। অনাহারেই যে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাকিদের কুকি স্কাউটরা মেরে ফেলেছিল। সিপাহিদের মারবার জন্যে কুকিদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"[১১]

সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, লাটুর যুদ্ধের সময় Sylhet Light Infantry-র ব্যবহার খুবই প্রশংসাজনক হয়েছিল। "এই বাহিনীর অর্ধাংশ ছিল হিন্দুস্থানি সিপাহি, বাকি অর্ধাংশ ছিল গুর্খা। হিন্দুস্থানিদের তোষামোদ করে বা বিদ্রূপ করে বিদ্রোহীরা তাদের দলে টানবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হিন্দুস্থানিরা গুলী ছুঁড়ে তার জবাব দিয়েছিল।"[১২] গঙ্গারাম ভিস্তি নামক একজন গুর্খা জমাদারকে ইংরেজরা খুব প্রশংসা করেছিল। লাটুর যুদ্ধের পর সে ১৬ জন লোক নিয়ে ১০ জন বিদ্রোহীকে অনুসরণ করেছিল; জঙ্গলের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে যখন তারা বিশ্রাম করছিল, তখন সে তাদের ৮ জনকে হত্যা করেছিল। "বিদ্রোহীরা তখন সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তাদের অনেকেই কুকিদের দ্বারা নিহত হয়েছিল - কুকিদের বলা হয়েছিল যে, সিপাহিদের হত্যা করতে পারলে তারা পুরস্কৃত হবে। একজন ছোট কুকি সর্দার খুব কম করে ১২ জনকে হত্যা করেছিল। অনেককে তারা বন্দী অবস্থায় ধরে এনেছিল; এই বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও শিশুও ছিল। বাকি সকলে এত অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছিল যে তা লিপিবদ্ধ করাও বেদনাদায়ক। তাদের মধ্যে কয়েকজন নাকি তাদের শিশুদের আর উপবাসী দেখতে না পেরে তাদের গুলী করে মেরেছিল। কয়েকজনকে জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল যারা অনাহারে মারা গিয়েছিল। যে তিনটি কোম্পানি চট্টগ্রাম ছেড়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র

৩ জন কি ৪ জন ছাড়া আর সকলেই নিহত অথবা বন্দী হয়েছিল।"[১৩]

চট্টগ্রামের সিপাহিদের বিদ্রোহের ফলে নোয়াখালি, কুমিল্লা, বরিশাল জেলার ইংরেজ কর্মচারি ও স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে কী ভয়ানক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল এবং জমিদাররা কিভাবে তাদের লোকজন ও অর্থ দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল, তার কিছু-কিছু বিবরণ তখনকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাইমন ২ হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে বিদ্রোহীদের জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। "এইসব সশস্ত্র লোকদের ভুলুয়ার রাজারা (প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র) পাঠিয়েছিলেন। ভুলুয়ার রাজারা তাঁদের শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা পাকা কাছারি বাড়ি আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিলেন—এটাই আমাদের দুর্গ হলো।"[১৪]

'হিন্দু' নামধারী রাজভক্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীটি এই জমিদারদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "এই রাজাদের বাংলা প্রদেশের উত্তরে ও দক্ষিণে সর্বত্র জমিদারি রয়েছে ও বিদ্রোহের ফলে অন্য রাজাদের চাইতে তাঁদের ক্ষতি বেশি হয়েছে। কিন্তু, তাঁদের জমিদারিতে যখনই কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে তৎক্ষণাৎ তাঁদের কর্মচারিরা সরকারের সাহায্যে তা দমন করেছে। সরকার মুক্তকণ্ঠে তাঁদের সাহায্যের কথা স্বীকার করেছে এবং সম্প্রতি সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি যে, একস্থানে সরকারি কর্মচারিরা যেখানে ব্যর্থ হলেন সেখানে এই রাজাদের একজন নায়েব অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ও তার জন্যে সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন।"[১৫]

চট্টগ্রামে যখন বিদ্রোহ হয় তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট লান্স সাহেব মফঃস্বলে ছিলেন। সিপাহিরা চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পর তিনি এইসব জমিদারদের লাঠিয়াল বরকন্দাজ নিয়ে বীরদর্পে শহরে প্রবেশ করেছিলেন।[১৬]

এই সময় ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ অঞ্চলে ফরাজিরা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং বিদ্রোহের সমর্থনে তাদের জনসভাও হয়েছিল; মৌলভি আবদুল শোভান ও রেয়াসাত আলি খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ফরিদপুরের বিখ্যাত ফরাজি নেতা দুদু মিঞাকে রাজবন্দী হিসেবে আলিপুর জেলে রাখা হয়েছিল। জনসাধারণকে উত্তেজিত করার অপরাধে বীরভূমে রঞ্জন শেখ ও মেদিনীপুরে বৃন্দাবন তেওয়ারির ফাঁসি হয়েছিল। হুগলি জেলের ডাক্তার কুবেরচন্দ্র রায় ষড়যন্ত্রের জন্যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৭] জলপাইগুড়িতে যখন সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল তখন ২০০ ভুটিয়া তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং আরো অনেকের নিকট থেকে তারা সাহায্য পেয়েছিল।[১৮] বাঁকুড়া জেলার শাসকরা এই ভেবে ভীত হয়ে উঠেছিল, যে কোনো সময়ে ঐ জেলার সাঁওতাল ও চোয়াড়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।[১৯] বাংলার জেলা-দফতরগুলিতে অনুসন্ধান করলে এই ধরনের অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আসামের সারুং রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আসামীদের উত্তেজিত করেছিলেন। জোরহাটের সিপাহিরা তাঁকে সমর্থন করবে বলেছিল। কন্দর্পেশ্বরের দেওয়ান মণিরাম দত্তই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়, মণিরামের ফাঁসি হয় ও কন্দর্পেশ্বরকে আলিপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়।[২০]

চট্টগ্রামের বিদ্রোহের চারদিন পর ২২ নভেম্বর, ১৮৫৭, ঢাকা দুর্গে যে ২০০ সিপাহি ছিল, তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই সময়ে ঢাকা শহরে আরো প্রায় ২০০ ইংরাজ নাবিক, সৈন্য ও ভলান্টিয়ার ছিল। চট্টগ্রামের বিদ্রোহের খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যে যখন সিপাহিদের নিরস্ত্র করতে যায়, তখন সিপাহিরা দুর্গের কামান দুটি দখল করে ইংরেজদের উপর প্রতি-আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে ৪১ জন সিপাহির মৃত্যু হয়, ২০ জন আহত সিপাহি বন্দী হয়। অবশিষ্ট সিপাহিরা দুর্গ ত্যাগ করে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে গেল। নদী পার হবার সময় আরো কয়েকজন নিহত হলো। যে কয়জন বাঁচতে পেরেছিল তারা ময়মনসিংহ, রংপুর, উত্তর-বিহার অতিক্রম করে অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।[২১]

"ইতিমধ্যে ঢাকা জেলার মধ্যেও করমত আলি নামক একজন লোকের নেতৃত্বে ফরাজিদের মতো একটি মুসলমান সম্প্রদায় বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছিল। ঢাকা শহরে ইংরেজ সরকার খাজা আবদুল গনি ও আবদুল আহমদ খানকে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্যে পুরস্কৃত ও প্রশংসা করেছিল।"[২২]

পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সরকারের অবস্থা কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, তা সরকারি রিপোর্ট থেকে খানিকটা বোঝা যায়। "ঢাকা ডিভিসনে গণ্ডগোল বাধাবার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ দলের অভাব ছিল না। ফরাজিদের প্রধান কেন্দ্র ফরিদপুরে ও বাখরগঞ্জে প্রচুর দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী লোক ছিল। সিলেটের Sylhet Light Infantry-র অনেককেই খুব বিপজ্জনক বলে মনে হতো, কিন্তু যখন সত্যই পরীক্ষার সময় এলো, তখন এই বাহিনীই আমাদের পূর্ব সীমান্তকে ভীষণ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সব থেকে বিপজ্জনক ছিল ঢাকা শহর, যেখানকার প্রচুর মুসলমান জনসাধারণ সরকারের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। ··সিলেট ও কাছাড় জেলা দুটি, সাহায্যকেন্দ্র থেকে দূরত্বের জন্যেও বটে, উপরন্তু ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার জন্যেও বটে, আমাদের খুবই গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের সম্মানের হানি হলে মণিপুরেও নানারকম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারত, এবং সত্যসত্যই যখন ৩৪-তম বাহিনীর বিদ্রোহী সিপাহিরা কাছাড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, তৎক্ষণাৎ মণিপুর সিংহাসনের কয়েকজন দাবিদার তাদের দলবল নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং যদি বিদ্রোহীদের সফলতার কোনো সম্ভাবনা দেখা যেত তাহলে এইভাবে

বিদ্রোহ আরো বেড়ে যেত।...সংক্ষেপে, যদি Sylhet Light Infantry বিশ্বস্তভাবে না লড়ত, যা আমাদের নিকট আশাতীত ছিল,...তাহলে একটা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পূর্ব-ভারতের সমস্ত জেলাগুলিই সম্পূর্ণরূপে বিশৃংখল হয়ে পড়ত, এবং যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এদের দমন করার মতো সৈন্য আমরা জোগাড় করতে পারতাম, তাহলেও শান্তি পুনস্থাপন করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াত।"[২৩]

উপরের এইসব ঘটনাগুলি থেকে একটা কথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, মহাবিদ্রোহের সময় বাংলা দেশে বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল— গ্রামের কৃষক ও শহরের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ জমাট বেঁধে ছিল। স্থানীয়ভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়টা ছোট ছোট বিদ্রোহ ঘটেছিল, তাতেই ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। নেতৃত্ব পেলে বাংলা দেশেও বিরাট আকারে গণবিদ্রোহ ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। বাংলার একমাত্র জমিদারশ্রেণীই তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে ও তাদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বজায় রাখার জন্যে মহাবিদ্রোহের প্রথম থেকেই তাদের বিপদাপন্ন প্রভুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ও তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল।

নি র্দে শি কা

১. শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৮০ সনে *Amrita Bazar Patrika*-তে নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, নীল বিদ্রোহের নেতা বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস মহাবিদ্রোহের সময়েই তাঁদের আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন।—"It was just at the time when Nana Saheb was organising his revolt. Nana's efforts were directed against the Government, those of the two Biswases against the planters" (Sisir kumar Ghosh, ***A Story of Patriotism***, Madras, 1917, p. 76)

২. Buckland : *Bengal Under Lt. Governors*, vol 1, pp. 67-68

৩. "[English] men straining their manhood by hiding themselves in dark places ...some took their passage to England...the vast and varied population of the native suburbs and bazars would rise against the white. What

had been done at Meerut and Delhi might be acted over again at Calcutta on a larger scale and with more terrible effect." (Kaye, vol. 2, pp. 114-15). "The ship and steamers in the rivers have been crowded with families seeking refuge from the attack, which was mightly expected, and everywhere a sense of insecurity prevailed." (*Friend of India*, 1858 May)

৪. *Red Pamphlet*, p. 105
৫. Kaye, vol. 3, p. 11
৬ Martin, vol. 3, p. 70
৭. Buckland, vol. 1, p. 134
৮. *Ibid*, p. 136
৯. *Imperial Gazetteer* of *India : Eastern Bengal and Assam*, p. 396
১০ *Ibid*, p. 443
১১. *Assam District Gazetteer : Sylhet*, p. 61, ইতিপূর্বে কুকিরা কয়েকবার বিদ্রোহ করেছিল—১৮২৬, ১৮৪৪ আর ১৮৪৯ সনে। কুকি বিদ্রোহগুলি দমন করার জন্যে হিন্দুস্তানি সিপাহিদেরই ইংরেজরা ব্যবহার করেছিল। ১৮৫৭ সনে ইংরেজরা কুকিদের মধ্যে প্রচার করেছিল যে এই হিন্দুস্তানি সিপাহিরাই তাদের শত্রু।
১২. Buckland. vol. 1, p. 148
১৩. *Ibid*, p. 150
১৪. *Englishman*, 3 Dec. 1857
১৫. *Hindu : Mutinies and the people*, p. 100
১৬. *Englishman*, 14 Dec. 1857
১৭. Choudhury : *Civil Resistance* , pp. 202-3
১৮. *Imperial Gazetteer : Eastern Bengal and Assam*, p. 323
১৯. *Birbhum District Gazetteer*, p. 41
২০. S. B. Chaudhury : *Civil Rebellion*..., p. 203
২১. *Ibid*, pp. 204-5
২২. Buckland, vol. I, pp. 143-44
২৩. *Ibid*, pp. 141-42

২

মহাবিদ্রোহ : বাংলার জমিদার ও বুদ্ধিজীবী

দিল্লিতে বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা মাত্রই ১৫ মে তারিখে বাংলার কয়েকজন জমিদার কলকাতায় এক সভা করে ইংরেজ সরকারকে তাঁদের আনুগত্য জানিয়েছিলেন এবং সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সভায় শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং সেখানে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বর্ধমানের মহারাজা, কৃষ্ণনগরের মহারাজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২১ মে তারিখে জমিদারদের সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন তীব্র ভাষায় সিপাহিদের নিন্দা করল এবং ইংরেজদের সাহায্য করার জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করল।[১] ১৭ জুন হুগলি জেলার ৫০ জন জমিদার মহাজন উত্তরপাড়ায় এক সভা করে জানালেন, যদিও ব্যারাকপুরের দুটি সিপাহি বাহিনীকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তবু সেইসব সিপাহিরা কোনো কারণে তাদের দেশে ফিরে যাচ্ছে না; যদি এইসব সিপাহিরা আক্রমণ করে ও জনসাধারণ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে একটা ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এই জমিদাররা সরকারের নিকট আবেদন করলেন যে, এক রেজিমেণ্ট ইংরেজ সৈন্য শ্রীরামপুরে রাখা হোক,—"আমরা যারা জমিদারি পেয়েছি, এতদ্দ্বারা সরকারকে জানাচ্ছি যে, আমরা সৈন্যবাহিনীতে রিক্রুট করার জন্যে লোক জোগাড় করতে প্রস্তুত আছি।[২] রাজশাহি, বাঁকুড়া, শ্রীহট্ট, শান্তিপুর, বারাসত ও আরো অনেক স্থানে জমিদারদের এইরূপ সভা হয়েছিল।

ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান ও নদীয়ার মহারাজাদের নেতৃত্বে বাংলার ২৫০০ জমিদার, কম্প্রাডর ও বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত বড়লাট ক্যানিং-এর নিকট এক স্মারকলিপিতে বলেছিলেন যে, ক্লাইভ যখন পলাশিতে মুঘলদের বিরুদ্ধে (ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নয়!) লড়েছিলেন তখন তাঁদেরই (অর্থাৎ জমিদারদেরই) পূর্বপুরুষরা ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন এবং সেই ঐতিহ্য বহন করেই "তাঁরা শাসকদের সঙ্গে নিজেদের এমন একাত্ম করে ফেলেছেন যে, বিপথগামী সিপাহি

ও দেশবাসীরা ইংরেজদের প্রতি যে রকম নিষ্ঠুর আচরণ করছে, ঠিক সেই রকম নিষ্ঠুরভাবেই স্ত্রী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে বাঙ্গালিদের প্রতিও ব্যবহার করছে।"[৩]

বাংলার জমিদার-কন্ট্রাক্টররা সরাসরিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে না নামলেও নানাভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল, বিশেষ করে ঋণ দিয়ে ও রসদ জুগিয়ে। বাংলার কৃষকরা বেশি মূল্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সরকারকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, বলদ, গাড়ি ইত্যাদি সরবরাহ করছিল না। কৃষকদের এই রকমের অসহযোগ ভাঙার জন্যে সরকার একটা Impressment Act পাশ করেও যখন বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারল না, তখন জমিদাররাই জোর-জবরদস্তি করে কৃষকদের নিকট থেকে এইসব জিনিসগুলি সংগ্রহ করেছিল।

বিদ্রোহের সময় নর্টন মাদ্রাজের 'মাদ্রাজ এথেনিয়াম' পত্রিকায় ও তাঁর পুস্তক 'টপিক্স ফর ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান'-এ লিখেছিলেন যে, বাঙালিরা সরকারের বিরোধী ও তাদের রাজভক্তি কেবলমাত্র মৌখিক। তার জবাবে, 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক বাঙালি পরিচালিত কলকাতার একখানি ইংরেজি পত্রিকা, ১৮৫৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি যা লিখেছিল তা থেকে বাংলার জমিদার ও কৃষক উভয়েরই ভূমিকা স্পষ্ট বোঝা যায় :

"মিঃ নর্টন বাঙালিদের নিন্দা করে খুব অন্যায় করেছেন। তিনি লিখেছেন—'এখানে সেখানে দু-একজন বাঙালি নেটিভকে দেখতে পাওয়া যায় যারা আমাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ভয়ানক বিপদের সময়, তাদের কেউ কি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে ?... তারা বিপদের ধার কাছ দিয়েও যায়নি, তারা কোনোরকম কাজে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসেনি, তারা বিনা ইম্প্রেসমেণ্ট আইনে আমাদের কোনো গোরুর গাড়ি ইত্যাদি দেয়নি ; তারপর দিল্লির পতনের পর রাজভক্তি প্রকাশ করা মন্দ চালাকি নয়, আর তার ভাষাই বা কী রসালো। কিন্তু সত্য ঘটনা হচ্ছে যে, এইসব বিবৃতি ও মানপত্রগুলি নিছক ভণ্ডামি মাত্র।'... মিঃ নর্টনের মত একেবারেই ভ্রান্ত।... মিঃ নর্টন যদি ইম্প্রেসমেণ্ট আইনের দ্বারা সজ্জিত হয়ে বাংলার যে কোনো একটি গ্রামে যেতেন, তাহলে নিশ্চয়ই দু-একটা ভাঙা গাড়ি ও কানা বলদ জোগাড় করতে পারতেন, কিন্তু একটাও কার্যোপযোগী গাড়ি কিংবা বলদ পেতেন না। এইরূপ অবস্থা বুঝতে পেরে গভর্নমেণ্ট আর ইম্প্রেসমেণ্ট-আইন ব্যবহার করেন নি। সরকার জমিদারদের কাছে আবেদন করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্তির সঙ্গে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁরা গাড়ি ও গোরুর মালিকদের টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাদের পরিবারদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাদের অগ্রিম টাকা দিলেন এবং আরো অনেক প্রলোভন দেখালেন, যা একমাত্র জমিদাররাই করতে পারেন। এর ফল হলো এই যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রানীগঞ্জে ৭ হাজার

গাড়ি জমায়েত করে ফেললেন। কলকাতার ইংরেজরা যারা এত বড় বড়কথা বলেছে, তারা কি একটাও ঘোড়া কিংবা গাড়ি দিয়েছিল? দিয়েছিল বলে আমরা কোনোদিন শুনিনি।...বাংলার জমিদাররা তাদের প্রত্যেকটি হাতি সরকারকে বিনা পয়সায় ছেড়ে দিয়েছিল; আমরা এমন উদাহরণও জানি যে, ইংরেজরা তাদের হাত দিতে অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেকেই জানেন যে, ঢাকায় যখন বিদ্রোহ হয় তখন জমিদাররা কিভাবে লোকজন নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন।...তাঁদের ক্ষমতায় যা ছিল তার দ্বারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একশো বছরের ইংরেজ রাজত্বে বাংলা দেশে (এবং মোটামুটি বম্বে ও মাদ্রাজেও) ইংরেজের আওতায় তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে এক শ্রেণীর লোক – বণিক, মহাজন, ব্যবসাদার, বেনিয়ান, দালাল, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি – প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে উঠেছিল, যে শ্রেণীর লোককে বলা হয় কম্প্রাডোর বুর্জোয়াজি, অর্থাৎ যারা বিদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড় হয়ে গড়ে ওঠে, নিজেদের স্বাধীন পদ্ধতিতে নয়। এরা দেশি মাল বিদেশি বণিকদের সরবরাহ করত, আর বিদেশি মাল ভারতের বাজারে চালু করত। এরা ছিল বিদেশিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এদের কোনো নিজস্ব স্বাধীন সত্তা না থাকায় এই শ্রেণীর লোক প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। বাংলার কম্প্রাডোর বুর্জোয়াজির আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এদের অধিকাংশই ছিল আধা-বুর্জোয়া, আর আধা-জমিদার। ব্যবসায় কিছু টাকা করেই এরা জমিদারি কিনে বসত, আবার এই জমিদারির টাকাই ব্যবসায়ে খাটাত। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে, "সেকালে যত বড়লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙালী আগেই বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পায়। এই শ্রেণীর বাঙালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানীর বড় বড় চাকরদের বেশ দহরম মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল।... ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে যে শ্রেণীর বড়লোকদের সৃষ্টি হ'ল তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা বলেই গণ্য করতে লাগল। কোনো দিন ইংরেজ-দের স্বার্থে ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে এ তারা তখন ধারণাই করতে পারে নি।"[৪] সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এই শ্রেণীই হয়ে দাঁড়ালো ভারতের উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক।

ইংরেজ শাসনে বাংলার জমিদাররা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অর্থ-নৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই লাভবান হয়েছিল—এর পূর্বে ভারতীয় শাসনে তারা এত লাভবান কোনো কালেই হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে ইংরেজ শাসন

ছিল এদের জন্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এই অর্থনৈতিক কারণেই, নিজেদের শোষণমূলক শ্রেণীস্বার্থেই—কোনো প্রগতিশীল চিন্তা বা আদর্শের জন্যে নয়—সাতান্ন-র রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজের অধীনতাকেই তারা শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছিল। তারা তাদের শ্রেণীপ্রসূত সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা বুঝতে পেরেছিল যে বিদ্রোহীরা জয়ী হলে দেশের সাধারণ স্বার্থ বিরোধী তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা শুধু জমির মালিকই হলোনা খাজনা ছাড়াও তারা যথেচ্ছ অবৈধ আবওয়াব আদায় করারও অধিকার পেল, এবং কৃষকদের হর্তা-কর্তা বিধাতা হলো। সরকারকে তাদের দেয় রাজস্ব ৩ কোটি টাকা চির-কালের জন্যে স্থির থেকে গেল। কৃষকদের নিকট থেকে জমিদাররা যত খুশি বেশি খাজনা ও আবওয়াব আদায় করতে লাগল।[৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পর ৫০ বছরের মধ্যে বাংলার জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় গৃহশিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে. অধিকাংশ জনসাধারণকে সম্পূর্ণ-ভাবে কৃষিনির্ভরশীল হয়ে পড়তে হলো। এর ফলে জমির জন্যে প্রতিযোগিতা ও জমির ওপর চাপ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জমিদাররা তাদের শোষণের মাত্রা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দিল। ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতীয় রীতি অনুসারে খুদকশ্‌ত প্রজাদের বংশানুক্রমে চাষের ও বাসের জমির উপর অধিকার ছিল। তা থেকে জমিদাররা তাদের বঞ্চিত করতে পারত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সে নিয়ম আর রইল না, সুতরাং কৃষক উচ্ছেদ করা জমিদারের পক্ষে খুব সহজ হয়ে গেল। প্রাচীন ব্যবস্থায় জমিদাররা কৃষক-দের নির্মমভাবে শোষণ করত বটে, কিন্তু সে সময়ে কতকগুলি সামাজিক কর্তব্যও তাদের পালন করতে হতো। তাছাড়া, বেশিরভাগ জমিদারই তখন গ্রামে বাস করত, কাজেই গ্রামের রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের নিজেদের স্বার্থেই দৃষ্টি দিতে হতো। প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ভেঙে দিয়ে ইংরেজরা তাদের রাজত্বের সুদৃঢ় সামাজিক স্তম্ভ হিসেবে একটা কর্তব্যহীন, দায়িত্বহীন সম্পূর্ণ পরশ্রমজীবী (parasitic) সামন্তশ্রেণী গড়ে তুললো।

জমির বর্ধিত রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হবে বলে ও আরো নানা কারণে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু প্রধানত রাজনৈতিক কারণে তাঁরা ঐ প্রথা চালু করেছিলেন। এই আইন প্রণয়ন করার সময় কর্ণওয়ালিস বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা গড়বার জন্যে সব থেকে সুদৃঢ় ভিত্তি—"the finest basis on which we can build our political security"। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) জমিদারদের পরজীবী বলেই ঘৃণা করতেন, কিন্তু এই ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। মহাবিদ্রোহ

ঘটবার ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যদি ভারতে কখনো বিপ্লব ঘটে তাহলে এই শক্তিশালী জমিদাররা তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যেই ব্রিটিশ শাসনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে।[৬]

বেন্টিঙ্ক কোনো অত্যুক্তি করেন নি। ১৮৫৭ সনে বিদেশি শাসন ও শোষণের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্যে জাতীয় মহাবিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার জমিদাররা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজ সরকারকে রক্ষা করার জন্যে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। "১৮৫৫ সনে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজা ইংরেজ বাহিনীকে যানবাহন ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৫৭ সনে সিপাহি বিদ্রোহের সময় মহারাজা তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি সরকারকে প্রচুর হাতি ও গোরুর গাড়ি দিয়েছিলেন এবং বর্ধমান থেকে কাটোয়া ও বর্ধমান থেকে বীরভূম পর্যন্ত সব রাস্তাঘাটগুলি আমাদের জন্যে নিরাপদ রেখেছিলেন, যার ফলে রাজধানীর সঙ্গে বহরমপুর ও বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজিত অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ও খবরাখবর রাখতে ব্যাঘাত ঘটেনি।" অন্যান্য জমিদাররাও তাই করেছিল।[৭]

এইসব ইংরেজ সৃষ্ট ও ইংরেজপুষ্ট বাংলার জমিদাররা যে তাদের শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করবে, তা তো স্বাভাবিক। এই ঘটনা থেকে কোনো কোনো ইতিহাসজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী এই সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই সময়ে সব বাঙালিরাই রাজভক্ত ছিল ও বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করেছিল। এ ধারণা যে একেবারেই সত্য নয়, তা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখতে পাবো।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ১৮৫৭ সনে বাংলার জমিদার এবং অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের তালুকদারদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য ছিল। অযোধ্যার তালুকদাররা সবেমাত্র পরাধীন হয়েছিল, স্বাধীনতার আস্বাদ তখনো তারা ভুলে যেতে পারেনি; তখনো তারা ইংরেজের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেনি, ইংরেজ শাসনকে তখনো তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মানতে শেখেনি। তাই যখন তারা ইংরেজ শাসনে অপমানিত ও বঞ্চিত বোধ করল তখন তারা বিদ্রোহ করতে পেরেছিল।

আমরা আর এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, কিভাবে চিরস্থায়ী জমিব্যবস্থার ফলে কম্প্রাডর শ্রেণী বাংলায় নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল এবং তার কিছুকাল পরে কিভাবে একটা অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীই ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরূপে দেখা দিল ও তাদের মধ্যে একটা অংশ ইয়োরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারা গ্রহণ করার চেষ্টা করল। এইভাবে উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে রামমোহন, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বে শিক্ষাবিস্তার এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক ও জাতীয়

আন্দোলন শুরু হলো। এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয় বেঙ্গল রেনেসাঁস, বাংলার নবজাগরণ।

এই আন্দোলন সম্বন্ধে অশোক মিত্র লিখেছেন : "ভারতের বুদ্ধিজীবীরা যে নবযুগের অভ্যুদয়কে 'রেনেসাঁস' বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন, গ্রামের উপর তাহার পরিণাম হইল দুঃখজনক। গ্রামে নতুন মধ্যশ্রেণী গজাইয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির উপর কায়েমি স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রাম্য মহাজনবৃত্তি হইতে উচ্চহারে খাজনা এবং ক্রমবর্ধমান ভাবে ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া—কৃষির উন্নতি হইতে নহে, কৃষিকার্যের বিস্তার অথবা কৃষির সুষ্ঠু তদারককার্য দ্বারাও নহে। অত্যধিক খাজনা, আবওয়াব এবং খাতক-মহাজন সম্বন্ধ ইত্যাদির ভিতর দিয়া ভূমিস্বত্বের অধিকারী ব্যক্তি এবং প্রকৃত চাষী এই দুই-এর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে ব্যবধান ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে মাঠে নামিয়া রৌদ্র বৃষ্টিতে চাষের জন্য পরিশ্রম করা মধ্যশ্রেণীর নিকট ঘৃণ্য কার্য হইয়া উঠিল। প্রকৃত চাষী এবং ভূমি-স্বত্বাধিকারীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ - চুক্তি ও সহযোগিতার সম্বন্ধ নয়। ভূম্যধিকারীরা চাষীর মনোবাঞ্ছা পূরণের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। চাষীকে দাবাইয়া রাখাই হইল ভূম্যধিকারীগণের স্বার্থরক্ষার পথ।"[৮]

এই অন্তর্নিহিত কারণবশতই বাংলার বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীচরিত্র ছিল খুবই দুর্বল এবং সেইজন্যেই তাদের প্রগতিশীল চিন্তা, ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাপকতাও লাভ করেনি, গভীরতাও অর্জন করেনি। তারা সমাজের সংস্কার চেয়েছিল, সমাজের আমূল পরিবর্তন চায়নি। উপরন্তু, তাদের আন্দোলন ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাই তাদের চিন্তার ক্ষেত্রও ছিল খুব সংকীর্ণ এবং তার সাহসও ছিল খুব দুর্বল। কোনো কোনো বিষয়ে কিছু ভাসা-ভাসা মিল ছিল থাকলেও, ইয়োরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁসের কোনো তুলনা করা চলে না, দুটোর মধ্যে রয়েছে একটা মৌলিক প্রভেদ।

ইয়োরোপের রেনেসাঁস ছিল সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত, আর বাংলার রেনেসাঁস বিকাশলাভ করেছিল ইংরেজ শাসক-শ্রেণী কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত বাংলার সামন্ততন্ত্রের ছত্রছায়ায়। ইয়োরোপের রেনেসাঁসের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছিল যুক্তিবাদের যুগে (Age of Reason)। যুক্তিবাদী যুগের বিপ্লবী মতাদর্শ, বস্তুবাদ ধর্মবিরোধী গির্জাবিরোধী চিন্তাই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ঘটিয়েছিল মহান ফরাসি বিপ্লব, আপোষহীন ভাবে ধ্বংস করেছিল ফরাসি সামন্ততন্ত্র, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বে। সেই সময়কার বিপ্লবী বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আহ্বান করেছিল,

তাদের সংঘবদ্ধ করেছিল, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল, সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ থেকে কৃষকদের মুক্ত করে দেশে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল ও সমাজকে একটা উন্নততর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল বর্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।

বেঙ্গল রেনেসাঁসের চরিত্র ছিল বিপরীত। তার নেতারা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁরা দেশকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করা বা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন নি। সত্য বটে যে তাঁরা ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাহলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষক শোষণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি।[৯] কৃষক-শোষণে তাঁরা ছিলেন ইংরেজ সরকারের অংশীদার; তাই তাঁরা ছিলেন কৃষকদের শত্রু এবং ইংরেজ শাসকদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁরা অনেকেই ভারতে ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। এহেন শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহে ('৫৭ সনের বিদ্রোহ মূলত কৃষক বিদ্রোহ-ই ছিল) যোগ দিতে অক্ষম। মোট কথা, এঁরা এঁদের কোনো ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করতে পারেন নি, কোনো মূল সমস্যারও সমাধান করতে পারেন নি। তাই এঁদের কোনো মহান কীর্তি নেই, আছে শুধু দম্ভ —জাতিদম্ভ, শিক্ষার দম্ভ, রেনেসাঁসের দম্ভ, নিজেদের শ্রেষ্ঠতার দম্ভ।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত ভারতে মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক করে দেখেন, কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য গুণগত।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বর্তমান পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার উদ্ভব হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডকেও একটা রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের পর সারা ইয়োরোপে বর্তমান ইয়োরোপীয় শিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল – সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। এই আধুনিক শিক্ষা বা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আর একটা শক্তিশালী স্রোত ছিল, ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শবাদী চিন্তার পরিবর্তে যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক চিন্তা। বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে পশ্চিমে যে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল, ইয়োরোপীয় শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা বলতে তাই বোঝায়।

ইংরেজরা সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করার জন্যে বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার জন্যে ভারতে আসেনি। তারা এসেছিল ভারতকে তাদের ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত করার জন্যে, ভারতকে শোষণ করার জন্যে। তাই তারা যে শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে

চালু করেছিল তা ইয়োরোপীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নয়, তা হলো একটা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা। এটাই ছিল ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করতে গিয়ে ইংরেজদের ভারতে শেকসপিয়ার বেকন, মিলটন, শেলি, বায়রন, লক্, মিল, বেনথাম প্রমুখের গণতান্ত্রিক চিন্তাকেও আনতে হয়েছিল। কারণ এঁদের বাদ দিয়ে ইংরেজি শিক্ষা হয় না। এটা হলো সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বেরই ফল।[১০]

সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্বিরোধের ফলে যেটুকু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভারতে এসেছিল, তার কতটুকুই বা ইংরেজি শিক্ষিতরা গ্রহণ করতে পেরেছিল ? ভারত যদি স্বাধীন থাকত তাহলে এইসব আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা গ্রহণ করার শক্তি এবং সাহসও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেক বেশি থাকত।[১১]

ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষার আর একটা দিক হলো এই যে, এই শিক্ষা ভারতের বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজি ভাষার ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল করে তুলেছিল। ফরাসি, জার্মান, রুশ, ইতালিয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশেষ করে তাদের অগ্রসর ও বৈপ্লবিক চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পরিচিত হবার জন্যে খুব সচেষ্ট ছিলেন বলে দাবি করা যায় না। ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, দাঁতঁ, মারা, রোবস্পিয়ের, ইবার্ট, বাব্যফ্, গোয়েটে, শিলার, হাইনে, বেথোভেন, মটসার্ট, শার্নিসেভস্কি, দব্রোলিউবভ, বেলিনস্কি, হেরজেন, প্লেখানভ প্রমুখের মধ্যে দু-একজন ব্যতীত সকলেই ভারতের বুদ্ধিজীবীদের নিকট অপরিচিত। ১৯১৭ সনের পূর্বে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের ভাবাদর্শের সংস্পর্শে আসা তো দূরে থাকুক, তাঁদের নাম পর্যন্ত ভারতের ইংরেজি শিক্ষিতদের অজানা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর শেষ জীবনে ইংরেজি শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলে গিয়েছিলেন, তা আজ বিশেষভাবে স্মরণীয় : "ক্রমে বিদেশী ইস্কুল-মাষ্টারের হাতে আমাদের শিক্ষা যতই পাকা হয়েছে, ততই ধারণা হতে লাগল যে, অক্ষমতা আমাদের মজ্জাগত, অজ্ঞতা অন্তর্নিহিত ; অন্ধ সংস্কার ও মূঢ়তার বোঝা বয়ে পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে থাকবে চিরদিন।...আপন অধিকার আপন শক্তিতে জিতে নিতে হবে এমন দুঃসাহসকে তখনকার কংগ্রেসী বীরেরাও মনে স্থান দেননি। .. থেকে থেকে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে শিবনেত্র হয়ে বলেছি আমরা আধ্যাত্মিক, আর যারা আমাদের কান মলে তারা বস্তুতান্ত্রিক।...আমরা একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে, দূরতম প্রাচ্যে ক্ষুদ্রতম জাপান তার প্রবল প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাস্ত করে সভ্যসমাজের উচ্চ আসনে চড়ে বসলো। প্রচণ্ড পাশ্চাত্য

সভ্যতার ভাণ্ডারে যে শক্তি ও যে বিদ্যা পুঞ্জিত ছিল, জাপান তা অধিকার করল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। দীর্ঘ ইতিহাসের বন্ধুর পন্থায় ক্রমশ পুষ্ট, ক্রমশ ব্যাপ্ত; বহু চেষ্টায় নানা সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমের অমোঘ বিজয়ীবীর্যকে আপন স্বাধীনতার সিংহদ্বার দিয়ে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আহ্বান করে আনলে। যে বিদ্যা অপমান দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে তার আমরা স্পর্শ পাইনি বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে, আমাদের হয়নি।"[১১]

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা শিক্ষিতদের সাধারণভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র বা তাদের জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলেনি।[১৩] এই শিক্ষা তাদের আত্মসম্মানবোধ, তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও আত্মনির্ভরতা ধ্বংস করে দিয়েছিল—তাদের পরনির্ভরশীল ও আপোষ-প্রবণ করে তুলেছিল। ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে,—'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোক'দের মধ্যে,—ব্যবধানটা আরো ব্যাপক ও গভীর করে তুলেছে।

এই গোলামী শিক্ষা-যন্ত্র থেকেই বেরিয়ে এসেছিল সেইসব ইংরেজি শিক্ষিতরা, যারা মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদেশি সাম্রাজ্য-বাদীদের সমর্থন জানিয়েছিল এবং সেইসব বুদ্ধিজীবীরাও যারা সেই মহা-বিদ্রোহের একশো বছর পরে তাদের পূর্বসূরীদের বিশ্বাসঘাতকতার সমর্থনে আজ আবার আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেদিনকার ইংরেজি শিক্ষিতরা (মুষ্টিমেয় ছাড়া) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শিক্ষাও যেমন ধাতস্থ করতে পারেন নি, পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী চিন্তাধারাও তাঁরা (অল্প কয়েকজন ব্যতীত) নিজস্ব করে নিতে পারেন নি। তাঁদের সেদিনকার সুবিধাবাদী চিন্তা ও আপোষপন্থা যে বর্তমানের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইতে সংশোধনবাদের চিন্তাধারায় পরিণত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

যাই হোক, বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এই শ্রেণীগত দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি যে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রামমোহন ফরাসি বিপ্লবের নীতিগুলির প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। ১৮২৩ সনে স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রামমোহনের নেতৃত্বে কলকাতায় এক সাধারণ ভোজসভায় তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। ১৮৩০ সনের ফরাসি বিপ্লবের সময়ও রামমোহন তাকে প্রকাশ্যভাবে সম্বর্ধনা জানান ও কলকাতার শিক্ষিতরা টাউন হলের সভায় তাকে অভিনন্দত করেছিল এবং ঐ সম্বন্ধে তারা এতই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে ২৫ ডিসেম্বর তারা অক্টারলোনি মনুমেণ্টের উপর ফরাসি বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল।

ভারতে ফরাসি বিপ্লবের অনুরূপ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রোমান্টিক পরিকল্পনাও তাঁদের কারো কারো মনে স্থান পেয়েছিল। সব ইংরেজি শিক্ষিতরাই ভারতে

ইংরেজ শাসনকে 'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে মেনে নেন নি। ১৮৩৫ সনে কৈলাসচন্দ্র দত্তের ইংরেজিতে লিখিত একটি গল্পই তার প্রমাণ।[১৪] গল্পটির নাম "১৯৪৫ সালের ৪৮ ঘণ্টার একটি দিনপঞ্জী"—ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নেতৃত্বে জনসাধারণের একটা কাল্পনিক সশস্ত্র বিদ্রোহই এই গল্পের বিষয়বস্তু। অনেক সভা সমিতি, আন্দোলন, বিদ্রোহ, পরাজয় ও সর্বশেষে ইংরেজের খড়্গাঘাতে নেতা ভুবনমোহনের মৃত্যু। লড়াই চালিয়ে যাবার জন্যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ভুবনমোহনের শেষ আহ্বান।[১৫]

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওপর ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে একজন ইতিহাসজ্ঞ বলেছিলেন যে, "ফরাসি বিপ্লবের অনুরূপ ঘটনা ভারতেও ঘটুক, এই আশা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র তাঁদের হৃদয়ে পোষণ করতেন। এবং এই চিন্তাধারাই ভারতীয় সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে 'জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু' নামে 'বেঙ্গল হরকরা'তে ১৮৪৩ সনে প্রকাশিত হয়েছিল।"[১৬] ইংরেজ শাসকদের তৎকালীন মুখপত্র *Friends of India* বাঙালি 'নেটিভদের' এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারেনি। বাঙালিদের ফরাসি ইতিহাসবিদ থিয়ার্স এবং ইংরেজ ইতিহাসবিদ অ্যালিসনের বই পড়বার উপদেশ দিয়ে ১৬ মার্চের (১৮৪৩) সংখ্যায় উক্ত পত্রিকায় বিপ্লবের ভয়াবহতা প্রকাশ করবার জন্যে বলা হয়েছিল যে, বিপ্লব যদি ঘটে "তাহলে হুগলি নদীতে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে (বর্তমান ডালহাউসী স্কোয়ার) একটা চিরস্থায়ী গিলোটিন স্থাপিত হবে।"[১৭]

পরবর্তীকালে কার্ল মার্কসের রচনাবলী সারা পৃথিবীর মানুষকে যে প্রেরণা দিয়েছিল, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদাতা টমাস পেইনের 'এজ অব রিজন' (Age of Reason) ও 'রাইটস্ অফ ম্যান' (Rights of man) কতকটা সেই কাজ করেছিল। পেইনের চিন্তাধারা তখনকার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী পাদরি ডাফ লিখেছিলেন : "কেবলমাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যা 'এজ অব রিজন' কলকাতায় এসে পৌঁছলো, প্রথম দিকে প্রতিটি বই এক টাকা করে বিক্রি হচ্ছিল ; কিন্তু এই বইয়ের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে, দেখতে দেখতে এর দাম অনেক বেড়ে গেল।...কিছুদিনের মধ্যে পেইনের সব লেখার একটা শস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হলো।"

বৈপ্লবিক চিন্তাধারার এই প্রচারকার্য, যা শুরু হয়েছিল রামমোহনের সময়কাল থেকে, তা আরো বিস্তার লাভ করেছিল উনিশ শতকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে। এই কাজে অগ্রণী ছিলেন ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল দল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সব থেকে অগ্রগামী চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলেন, "মানুষের

দারিদ্র্যই তার অপরাধ, অজ্ঞতা, রোগ ও দোষের জন্য দায়ী।" সমাজের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে এত অধিক অসাম্য দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "সকল দেশের ধনী মহাজনরা চায় যে পৃথিবীর সব কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস তাহারাই উপভোগ করুক, আর তাদের ভোগের বস্তু সরবরাহ করার জন্য অন্যেরা সকলে ক্রীতদাসের মত খেটে চলুক। যে সমাজে অধিকাংশ লোককে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে রাজার হালে রাখবার জন্য দিনরাত্র ভূতের বেগার খাটতে হয়, সেই সমাজের কোন উন্নতি হতে পারে না। ভগবান সকল শ্রেণীর লোককেই বুদ্ধি ও ধর্মপ্রাণতা দিয়েছেন, কিন্তু দারিদ্র্য ভগবানদত্ত এই গুণগুলির উৎকর্ষ সাধন থেকে মেহনতী মানুষকে বঞ্চিত করেছে।"[১৮]

১৮৪২ সনে স্থাপিত ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও ১৮৫৩ সনে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' উক্ত ধরনের চিন্তাধারার প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-ই বাঙালি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সব থেকে প্রিয় ও শক্তিশালী মুখপত্র ছিল। বিদ্রোহকালে হরিশচন্দ্র তাঁর এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মারফৎ ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশের নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করতে কখনো পশ্চাৎপদ হন নি। ১৮৫১ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় সর্বমতের লোক নিয়ে কলকাতায় 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হলে ভারতের নানাপ্রকার জাতীয় দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৫৩ সনের চার্টার-অ্যাক্ট পাস হবার সময় অনেকেই আশা করেছিলেন যে, ভারতবাসীর অনেক দাবি ব্রিটিশ শাসকরা মেনে নেবে, কিন্তু তা না হওয়াতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ বেড়ে যেতে থাকে এবং এই নিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনও চালিয়ে যেতে থাকে।

তৎকালীন বাংলার কৃষক সমাজের মধ্যেও অসন্তোষের অভাব ছিল না। সরকার, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে তাদের কেউ নেতৃত্ব দিলেই যে তারা বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি, ২৬ ফেব্রুয়ারিতে যখন বহরমপুরে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ হয় তখন মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবের মুখ থেকে একটি কথার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। বাংলার দুর্ভাগ্য যে, নবাবের নিকট থেকে কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের নিকট থেকে বিদ্রোহের নির্দেশ আসেনি। বহরমপুরে ও পরে ব্যারাকপুরের সিপাহিদের বিদ্রোহের সংবাদে নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, যশোহর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলাগুলিতে জনসাধারণ যে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ও'ম্যালি তাঁর 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স'-এ লিখেছেন যে,

বহরমপুরের বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র ডিভিশনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।[১৯] বাঁকুড়া জেলায় সাঁওতাল ও চুয়াড়দের মধ্যে যে কোনো সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে বলে কর্তৃপক্ষ আশংকা করছিলেন।[২০] মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের পর কলকাতা শহর কী সাংঘাতিক একটা বারুদস্তূপে পরিণত হয়েছিল তাও আমরা দেখেছি।

মহাবিদ্রোহের সময় বাংলায় কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ জমাট বেঁধেছিল, সেই অবস্থায় তারা যদি নেতৃত্ব পেত, তাহলে বাংলায়ও একটা গণবিদ্রোহ ঘটা অসম্ভব ছিল না। এরকম নেতৃত্ব বাংলার প্রগতিশীল ব্যক্তিরা দিতে পারতেন। কিন্তু, যে মাসে মিরাট ও দিল্লিতে সিপাহিদের বিদ্রোহের পর যখন ভারতের একটা বিরাট অংশে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো, তখন বাংলার যেসব প্রগতিশীল ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা এত বিপ্লব, মানবতাবাদ, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, তাঁদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ছিল 'প্রতিবিপ্লবী', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'মরণোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের শেষ নাভিশ্বাস', 'রাজ্যচ্যুত রাজাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে একটা শেষ প্রচেষ্টা', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ, স্বদেশপ্রেম-জাতীয়তাবোধ বর্জিত কতকগুলি সিপাহির' বিদ্রোহ ছিল বলেই প্রগতিশীল বিপ্লবী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাতে যোগ দেননি—এ 'যুক্তি' একেবারেই অচল। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন প্রগতিশীল, কিন্তু বিপ্লবী ছিলেন না বলেই তাঁরা বিদ্রোহে যোগ দেন নি। তাঁদের প্রগতিশীলতা ছিল একটা পোশাকি ব্যাপার, একটা ফ্যাশান মাত্র—তাঁদের কর্মের পরিচায়ক নয়। তাঁদের প্রগতিশীল ধ্যানধারণাকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তার প্রয়োগের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি।[২১] বিদ্রোহে যোগ দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না, কারণ যে কোনো গণবিদ্রোহ ছিল তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী। এইখানেই ছিল তাঁদের স্ব-বিরোধিতা (self-contradiction), তাঁদের সুবিধাবাদ, আপোষ-প্রবণতা ও কাপুরুষতার কারণ, তাঁদের কথায় ও কাজে, তত্ত্বে ও প্রয়োগে বৈপরীত্যের উৎস।

তৎকালীন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের এই চারিত্রিক দুর্বলতাবশত তাঁরা যতই বেকন, ভলতেয়ার, রুশো, পেইন, লক্‌, হিউম, বেনথাম্‌ পড়ুন না কেন, তাঁদের মূল শিক্ষাগুলি তাঁরা ধাতস্থ করতে পারেন নি। "এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। নব্যদল রাজনীতিতে চরমপন্থী হলেও বৃটিশ শাসনকে সর্বদা স্বীকার করে নিয়েই তবে সব রকমের আলোচনা চালিয়েছিলেন।"[২২] আসল কথা হচ্ছে, বুর্জোয়া বিপ্লবটাকে বাদ দিয়ে, মূল ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গিয়ে, বুর্জোয়া বিপ্লবের ভালো ভালো ফসলগুলি চাই—এই ছিল তখনকার ভারতের প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব। (ভারতীয়

বুদ্ধিজীবীদের এই দৃষ্টিভঙ্গির যে এখনো পরিবর্তন হয়নি, তা দেখা যায় যখন তাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র চান, অন্তত তার একটা যে কোনো 'প্যাটার্ন' হলেও তাঁদের চলে!)। প্রধানত এই মৌলিক দুর্বলতাই বাংলার ও ভারতের রেনেসাঁস ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে পঙ্গু ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে রেখেছিল। মহাবিদ্রোহের সময় তাঁদের এই দুর্বল চরিত্রটাই নগ্নভাবে উদঘাটিত হয়ে পড়েছিল।

তাছাড়া, সেই সময়ে ইংরেজ শাসকরা তাদের বিভিন্ন সরকারি দফতরে ও সওদাগরি অফিসে কেরানি ও মাঝারি রকমের চাকুরিতে কিছু ভারতীয়দের ঢুকবার সুযোগ দিয়েছিল। তার ফলে স্বভাবত দুর্বল বুদ্ধিজীবীদের আরো দুর্বল করে দিয়েছিল। "ডিরোজিওর অনেক ছাত্রকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করার ফলে আদর্শবাদী চরমপন্থীদের স্থান ক্রমশ শূন্য হতে থাকে। ১৮৩৩ সনের চার্টার-অ্যাক্ট অনুসারে ১৮৪৫ সনে কতকগুলি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ঐসব পদে হিন্দু কলেজের ভালো ভালো পূর্বতন ছাত্রদের নিয়োগ করা হয়।"[২৩] এইভাবে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবকরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন।[২৪]

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সেই যুগের 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবীদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি। তিনি ছিলেন মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাগিনেয়, সূর্যকুমার ঠাকুর ছিলেন তাঁর মাতামহ—এর থেকেই তাঁর সামাজিক পরিবেশ বোঝা যায়। ডিরোজিওর তিনি ছিলেন একজন প্রধান শিষ্য, সুচতুর রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে, ফরাসি বিপ্লবে অনুপ্রাণিত এবং তৎকালীন একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর সম্পাদক। মুর্শিদাবাদে দেওয়ান রূপে, কলকাতায় কালেকটার রূপে ও ওকালতি করে তিনি অনেক টাকা উপার্জন করেছিলেন। মিরাট, দিল্লি, লখনউতে বিদ্রোহের পর যখন ভারতে ইংরেজ শাসন টলায়মান, তখন তিনি কলকাতায় নির্বাসিত অযোধ্যার নবাব ও আরো কয়েকজনেনের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দিল্লি ও লখনৌতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর তিনি হঠাৎ ভীষণ রাজভক্ত হয়ে পড়লেন,[২৫] বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্যে অযোধ্যায় চলে গেলেন, একজন বিদ্রোহী রাজা বেণীমাধোর বিরাট জমিদারিটা পুরস্কারস্বরূপ পেয়ে গেলেন, কাইজার বাগে প্রাসাদতুল্য বাড়ি পেলেন, রাজা উপাধি পেলেন এবং টিকিধারী একজন গোঁড়া হিন্দুতে পরিণত হলেন।[২৬]

মহাবিদ্রোহের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—একটা অংশ ইংরেজ শাসনের প্রতি দাসসুলভ মনোভাব দেখিয়েছে, আর এক অংশ নিরপেক্ষ বা উদাসীন ছিল, তৃতীয় অংশটা ছিল বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। রাজভক্ত দাসদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল কিনা তা বলা যায়

না, তবে তাদের কণ্ঠস্বরটাই সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের মারফৎ বেশি শোনা যেত। তাদের সংবাদপত্রগুলি একদিকে তাদের প্রভুদের জয়গানে ও অন্যদিকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের বাধ্য হয়ে নীরব থাকতে হতো। তাদের যেসব সংবাদপত্রগুলি বে-আইনি করে দেওয়া হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজদের দমননীতি সত্ত্বেও হরিশ মুখার্জী তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যা লিখতেন, তাকে খুব রাজভক্তিমূলক বলা যায় না।

তখনকার একমাত্র বাংলা দৈনিক ছিল 'সংবাদ-প্রভাকর' তার সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। ইনি একসময় বলেছিলেন : "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরও পূজা করিব।" ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ মেয়ে হয়ে পুরুষের মতো লড়াই করতে পেরেছে শুনে এই বীরপুঙ্গব তাঁর ধৈর্য, সংযম, শালীনতা সবই হারিয়ে ফেলেছিলেন :

"পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে,
হাদে কি শুনি বাণী ?
হাদে কি শুনি বাণী ঝাঁসীর রাণী
ঠোঁট কাটা কাকী ॥
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী খেঁকী
শেয়ালের দলে,
এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।"

যখন ইংরেজরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে দলে দলে ভারতীয়দের হত্যা করছিল, তখন তাদের বিধবাদের লক্ষ্য করে ঈশ্বর গুপ্ত যে রকম পৈশাচিক উপহাস করে-ছিলেন, তা বোধহয় কোনো ইংরেজের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

"বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে ক'বে বিয়ের কথা ॥
বিয়ে হ'লে বেঁচে যেত। সাধ পুরে খেতে পেত ॥
গহনা উঠত গায়ে। এড়াত সকল দোষ ॥"

দিল্লির পতনের বহুপূর্বে ইংরেজরা একটা মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে দিয়েছিল যে, তারা দিল্লি অধিকার করে ফেলেছে। এই মিথ্যা গুজবে উৎফুল্ল হয়ে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য) লিখেছিলেন : ১৩-ই জুন ১৮৫৭ — ব্রিটিশের জয়। এই শুভ সংবাদ লিখনকালীন আমাদিগের লেখনী আনন্দভরে নৃত্যারম্ভ করিয়াছে। হে পাঠকগণ, আপনারা জয়ধ্বনি করুন দুরাশয় সিপাহীরা এইক্ষণে ছিন্নভিন্ন হইয়া ব্রিটিশ তোপাগ্নিতে মরিতেছে।"

যে রঙ্গলাল একদিন গেয়েছিলেন—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়"—তিনিই, যখন সহস্র সহস্র ভারতীয় দেশের স্বাধীনতার জন্যে আত্মবিসর্জন দিচ্ছিল, সেই সময়ে তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর শেষদিকে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিদেশি বিজেতাদের উদ্দেশ্যে এই স্তুতিগানটি যোগ করে দিলেন :

"ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ বিভাবরী ভোর
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরেজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী মাঝে সুখ-সরোরুহ বাজে,
মনভৃঙ্গ মজে হরিষে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ॥"

আর একশ্রেণীর রাজভক্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবী ছিল সরকারি চাকুরিয়ারা। এই সব বাঙালি কেরানিরা তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল ইংরেজের বিশ্বস্ত কেনা গোলাম। প্রভুদের জন্যে কোনো রকমের ঘৃণ্য কাজ করতে এদের বাধত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এলাহাবাদের মুনসেফ প্যারীমোহন ব্যানার্জীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গোলামটি দলে দলে ভারতীয় বিদ্রোহীদের— এমনকি অনেক নির্দোষ ব্যক্তিদেরও, – ফাঁসি দিতে নীল, হ্যাভলক প্রভৃতিকে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধের পর পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজরা তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করেছিল। এরকম আর একজন ব্যক্তি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে গর্ব করে লিখে গিয়েছেন কিভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে বেরেলিতে তার বিদেশি প্রভুদের জন্যে সে গুপ্তচরের কাজ করেছিল। ন্যায়সংগত কারণেই এই শ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে কতটা ঘৃণার পাত্র হয়েছিল, তা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন।

ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট 'সংবাদ প্রভাকর', 'হিন্দুরত্ন কমলাকর'-এর মতো নিকৃষ্ট ও রুচিহীন পত্রিকাগুলির মন্তব্যগুলিকে, অথবা কতকগুলি আত্মসম্মান বর্জিত কেনা গোলামের উক্তি ও ঘৃণ্য দুষ্কর্মগুলিকে 'বাঙ্গালীর জনমত' বা 'বাঙ্গালীর মনোভাবের' সাক্ষ্য রূপে ব্যবহার করার মতো হাস্যকর আর কি হতে পারে?[৭]

কন্ট্রাক্টর-জমিদার, চাকুরিজীবী ও কেনা গোলাম ছাড়াও অসংখ্য উল্লেখযোগ্য বাঙালি, ছিলেন যাঁদের মহাবিদ্রোহের সময় নীরব থাকতে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কারো কারো বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও তা প্রকাশ করা সেই সময় সম্ভব ছিলনা। তা সত্ত্বেও আকার ইঙ্গিতে তাঁদের মনোভাব তাঁরা

ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে সেদিনকার কোনো লোকমান্য বাঙালি মনীষী—বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রমুখ কেউই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি কয়েকজন নগণ্য ব্যক্তির রাজভক্তি প্রচারের চাইতে এইসব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নীরবতা সেদিনকার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সেদিনের কল্প্রাডর জমিদার কেরানি বাবু সম্প্রদায়ের ক্লীবতা, ভীরুতা, রাজভক্তি ও পৌরুষহীনতাকে লক্ষ্য করে যে বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছিলেন, তা কি বাঙালির শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক নয়? তিনি তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় লিখলেন: "পশ্চিমের সেপাইরা ক্ষেপে উঠেছে, নানা-সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে। ভারি বিপদ…আজ দিল্লি গেল, কাল কানপুর হারানো হ'ল ক্রমে পাশাখেলা হারকেত্তের মত ইংরেজরা উত্তর পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন।" এই কথাগুলি থেকে কি মনে হয় যে ইংরেজ রাজত্ব যায়-যায় দেখে কালীপ্রসন্ন খুব মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন? আরো লক্ষ্য করতে হয় যে, সিপাহি বা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি; উল্টে ইংরেজের দমননীতিকেই আক্রমণ করলেন ও যেসব ম্যাড়া বাঙালি ইংরেজদের সাহায্য করছিল তাদের ঘৃণা করে বললেন: "বাঙ্গালীরা ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেব-দের বুঝিয়ে দিলেন যে যদিও একশ' বছর হয়ে গেল তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালীই আছেন বহুদিন বৃটিশ সহবাসে, বৃটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি।"

সিমলার নিকট গুর্খা সৈন্যদের বিদ্রোহের কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনার সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলায় ছিলেন। সেই সময় তিনি ইংরেজ ও ইংরেজভক্ত বাঙালির বীরত্ব স্বচক্ষে দেখেছিলেন। প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে ইনিই fighting munsif হয়েছিলেন।) নিকট গিয়ে দেখলেন "তিনি দেওয়ালের চুণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'গুর্খারা বামুন মানে'। জিজ্ঞাসা করিলাম, হয়েছে কি? তিনি বলিলেন যে 'গুর্খা সৈন্যরা সিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি, আমি খাদে যাইব'।"

সিমলা থেকে ডাগসাহী পৌঁছে দেবেন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখলেন: "সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা খোলা তরয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের

* প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অতি ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম এরা আমার উপর তাহার তরয়াল না চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল: 'গুর্খারা কি এখানে আসিতেছে?' আমি বলিলাম, না এখানে আসে নাই'।"[২৯] দেবেন্দ্রনাথের লেখায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও নেই, আছে ইংরেজদের প্রতি বিদ্রূপ ও তাদের পোষা কুকুরদের প্রতি ঘৃণা। এই বিদ্রোহকে তিনি কোথাও প্রতিক্রিয়াশীল বলেন নি।

প্যারিস শহরে থাকাকালীন মধুসূদনকে নানাসাহেব সন্দেহ করে ইংরেজ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল। তখন নাকি তিনি তাদের বলেছিলেন —"Unfortunately I am not that great revolutionary"— দুঃখের বিষয় আমি সেই মহান বিপ্লবী নই। বলা বাহুল্য, মধুসূদন যে দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন তাতে তাঁর নিকট থেকে এইরকম উক্তি একেবারেই অসম্ভব নয়।

নির্দেশিকা

১. এইসব জমিদার 'বাবুদের' ইংরেজরা কিরকম ঘৃণার চোখে দেখত ও তাদের এই প্রস্তাবের মূল্য কতটুকু দিয়েছিল তা *Englishman* (26 may 1857) পত্রিকায় তাদের সম্বন্ধে মুদ্রিত একটি ব্যঙ্গ কবিতায় প্রকাশিত।
২. *Hindu* : the Mutinies and people, or, statements of Native Fidelity, p. 216
৩. *Ibid*, pp. 232-33
৪. ব্যাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ১২
৫. ১৯৩৭ সনে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রজাসত্ব-আইন আলোচনার সময় জমিদারি খাজনা সম্বন্ধে তিনটি হিসেব দেওয়া হয়েছিল: ক. ২৯ কোটি টাকা (১৭ কোটি বৈধ ও ১২ কোটি অবৈধ); খ. ৩০ কোটি টাকা (২০ কোটি বৈধ ও ১০ কোটি অবৈধ); গ. ২৬ কোটি টাকা (২০ কোটি বৈধ ৬ কোটি অবৈধ)।—Dutt, *India To-day*, p. 191
৬. বেন্টিঙ্ক বলেছিলেন: "If however, security was wanting against extensive popular tumult or revolution, I should say that

the permanent settlement, which though a failure in many other respects and in its most important essentials, has the great advantage atleast of having created a vast body of landed proprietors deeply interested in the continuance of British Dominion and having complete command over the mass of the people" (A. B Keith, *Speeches and documents of Indian Policy, 1750-1921*, vol. I p. 215)

৭. O' Malley : *Bengal District Gazetteer*, Burdwan, p 38

৮. *Census Report*, 1951, vol. 6, part 1A, p. 435

৯ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এই দ্বৈত চরিত্র বিশ্লেষণ করে সুপ্রকাশ রায় সঠিক-ভাবেই বলেছেন : "এইভাবে মধ্যশ্রেণীসহ অভিজাত শ্রেণীটি একদিকে উন্নত বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে মতবাদের দিক হইতে প্রগতিশীল হইয়া ওঠে এবং অপরদিকে মূল শ্রেণীস্বার্থের প্রভাবে দেশের আভ্যন্তরিক গণ-সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেয়।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ···, পৃ. ১৯১)

১০. "The fact that this system of education, imposed in the interests of efficient imperialist administration, opened the avenues at the same time to the great stream of English democratic and popular inspiration and struggle of the Miltons, the Shelleys, and the Byrons—fighting against the self-same types of tyranny...as were enslaving and exploiting India— was a characteristic contradiction of the whole system of imperialism conducted by the ruling class of a country in which simultaneously the people were themselves pressing foward to their freedom." (R. P. Dutt, *India To-Day*, p. 251)

১১. "the notion that India could have had no part in these world currents, or passed forward to the fight for national and democratic freedom, without the interposition of England is fatuous self complacency. On the contrary, the example of China has shown how far more powerfull the national democratic impulse has been able to advance and gain ground where imperialism had not been

able to establish any complete previous domination." (R. P. Dutt, *India To-Day* 1947, p. 250)
বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা ভারতের জন্যে গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক আধুনিক শিক্ষাই চেয়েছিলেন। কিন্তু সেরূপ চেষ্টা পরাধীন ঔপনিবেশিক ভারতে সম্ভব হবে কি করে? প্রকৃত স্বাধীন ভারতেই সেরূপ শিক্ষা সম্ভব হতো, যেমন হয়েছিল জাপানে। আধুনিক শিক্ষার প্রতি ঝোঁক তখন অনেক স্থানেই দেখা গিয়েছিল। ১৮৫০ সনে আরা শহরে যে আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কুমার সিংহ। (K. K. Datta, *Biography of Kunwar and Amar Singh.* p. 158)। C. F. Andrews তাঁর Zakaullahah of Delhi-তে (p. 38) বলেছেন, মহাবিদ্রোহের পূর্বে দিল্লিতে একটা নবজাগরণ দেখা গিয়েছিল এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দিল্লির সেই নবজাগরণ সম্বন্ধে *Calcutta Review.* 1858, দ্রষ্টব্য।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'প্রগতি লেখকদের প্রতি,' পরিচয়, ১৩৬৮ বৈশাখ। ১৯৩৮ ডিসেম্বরে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের এই লিখিত ভাষণটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৫, ৯ই পৌষ

১৩. "When Macauley, on behalf of imperialism imposed the the system of Anglicised education, ...his object was not to create Indian National consciousness, but to destroy it down to the very deepest roots of its being, in much the same spirit as the Czarist methods of Russification of the Russian Empire." (Dutt, *India To-day*, p 251)

১৪. "A Journal of 48 hours of the year 1945"—Kailash chandra Dutt, *The Calcutta Literary Gazette* (Editor, Capt. D. L. Richardson), 6th June 1935. এই ধরনের আরো একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল—"The Republic of Orissa : Annals from the pages of the 20th. century", Shoshee chandra Dutta, *Saturday Evening's Harkuru*, 25 May, 1845. এই প্রসঙ্গে দ্র. পল্লব সেনগুপ্তের 'সশস্ত্র সংগ্রাম, স্বাধীনতার স্পৃহা ও ইয়ং বেঙ্গল' প্রবন্ধ (শারদীয় 'চতুষ্কোণ', ১৩৭২)।

১৫. "My friends and countrymen ! I have the consolation to die in my native land, and though heaven has seemed

that I should expire on the scaffold, yet are my last moments cheered by the presence of my friends. I have shed my last blood in defence of my country, and throngh the feeble spark within my frail france. I hope, you will continue to persevere in the course we have so gloriously commenced."—এটাকে '৫৭ সনের বিদ্রোহের আহ্বান বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

১৬. B. Mazumder, *History of Political thought in India*, p. 84

১৭. *Ibid*, p. 84

১৮, *Ibid*, p. 15।

১৯. O' Malley, *District Gazeteer, Nadia*, p. 32

২০. *Ibid Bankura*, p. 32

২১. "The net result of British rule from the point of view Indian culture has been the emergence of a spurious middle-class—*the bhadraloks*—that do not play any truly historical part in the socio-economic evolution of the country, remain distant from the rest of the people in professional isolation or as rent receivers and are divorced from the realities of social and economic life, their loyalties to Indian culture vary from rectitude to reform Very few of them are social revolutionaries even as the medieval mystics were the strangeness of their reformism consists in their ideological progressiveness and their practical conformity·· their ignorance of the background of Indian culture is in reverse proportion to the lack of social contact." (Dhurjati Prosad Mukherji *Modern Indian Culture*, p. 29)

২২. যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ৫৩

২৩. Majumdar, *History of Political Thought in India*, p. 96

২৪. 'বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথে' নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩৬২ ভাদ্র) বাঙালির বর্তমান দুর্দশার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাসজ্ঞ যদুনাথ গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে ব্রিটিশ আমলে বাঙালিদের অবস্থা কত অগ্রসর ছিল—"আমাদের প্রপিতামহদের সময় এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালীরা প্রাণের আগ্রহে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া নিজ বুদ্ধি ও হৃদয়বল খাটাইয়া

ভারতের সর্বত্রই সর্বত্রই ইংরেজী শাসনযন্ত্রের অত্যাবশ্যক সহায়ক হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, আর ধনে মানে বাড়িয়া উঠে। কোয়েটা হইতে ভামো পর্যন্ত বাঙ্গালী কমিসারিয়েট, গোমস্তা, ডাক কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানীতে ভরা ছিল। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যখন বিদ্রোহ করিলেন তখন সেই শহরে বাঙ্গালী ডাক কর্মচারী, পথ বিভাগের কেরানী ইত্যাদি ছিল। বিদ্রোহী সিপাইরা তাহাদের মারপিট করিয়া বন্দী করিল ইংরেজের বন্ধু বলিয়া।" স্যার যদুনাথের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে এখানে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, ঝাঁসিতে যেদিন সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইংরেজদের হত্যা করতে শুরু করে সেইদিন একজন বাঙালি ডাককর্মচারি কয়েকজন ইংরেজকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। সিপাহিরা তা জানতে পেরে এই বাঙালি প্রভুভক্তটিকে খুব প্রহার করে। সিপাহিরা ঝাঁসি ত্যাগ করে দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়ে যাবার পর রানী লক্ষ্মীবাঈ ওখানকার সকল বাঙালিদের বাংলায় ফিরে আসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

২৫. "All his life Duckinaranjan Mukerji lived in the midst ot scheming and intrigues. In the incidents that led up to the Mutiny and throughout its progress, the former pupil of Derozio schemed all round, at one time making overtures to some members of the Tagore family regarding certain designs of the King of Oudh, at another seemingly working hard as a loyal subject in the interests of England. All his important manoeuvres during this period ot the Sepoy Rebellion will probably never be released but he had sufficient craft to make it appear to Duff and the officials of the foreigh office that he was a highly deserving and loyal subject." (Thomas Edwards, *Life of Derozio*). দক্ষিণারঞ্জনের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ এডোয়ার্ডাস-এর এই উক্তির প্রতিবাদ করে বলেছেন যে এগুলো 'অমূলক অপবাদ'। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'য় দক্ষিণারঞ্জনকেই উপলক্ষ করে লিখেছিলেন—"কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হ'ল; কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেল।"

২৬ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ১ম সং, পৃ. ১১৭

২৭ অথচ ড রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিক এই কাজটিই করেছেন, দ্র. *British Paramountcy* pp. 614-15। তিনি এই ঘৃণ্য জীবগুলির কথাগুলিকে

ঐতিহাসিক 'তথ্য' ও 'যুক্তি' হিসাবে ব্যবহার করেছেন ও তাদের বাঙালির প্রতিনিধিস্থানীয় বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার জবাবে ড শশীভূষণ চৌধুরী বলেছেন: "the opinion of all Bengalis referred to in the 'British Paramountcy' would have therefore no more value in historical judgements than hostile evidence in a court of law." (*Theories...*, p 123)

২৮ দু-এক জন 'প্রগতিশীল' লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বিদ্যাসাগর সমর্থন জানান নি, সুতরাং ঐ বিদ্রোহটা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। বিদ্যাসাগর রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। কাজেই এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে এভাবে টেনে আনার কোনো অর্থ হয় না। তবে, বিদ্যাসাগরের একটি জীবনীতে নিম্নলিখিত কাহিনীটির উল্লেখ রয়েছে, তার একটা তাৎপর্য থাকা অসম্ভব নয়: "স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব ডেপুটি ইন্সপেক্টর ও 'দৈনিকের' বর্তমান সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি সিপাহী বিদ্রোহের সময় অনেকগুলি আহত সিপাহী সংস্কৃত কলেজে আশ্রয় লইয়াছিল। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ডাইরেক্টরের অনুমতি না লইয়াও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সিভিলিয়ান ইয়ং সাহেবের সহিত মনোবাদের ইহাও একটি কারণ।" (শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর,' পৃ. ৩৭০)

২৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবন চরিত', পৃ ১৬০, ১৬৬

৩

মহাবিদ্রোহ : কার্ল-মার্কস, এম. এন. রায়, আর. পি. দত্ত

মহাবিদ্রোহের প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখকরা যে কথাটার উপর সবথেকে বেশি জোর দিয়েছিলেন তা হলো, বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, প্রমুখ নেতারা চেয়েছিলেন ভারতে মুঘল রাজত্ব, পেশোয়া রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং যদি সফল হতেন তাহলে ভারত আবার মধ্যযুগে ফিরে যেত। তাঁদের এই কথাগুলি ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের স্থানে ইংরেজ শাসনের প্রগতিশীলতা, ন্যায্যতা, আধুনিকতা, ইংরেজ শাসন ভারতীয় শাসনের তুলনায় যে কত শ্রেয়, তা প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বহুকাল পরে ভারতের বিপ্লবী নেতা এম. এন. রায় তাঁর *India in Transition* (1922) নামক বইতে (ভারত বিষয়ে এই বইটিকে প্রথম মার্কসীয় বই বলে গণ্য করা হয়) সাম্রাজ্যবাদীদের এই পুরনো তত্ত্বটাকেই আবার প্রচার করতে শুরু করলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের যে প্রচারে ভারতীয়রা কর্ণপাত করত না, সেই কথাগুলিই যখন একজন ভারতীয় বিপ্লবী নেতা, বিশেষ করে মার্কসবাদী নেতার মুখ দিয়ে বেরলো, তখন তা অনেকের নিকটই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো। রায়ের এই তত্ত্বগুলি পরবর্তীকালে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের কী ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা আর একটি অধ্যায়ে দেখতে পাবো।

রায়ের প্রথম কথা হলো—"১৮৫৭ সনের বিপ্লবের পরাজয়ের ফলে সামন্তশক্তির শেষ চিহ্নগুলি ধ্বংস হয়ে গেল।" রায় ইতিহাস লিখছেন, না আরব্য উপন্যাস লিখছেন? ইতিহাস বলে যে, বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ শাসকরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সামাজিক খুঁটিরূপে সামন্তশক্তিকেই অনেক সুবিধা-সুযোগ ক্ষমতা দিয়ে চিরস্থায়ীভাবে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এবং সাম্রাজ্যবাদ আজও সেই শক্তির সাহায্যে ভারতের জনসাধারণকে শোষণ করে চলেছে। এর পরেই রায় বলেছেন: "১৮৫৭ সনের বিপ্লব সিংহাসনচ্যুত রাজাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে একটা শেষ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা ছিল ক্ষয়প্রাপ্ত সামন্তপ্রথা এবং নবপ্রবর্তিত বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের মধ্যে একটা লড়াই।"[১]

রায় আরো বলেছেন যে, এই বিদ্রোহকে কিছুতেই জাতীয় আন্দোলন বলা চলে না, এটা ছিল প্রতিবিপ্লবী (counter revolutionary) সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ আর্তনাদ। রায় তারপর তাঁর নব উদ্ভাবিত মার্কসীয় তত্ত্ব বিকশিত করতে গিয়ে তাঁর নিজের স্ববিরোধিতার বিভ্রান্তিকর জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন—হ্যাঁ, বিদেশি শাসন, যা ভারতের সামাজিক অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে এই বিদ্রোহ যেটুকু ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সেটুকু পর্যন্ত এই বিদ্রোহকে বৈপ্লবিকই বলা চলে ; কিন্তু সামাজিকভাবে এটাকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনই বলতে হবে, কারণ এটা ব্রিটিশ শাসনের জায়গায় মুঘলদের বা মারাঠাদের পুনরুত্থিত সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে বসাতে চেয়েছিল।[২]

ডায়ালেকটিক্স-এর স্থানে সফিস্ট্রি-কে (কূটতর্ক) বসিয়ে রায় এই অপূর্ব খিচুড়িটি তৈরি করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে জনসাধারণের প্রধান শত্রু কে ছিল কোন শত্রুকে সর্বপ্রথম ধ্বংস করতে হবে, এবং সেই কাজের জন্যে কোন কোন শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে – এই মূল প্রশ্নটায় রায় কোনো গুরুত্ব দেন নি বলেই তিনি কতকগুলি তথাকথিত তাত্ত্বিক জঞ্জালের সৃষ্টি করে তার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। রায়ের একটা কৃতিত্ব হলো এই যে, তিনি একটা দেশের পদমর্যাদা (status, অর্থাৎ স্বাধীন, না পরাধীন) এবং তার গঠনতন্ত্র ও সমাজ ব্যবস্থা—এই দুটো পৃথক জিনিসকে একাকার করে ফেলেছেন। রায়ের কথাই স্বীকার করে নেওয়া গেল যে বিদ্রোহী নেতারা চেয়েছিলেন 'সামন্ত-তান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদেরই' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু সেটা তো স্বাধীন ভারতই হতো। একটা পরাধীন দেশের স্বাধীনতার পদমর্যাদা (status) স্থাপন করাটাই তো তার পক্ষে সর্বপ্রথম কাজ। তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে, সেই দেশ সামন্ততান্ত্রিক হবে, না গণতান্ত্রিক হবে, না সমাজতান্ত্রিক হবে? একটা দেশ যদি স্বাধীন না হয়, তাহলে সে ধনতান্ত্রিক হবে, না গণতান্ত্রিক হবে, না সমাজতান্ত্রিক হবে, এসব প্রশ্নের সমাধান করা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। '৫৭ সনের পর আরো একশো বছর পরেও – যখন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছে – ভারত তখনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে পারেনি কেন? ৫৭ সনের স্বাধীন ভারতে যদি 'সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদই' প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে ভারতের কি এই রকম দুর্গতিই হতো? রায়ের মতে '৫৭ সনের ভারতে হয় ভারতীয় 'সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ,' নতুবা প্রগতিশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ – এছাড়া আর কোনো বিকল্পই ছিল না। আরো অনেক দেশের মতো সামন্ততান্ত্রিক ভারতের যে গণতন্ত্রের জন্যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হতে পারত, ৬০।৭০ বছর ধরে 'প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের' আবেদন-নিবেদনের ধামাধরা ভিক্ষাবৃত্তি করে

কাটাতে হতো না—সে সম্ভাবনাটাকে রায় ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি।

এই বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হলো, সে সম্বন্ধে রায় বলেছেন, তার কারণ হলো তার বাস্তব প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র (objectively reactionary character)। 'এটা যদি জাতীয় বুর্জোয়াদের অগ্রসর সামাজিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা চালিত একটা প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন হতো, তাহলে এটাকে দমন করা সম্ভব হতো না।'[৩] 'ইতিহাসে বিদ্রোহ-বিপ্লবের পরাজয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৮৪৮ সনের বিপ্লব, প্যারিস কমিউন, ১৯০৫ এর রুশ বিপ্লব, ১৯১৯-এর জার্মানি ও হাঙ্গারির বিপ্লব, স্পেইনের বিপ্লব,—সবই পরাজিত হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলিও কি প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের দ্বারা চালিত হয়েছিল, তাদেরও কি কোনো অগ্রগামী সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না? রায়ের তত্ত্বের আর একটি অনুসিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, যেসব আন্দোলন সফল হয়েছিল—যেমন হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট আন্দোলন—তার নেতৃত্ব প্রগতিশীল ছিল বলেই সফল হয়েছিল। রায়ের মত মেনে নিলে এটাও বলতে হয় যে, ১৯১৯ সনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার যুদ্ধে সামন্ততান্ত্রিক রাজা আমানুল্লার জয়লাভ করা একেবারেই উচিত হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বই মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের কারণ নয়। এই বিদ্রোহ পরাজিত হয়েছিল অনেকগুলি কারণে, তার মধ্যে নেতৃত্বের প্রশ্নটা নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের একটা সময়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভাগ্য একটা সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছিল—সেই সময় ক্যানিং বলেছিলেন, যদি গোয়ালিয়ারের রাজা বিদ্রোহে যোগ দেন তাহলে ইংরেজদের ভারত থেকে তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। গোয়ালিয়ারই হোক, নাইজাই হোক, পাতিয়ালাই হোক, অথবা দুই একটা প্রদেশই হোক, যদি বিদ্রোহের পতাকা উড়োতো, তাহলে যুদ্ধে ভারসাম্য বিদ্রোহীদের দিকেই ঝুঁকে পড়ত এবং সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই ভারতের জয় হতে পারত।

এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো একজন ভারতীয় বিপ্লবী ভারতে ইংরেজ শাসনের যেভাবে গুণকীর্তন করেছেন, তা সাম্রাজ্যবাদী-রাও করতে পারেনি। রায়ের প্রধান ব্যক্তব্যগুলি হলো[৪] : ক. যতটা ব্রিটিশ সরকার না হোক, তার অগ্রগামী সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাগুলির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল ; খ. এই প্রগতিশীল চিন্তাগুলিকে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা অভিনন্দিত করেছিল এবং সানন্দে গ্রহণ করেছিল এবং ইংরেজরা যদি ভারতে নাও আসত, তাহলেও যে করেই হোক তারা সেগুলি আয়ত্ত করত ; গ. এই ইংরেজি শিক্ষা অজ্ঞাতসারে এমন একটা সামাজিক শক্তির সৃষ্টি করেছিল যার ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল শুধু ব্রিটিশ রাজত্বকেই ধ্বংস করা নয়, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদেরও বিরোধিতা করা ; ঘ. যদিও এই সামাজিক শক্তিটার

তখনো শৈশবকাল চলছিল, তবুও তা ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বলিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছিল ; ঙ. ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের তাৎপর্য হলো – এই বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রায়ের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট : ভারতে প্রগতিশীল আধুনিক চিন্তা ও কাজের প্রবর্তক হলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা, এক কথায় ইংরেজরা ভারতে একটা 'গতিশীল সমাজব্যবস্থা' (dynamic social system) প্রবর্তন করেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের (civilising mission-এর প্রশংসা কি করে সম্ভব হলো? মার্কস ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে, বিশেষ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলি ভারতের ইতিহাস ও রাজনীতি বোঝার জন্যে অপরিহার্য। রায় হলেন ভারতের প্রথম মার্কসবাদী ও তাঁর বই *India in Transition* হলো বর্তমান ভারতের প্রথম মার্কসবাদী ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা। কিন্তু রায় মার্কসকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি বলে তিনি ভারত সম্বন্ধে মার্কস-এর তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অপব্যাখ্যা করেছেন।

ভারত সম্বন্ধে মার্কস তাঁর প্রথম প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, ইংরেজ শাসন ভারতে একটা 'সামাজিক বিপ্লব ঘটাচ্ছিল' এবং ইংলণ্ড 'সেই বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র' হিসেবে কাজ করছিল।[৫] এর কিছুদিন পরে মার্কস আবার লিখলেন : "ভারতে দ্বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করাই ছিল ইংলণ্ডের কাজ : একটা ধ্বংসমূলক ও অন্যটা উজ্জীবনমূলক (regeneration)— পুরাতন এশীয় সমাজব্যবস্থার ধ্বংস করা ও এশিয়ার পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার 'বৈষয়িক ভিত্তি স্থাপন করা।'[৬]

ভারতের প্রধান সমস্যা ছিল (এবং এখনো রয়েছে) যে ভারতে কোনোদিন সমাজবিপ্লব ঘটেনি। মান্ধাতা আমলের বর্ণাশ্রম ধর্ম (শ্রমবিভাগের অপরিবর্তনীয়তা) এবং কৃষি ও গৃহশিল্পের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ—এই দ্বিবিধ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ভারতের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য সংস্থাগুলি (self-sustained village republics)। এই প্রাণহীন জরাজীর্ণ অচলায়তনগুলির অনড় সমাজব্যবস্থার মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার বা নতুন কর্মোদ্যমের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মার্কস এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, একথা যেন না ভুলি যে, এইসব শান্ত-সরল গ্রাম্য সংস্থাগুলি (idyllic village communities) যতই নিরীহ মনে হোক, সেগুলিই ছিল চিরকাল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারের ভিত্তি, মানুষের মনকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা।"[৭] এই পচাগলা

সমাজব্যবস্থাটা ভেঙে দিয়ে কালোপযোগী নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপন করার দায়িত্ব ছিল ভারতবাসীর উপরই, কিন্তু তারা তা করেনি। ইংরেজরা শুধু ধ্বংসাত্মক কাজটাই করল এবং সেটা করল অচেতনভাবে, কারণ তাদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বিপ্লব ঘটানো নয়, তার সঙ্গে বাণিজ্য করতে ও তাকে লুণ্ঠন করতে—'তারা প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে।'

মার্কস বলেছেন : "দেশীয় সংস্থাগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে ব্রিটিশ সেই সভ্যতাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। তাদের ভারত-শাসনের ইতিহাসের পাতাগুলিতে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া একেবারেই চোখে পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।"[৮]

পূর্বে ভারতে অনেকবার বিদেশির আক্রমণ ঘটেছে, অনেক যুদ্ধ, রক্তপাত, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু "ব্রিটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্থানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইয়োরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন করে...এক দানবীয় জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে।"[৯] ভারতের সেকেলে সমাজ ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দিয়ে ইংরেজরা অচেতনভাবে যে ধ্বংসাত্মক বিপ্লব ঘটালো, তার জন্যে মার্কস সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কোনো civilising role দেখতে পান নি এবং রায়ও তাঁর অনুগামীদের মতো কখনো বলেন নি যে, ইতিবাচকভাবে ইংরেজশাসন ভারতে কোনোপ্রকারের 'গতিশীল সমাজব্যবস্থার' পত্তন করেছিল ; বরং সাম্রাজ্যবাদ যে সেরকম কোনো কাজই করতে পারে না, সেকথাই বার বার বলেছেন।

মার্কস বলেছিলেন, ইংরেজ শাসনে ভারতে উজ্জীবনের ক্রিয়া যদিও একেবারেই চোখে পড়ে না, তবুও তাদের নিজেদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাবার তাগিদেই উজ্জীবনের সেই ক্রিয়া শুরু করতে হয়েছিল। সেগুলি হলো—ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করা ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনী গঠন করা, স্বাধীন সংবাদপত্র স্থাপন করা, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচলন করা, 'অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে' একটি শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম দেওয়া, যারা 'সরকার পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন ও ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে শিক্ষিত', 'ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ' সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থাটাকে দূর করে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করা ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে মার্কস সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, ইংরেজরা ভারতে অগ্রগতির বৈষয়িক অবস্থাগুলি সৃষ্টি করেছে মাত্র, তার বেশি কিছু তারা করতে পারে না, সেই অগ্রগতিকে কেবলমাত্র ভারতীয়রাই আনতে পারে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের

কবল থেকে মুক্ত করে : "হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করে দেবার মতো শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এইসব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পারে না।"[১০] ভারতকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করাই ছিল মহাবিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্যেই মার্কস-এঙ্গেলস এই বিদ্রোহের সাফল্য কামনা করেছিলেন।

মার্কস যে অর্থে ভারতে ইংল্যাণ্ডের regenerating mission কথাটা ব্যবহার করেছিলেন তা রায় মোটেই বুঝতে পারেন নি, এবং না বোঝার ফলে তিনি মার্কসের যে ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা যে ভারতের অনেক মার্কস-বাদীকে এখনো প্রভাবান্বিত করে চলেছে, তা দেখা গেল মহাবিদ্রোহের শত-বার্ষিকীর সময়।

একজন প্রগতিশীল ইংরেজ, লেস্টার হাচিনসন - যিনি মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী ছিলেন —তাঁর ভারত ইতিহাসের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যায় রায়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সে সময়ে ভারতে কোনো জাতিই ছিল না, সুতরাং এটা জাতীয় বিদ্রোহ হবে কি করে? ব্রিটিশ ধনতন্ত্র যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, এ বিদ্রোহ ছিল তারই বিরুদ্ধে, চরখা ও গোরুর গাড়ির যুগে ফিরে যাবার জন্যেই এই বিদ্রোহ।[১১]

অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মতোই জহরলাল নেহেরু ও মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন। তিনি মহাবিদ্রোহের গণচরিত্রকে অস্বীকার করেন নি, এবং এটা যে স্বাধীনতার যুদ্ধই ছিল, তাও বলেছেন, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তাঁর মতে এ বিদ্রোহ ছিল মূলত একটা সামন্ততান্ত্রিক বিস্ফোরণ মাত্র।[১২]

খ্যাতনামা মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রজনীপাম দত্ত *India To-day* নামক যে সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখেছেন—যে গ্রন্থটি ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে ইংরেজিতে যত বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ : তাতে তিনি ১০-১৫ লাইনের মধ্যেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন।[১৩] পাম দত্তের মতো একজন বিখ্যাত মার্কসবাদী তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক গবেষণা, অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ না করেই এবং বিনা যুক্তিবিচারে ভারতের সমগ্র ইতিহাসের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের এই সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মতো এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার এরকম একটা বিভ্রান্তিকর মূল্যায়ন কয়েকটি কথার মধ্যে করে দিলেন, তা কম দুঃখের কথা নয়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্বন্ধে রায়ের সূত্রায়নের সঙ্গে দত্তের হুবহু মিল রয়েছে। দত্তের বক্তব্যের সারমর্ম হলো : ক. এই বিদ্রোহের প্রধান চরিত্র ছিল তার ফিউডাল নেতৃত্ব, প্রতিক্রিয়াশীল রাজ্যচ্যুত রাজা ও সামন্ত শক্তিগুলির দ্বারা-তাঁদের হৃতরাজ্য ও অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ; খ. প্রতিক্রিয়া-

শীল নেতৃত্বের জন্যেই এই বিদ্রোহ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেনি, কাজেই এর ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য ; গ. তখনকার ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী—যারা ছিল ভারতের নবজাত প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি, তারা এটাকে সমর্থন করেনি, বরং ইংরেজ শাসনকেই তারা সমর্থন করেছিল।

দত্তের এই থিয়োরিগুলি, রায়ের মতোই একেবারে একপেশে, মোটেই দ্বান্দ্বিক (ডায়ালেকটিক্যাল) নয়, তাই সেগুলি বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্রোহী সামন্ততান্ত্রিক রাজারা রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন কাদের দ্বারা—কোনো ভারতীয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বা শ্রমিক-কৃষকদের দ্বারা, না বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের দ্বারা, তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন কোনো ভারতীয় প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে, না বিদেশি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ? দত্ত নিজেই স্বীকার করছেন যে, পুরাতন রাজারা বিদেশি আধিপত্যের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন (to turn back the tide of foreign domination), তা হলে এটা কি তাঁদের পক্ষে প্রগতিশীল কাজ হয়নি ? যদি প্রথমটা হতো তাহলে তাঁদের বিদ্রোহের চরিত্রটা নিশ্চয়ই প্রতিবিপ্লবী হতো এবং সেটাকে দমন করার ন্যায্য অধিকার নিশ্চয়ই ভারতের জনসাধারণের থাকত। কিন্তু, এক্ষেত্রে তা হয়নি। তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন ও লড়েছিলেন বিদেশি আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে। যদি সে কাজটা তাঁরা তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্যেই করে থাকেন, তখনকার অবস্থায় সে কাজটা প্রতিবিপ্লবী হয় কি করে ? সেদিনকার অবস্থায় এটাই তো হয়েছিল তাঁদের পক্ষে প্রগতিশীল কাজ, আর পক্ষান্তরে ভারতের নবজাত বুর্জোয়াশ্রেণীর 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীরা —যারা ভারতকে আরো একশো বছরের জন্যে পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে রাখতে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল, তারাই কি প্রতিবিপ্লবী ছিল না ?

সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে এসেছিল তাদের দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করার জন্যে নয়, ভারতকে শোষণ করার জন্যে ও তাকে দাস করে রাখার জন্যে। তা যদি হয়, তাহলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত থেকে সমূলে উচ্ছেদ করাই ছিল শ্রেণী-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। সুতরাং যেসব রাজারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করেছিলেন, যেসব রাজারা তা করেন নি তাঁরাই ছিলেন দেশদ্রোহী, সাম্রাজ্যবাদের গোলাম ও দালাল। '৫৭-সনে যদি বিদ্রোহী রাজারা তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারই করতেন, তাহলে আর যাই হোক না কেন, অন্তত ভারতকে আত্মসম্মান বর্জিত মেরুদণ্ডহীন, শক্তিহীন, মনুষ্যত্বহীন অবস্থায় আরো একশো বছর ধরে ঔপনিবেশিক বর্বরতার মধ্যে কাটাতে হতো না।

রায় ও দত্তের এতসব বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূলে রয়েছে—ঔপনিবেশিক ভারতের প্রধান শত্রুকে, ভারতের রাজাদের সামন্তবাদ না বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ—এই মূল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া। সেই যুগে ইয়োরোপে স্বাধীন দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্রই ছিল প্রধান শত্রু, তাই সেখানে প্রধান কর্তব্য ছিল সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্যে বুর্জোয়া শ্রমিক কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সেই যুগে ভারত ছিল একটা নিছক ঔপনিবেশিক দেশ, তাই তার প্রধান শত্রু, প্রধান দ্বন্দ্ব (principal contradiction) হলো বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতে সকল শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। সেই অবস্থায় সামন্ত শ্রেণীর, অন্তত তার একটা অংশের, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়াটা হতো স্বাভাবিক, সেটা প্রতিক্রিয়াশীল হবে কেন? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, রায় ও দত্তের নিকট ভারতের সামন্ততন্ত্রই ছিল ভারতের প্রধান শত্রু, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ নয়। তাঁদের মতে এটা ছিল 'সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততন্ত্রের' বিরুদ্ধে 'প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদের' লড়াই। তাঁদের একপেশে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই তাঁরা গাড়িটাকে আগে দিয়ে ঘোড়াটাকে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। মার্কস কিন্তু বিদ্রোহের চার বৎসর পূর্বেই বলেছিলেন, তখনকার ভারতের বাস্তব অবস্থায় সামন্তশ্রেণীর একটা অংশের পক্ষে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করা খুবই সম্ভব।[১৪]

এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির (approach) জন্যেই রায় ও দত্তকে মহাবিদ্রোহের প্রসঙ্গে মার্কসবাদের দ্বন্দ্ব তত্ত্বের বিরোধী একপেশেমির আশ্রয় নিতে হয়েছে। উভয়েই এই বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বটাকেই খুব বড় করে দেখিয়েছেন, এই নেতৃত্বটাকেই তাঁরা বিদ্রোহের প্রধান চরিত্র বলে চিহ্নিত করেছেন, এই নেতৃত্বের মাপকাঠি দিয়েই তাঁরা সমস্ত বিদ্রোহটাকে বিচার করেছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহের যেটা প্রধান চরিত্র—জনসাধারণের বহুদিন ব্যাপী ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণ-সম্পূর্ণরূপে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। এইরকম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে লেনিন লিখেছিলেন : "কু-তার্কিকরা অনেক যুক্তির মধ্যে একটিমাত্র যুক্তিকে বেছে নেয়। হেগেল বহুদিন পূর্বে সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে সব কিছুর জন্যই 'যুক্তি' দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ডায়েলেকটিক্স এই কথাই বলে যে, কোনো সামাজিক ঘটনাবলীর বিকাশের স্তরে তার বহুমুখী দিকগুলির অনুসন্ধান করতে হবে।"[১৫]

মার্কসবাদের এই মহান শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন বলেই, রায় ও দত্ত এরকম একপেশে আত্মগত (subjective) সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই কারণেই তাঁরা এই বিদ্রোহের প্রাথমিক তথ্যগুলিকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন। দত্ত বলেছেন : "বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের জন্যেই এটা ব্যাপক ভাবে জনসমর্থন লাভ করেনি, সুতরাং এটার ধ্বংস ছিল

অনিবার্য।" এই কথাগুলি আদৌ ঐতিহাসিক সত্য নয়। এত ব্যাপক লক্ষ লক্ষ লোকের জনসমর্থন, অস্ত্রহাতে লড়াই করার সমর্থন, রণক্ষেত্রে নিজেদের জীবন দিয়ে সহস্র সহস্র লোকের সমর্থন, '৫৭-র পূর্বে বা পরে ভারতের ইতিহাসে আর কোন আন্দোলন পেয়েছিল, সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসেই বা এরকম ব্যাপক সক্রিয় জনসমর্থন পাওয়া আন্দোলনের নজির আর কটা পাওয়া যায়? প্রকৃতপক্ষে, ভারতকে মুক্ত করার জন্যেজনসাধারণের ব্যাপক ও সুদীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামই ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (factor)।

একপেশে চিন্তার ফলে দত্ত কিরকমভাবে তাঁর নিজের স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছেন, তার একটা উদাহরণ: তিনি বলেছেন—"...ভারতীয় বুর্জোয়ারা যদি অন্যান্য যে কোনো চিন্তাধারার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তপোবনে বসে (in monastic seclusion) কেবলমাত্র সংস্কৃত বেদের শিক্ষাই পেত, তাহলেও নিশ্চিতভাবেই সংস্কৃত বেদের মধ্যেই তারা তাদের সংগ্রামের অনুপ্রেরণামূলক নীতিগুলি ও স্লোগানগুলি পেত।"[১৬] খুবই ঠিক কথা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে—ভারতে বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিকাশ যখন সুনিশ্চিতই ছিল তখন সামন্ততন্ত্রাধীনে স্বাধীন ভারতে প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ কি সম্ভব হতো না? ইয়োরোপেও তো সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই বিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তা জন্মগ্রহণ করেছিল ও বিকাশলাভ করেছিল? তাহলে '৫৭ সনের বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি বলে এত নিন্দা কেন?

রায় ও দত্ত হচ্ছেন মার্কসবাদী; সুতরাং মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃত্ব, জনসাধারণের ভূমিকা ইত্যাদি প্রশ্নে কি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা জানা দরকার। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই পোল্যাণ্ড হাঙ্গেরি, ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৮৪৮ সনের বিপ্লবের সময় জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটা সর্বাগ্রে এসে যায়। সেই সময় মার্কস বলে ছিলেন যে, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্যে জার্মানদের 'তলোয়ার নিয়ে নিয়ে' লড়তে হবে; ১৭৭২ সনে স্বাধীন পোল্যাণ্ডকে বিভক্ত করে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যে অংশগুলি নিয়েছিল, তা তাদের ফেরৎ দিতে বাধ্য করতে হবে; রুশ সম্রাটকেও তাঁর অংশটা ফেরৎ দিতে বাধ্য করতে হবে। তার জন্যে হয়তো রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যেতে পারে, কিন্তু তার ফলে গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হবে, বিপ্লবী জার্মানির সৃষ্টি হবে এবং সেখানে 'সব থেকে কম শক্তিমানরা' ক্ষমতায় আসবে, একটা স্বাধীন শক্তিশালী পোল্যাণ্ডের সৃষ্টি হবে এবং কৃষিবিপ্লব নিশ্চিতভাবে সমগ্র পূর্ব-ইয়োরোপ ছড়িয়ে পড়বে। সেই সময় মার্কস-এঙ্গেলস্ এই মর্মে তাঁদের 'নয়ে রাইনিশে ট্সাইটুং'-এ যে গভীর

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলিই জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে মার্কসবাদের ভিত্তি।

মার্কস-এঙ্গেলস ভালো করেই জানতেন, সে সময়ে পোল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের বিকাশ কিছুই ঘটেনি, সেটা ছিল পূর্ণমাত্রায় একটা সামন্ততান্ত্রিক দেশ এবং সেখানকার স্বাধীনতার আন্দোলনও ছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারে বিশ্বাসী বড় বড় সামন্ত জমিদারদের সম্পূর্ণ নেতৃত্বাধীনে। তা সত্ত্বেও তাঁরা সে আন্দোলনকে পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতেন, যেসব পোলিশ ইউঙ্কাররা (জমিদাররা) তাঁদের দেশবাসীদের বিদেশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্যে পশ্চিম ইয়োরোপের বিপ্লবী লড়াইয়ের ব্যারিকেডগুলিতে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন পোলিশ আভিজাত্যের প্রতিনিধি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইস্পাতদৃঢ় হয়েছেন এবং "তাঁদের শ্রেণীর উর্ধে নিজেদের তুলতে, অথবা আরো সাম্প্রতিককালে পেরেছিলেন ক্লাউসেভিচ্ ও গ্লাইসেনা ও প্রাসিয়ান ইউঙ্কারতন্ত্র থেকে নিজেদের উর্ধ্বে তুলতে।"[১৭]

মার্কস-এঙ্গেলস পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নটাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। ১৮৬৬ সনের পোলিশ অভ্যুত্থানের পর প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউনসিলের মিটিং-এ যখন আলোচিত হয়, তখন বেলজিয়ামের একজন প্রতিনিধি বলেছিলেন যে, পোলাণ্ড যদি স্বাধীন হয় তাহলে শুধু তিনটি মাত্র শ্রেণী তা থেকে লাভবান হবে,—অভিজাত, নিম্ন-অভিজাত ও ধর্মযাজকরা। মার্কস সে সময় বলেছিলেন, যে তিনটি সাম্রাজ্য পোল্যাণ্ডকে ভাগাভাগি করে দখল করে বসে আছে—রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া—এরাই হলো ইয়োরোপের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি; পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা এদের শক্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত করবে। আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কস-এঙ্গেলস এইসব ঘটনার তাৎপর্য বিচার করতেন। ভারত ও চীনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিও তাঁদের ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই ছিল সব থেকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ। তারা বুঝেছিল যে, এই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সব থেকে শক্তিশালী আঘাত হবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

•১৮৫৩ সনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনদ পাশ করবার সময় মার্কস ভারত সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, তাতেই তিনি ভারতীয় বিপ্লবের প্রশ্নটাকে তুলে ধরেন। মার্কসই সর্বপ্রথম যিনি ভারতের বিপ্লবের কথা উত্থাপন করেন। তখনই তিনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক-আন্দোলনের একটা প্রধান সমস্যারূপে প্রশ্ন তুলেছিলেন—"Can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia?"—এশিয়ার সামাজিক অবস্থার একটা মৌলিক

বিপ্লব ব্যতীত মানবজাতি কি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?"[১৮] সে সময় তিনি আরো বলেছিলেন যে, ভারতে ইংরেজদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এখন ভারতকে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হলে তাকে নিজের দেশের কর্তৃত্ব বলপূর্বক নিজের হাতে তুলে নিতে হবে।[১৯]

ভারতে যখন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল, মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকেই খুব উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এর গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করেছিলেন। বিদ্রোহের খবর সংগ্রহ করার জন্যে লণ্ডন শহরে ছুটোছুটি করে তাঁরা সংবাদপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন। এঙ্গেলস মার্কসকে একটা চিঠিতে লিখছেন: "ভারতীয় সংবাদের জন্যে সারা শহর খবরের কাগজ খোঁজ করেছি। ...খবর এত ভয়ংকর কম ও সবই কানপুর থেকে কলকাতায় প্রেরিত তারবার্তার ওপর ভিত্তি করা যে তার ওপর মন্তব্য প্রায় অসম্ভব"।[২০] বিদ্রোহের সময় তাঁরা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আমেরিকার একটি দৈনিক পত্রিকায় লিখেছিলেন।[২১] এই প্রবন্ধগুলি বিদ্রোহের চরিত্র বুঝবার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। মার্কসের প্রথম প্রবন্ধ হলো ৩০ জুনের। তাতে তিনি লিখেছিলেন: "এর আগের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বিদ্রোহ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য-মূলক ও মারাত্মক লক্ষণে চিহ্নিত। এই প্রথম সিপাহি বাহিনী হত্যা করল তাদের ইয়োরোপীয় অফিসারদের; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে; হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লির সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে; বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এবং পরিশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বড় বড় এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে, বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারস্য ও চীন যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।"[২২]

মার্কসের এই প্রথম চিঠিতেই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি এই বিদ্রোহের শুরুতেই তার মূল চরিত্র ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে এই বিদ্রোহের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি হলো: ক হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের বহুদিনকার কলহ ত্যাগ করে তাদের সাধারণ শত্রু ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে; খ বিদ্রোহীরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ও ইয়োরোপিয়ানদের ধ্বংস করছে; গ. হিন্দু সিপাহিরা দিল্লিতে একজন মুসলমান সম্রাটকে সিংহাসনে বসিয়েছে; ঘ. বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে, বিদ্রোহ শুধু দু একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপকভাবে বহুস্থানে বিস্তার লাভ করছে, অর্থাৎ একটা জাতীয় যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে; ঙ. সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের এই বিদ্রোহ চীন ও পারস্যের মতো এশিয়ার অন্যান্য জাতিগুলির সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বিদ্রোহীরা একজন সামন্ততান্ত্রিক মুঘল বাদশাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল বলে এ বিদ্রোহকে মার্কস ফিউডাল বলে বরবাদ করে দেননি। কয়েকদিন পরেই মার্কস আবার লিখেছিলেন যে, ভারত সাম্রাজ্যের চিরাচরিত কেন্দ্রের ওপর বিদ্রোহীদের অবাধ দখলের একমাসের মধ্যেই বেঙ্গল আর্মি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে, সর্বত্রই সিপাহীরা বিদ্রোহ করছে এবং "যোগ দিয়েছে হাতিয়ার তুলে ধরা জনসাধারণের সঙ্গে" ও "ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে টলিয়ে দেওয়ার দিক থেকে বোধ করি প্রবলতম উত্তেজিকার কাজ করছে।"[২৩]

হিন্দুরা একজন মুসলমানকে সিংহাসনে বসিয়েছে—তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুদৃঢ় হবে, মার্কস এইভাবেই ঘটনাটাকে দেখেছিলেন। এই ঐক্যের অভাবেই ভারত পরাধীন হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, জাতিতে জাতিতে বিরোধ, রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ – এত সব বিরোধের সুযোগ নিয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত জয় করেছিল এবং এই বিরোধগুলির ওপর নির্ভর করেই ইংরেজরা এতদিন ধরে ভারত শাসন করেছে। তাই মার্কসের নিকট ভারতের মুক্তি আন্দোলনে প্রথম কথা হলো হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের ঐক্য।

এই চিঠিগুলিতে মার্কস বলেছেন যে, এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জনসাধারণের মধ্যেই একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। ৩১ জুলাই মার্কস লিখছেন: "বারাণসীতে একটি দেশীয় রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টায় বাধা দেয় একদল শিখ ও ১২ নং অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার বাহিনী। এ ঘটনাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের মতো শিখরাও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমস্বার্থে মিলেছে এবং এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমস্ত জাতির সাধারণ ঐক্য দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। ...ক্রমশ অন্যান্য ঘটনাও ফাঁস হবে যাতে এমনকি জন বুলেরও এ প্রত্যয় জন্মাবে যে, সে যেটাকে সামরিক মিউটিনি বলে ভাবছে, সেটা আসলে একটা জাতীয় বিদ্রোহ।"[২৪]

বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, হজরত বেগম, ঝাঁসির রাণী ও তালুকদাররা বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন বলে মার্কস-এঙ্গেলস এই চিঠিগুলিতে কোথাও এই বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক বা প্রতিক্রিয়াশীল বলেন নি। যেসব রাজা-জমিদাররা এতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সাহসের তাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, তাঁদের ফিউডাল বলে বরবাদ করে দেননি। বস্তুত, ফিউডাল, প্রতিক্রিয়াশীল কথা-গুলি এই প্রসঙ্গে কোথাও তাঁরা ব্যবহার করেন নি। পক্ষান্তরে, যেসব রাজারা এই বিদ্রোহে যোগ দেননি, যাঁরা ইংরেজদের সাহায্য করছিলেন, তাঁরা তাঁদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মার্কস বিদ্রোহের সময় যেসব নোট নিয়েছিলেন, তাতে একস্থানে তিনি লিখেছিলেন—"[ব্রিটিশের] এইসব জাঁকজমকের জবাব

এলো সিপাহি বিপ্লব : ১৮৫৭-৫৯।" (মার্কসেরই জোর)।[২৫] বিদ্রোহের প্রথমদিকে ২৫ মে'তে মার্কস নোট করেছেন : "সারা হিন্দুস্তানে বিদ্রোহের প্রসার; ..."ইংরেজ কুত্তাদের বিশ্বাস রক্ষা করলেন সিন্ধিয়া, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা নয়; পাতিয়ালার রাজা—ধিক্! ইংরেজদের সাহায্যার্থে বড় সেনাদল পাঠালো।"[২৬] আবার, ২ জুন, ১৮৫৮...নবীন সিন্ধিয়া (ইংরেজের পোষা কুকুর) কঠিন লড়াইয়ের পর নিজের সেনাদল কর্তৃক গোয়ালিয়র থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রাণভয়ে পালালো আগ্রায়।"[২৭] আর এক স্থানে : "ইংরেজের পোষাকুকুর নেপালের জঙ্গবাহাদুর।"[২৮]

যুদ্ধের একটা সংকটজনক মুহূর্তে যখন সিন্ধিয়ার উপর ভারতে স্বাধীনতা বা পরাধীনতা নির্ভর করছিল, যখন ক্যানিং বলেছিলেন—যদি সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দেন, তা'হলে কালই আমায় তল্পিতল্পা গোটাতে হবে—সেই সময় মার্কস লিখেছেন (১৮ সেপ্টেম্বর): "বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও ব্যাপার অতি গুরুতর হয়ে উঠেছে।...বস্তুত,...দুই মারাঠা রাজা হোলকার ও সিন্ধিয়া কি পথ নেয় তার ওপরই এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে।... হোলকার এখনো অটল থাকলেও তাঁর সৈন্যরা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে।...ইনি [সিন্ধিয়া] যুবক, জনপ্রিয়, তেজী, সমস্ত মারাঠা জাতির স্বাভাবিক নেতা সমাবেশ কেন্দ্র বলে তাঁকে ধরা হবে। তাঁর নিজের ১০ হাজার সুশৃংখল সৈন্য আছে। তিনি ব্রিটিশদের পক্ষ ত্যাগ করলে শুধু মধ্য-ভারত তাদের হাতছাড়া হবে তাই নয়, বিপ্লবী সংঘটা (revolutionary league) পাবে বিপুল শক্তি ও সংগতি। দিল্লির সম্মুখস্থ সেনাদলের পশ্চাদপসরণ অসন্তুষ্টদের হুমকি ও মিনতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত দেশবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে প্ররোচিত হতে পারেন।"[২৯]

মার্কসের এইসব উক্তি থেকে পরিস্কারভাবেই বোঝা যায় যে, ভারতের ৫৭-র পরিস্থিতিতে তার স্বাধীনতার সংগ্রামে রাজাদের নিকট থেকে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবি করেছিলেন। তারা সে ভূমিকা পালন করেনি বলে ও বিদেশি শাসকদের সাহায্য করেছিল বলে তিনি তাদের 'ইংরেজের কুকুর' বলেছিলেন। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রায় ও দত্তের দৃষ্টিভঙ্গির কত পার্থক্য।

লখনৌর পতনের পরও মার্কস এঙ্গেলস বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারেই হতাশ হননি; বরং এই গণবিদ্রোহ যে গেরিলা যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে তা দেখে তাঁরা আশান্বিত হয়েছিলেন। বিদ্রোহের একবছর পর এঙ্গেলস লিখছেন : "আর পরিশেষে শিখরা এমনভাবে কথাবার্তায় বলতে শুরু করেছে যা ইংরেজদের পক্ষে শুভ নয়। তারা অনুভব করছে যে, তাদের সাহায্য ছাড়া ব্রিটিশরা ভারত দখলে রাখতে পারত না · এ ধরনের প্রত্যয় থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতা প্রাচ্য জাতিদের কাছে একটা পদক্ষেপ মাত্র, একটা স্ফুলিঙ্গেই আগুন

জলে উঠতে পারে। মোটের ওপর, দিল্লি দখলে যেমন ভারতীয় অভ্যুত্থান দমিত হয়নি, তেমনি লখনৌ দখলেও নয়। গ্রীষ্মের অভিযানে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যাতে সামনের শীতে ব্রিটিশদের বহু পরিমাণে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে, এমনকি হয়তো বা পাঞ্জাবকে পুনর্দখল করতে হবে। কিন্তু অন্তত সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও, তাদের সামনে রয়েছে একটা দীর্ঘ ও হয়রানি গেরিলা যুদ্ধ—ভারতীয় রৌদ্রতলে জিনিসটা ইয়োরোপীয়দের কাছে খুব ঈর্ষার বস্তু নয়।"[৩০]

১৮৫৮ সনের মে মাসে এঙ্গেলস আবার লিখছেন : "বস্তুতপক্ষে, প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে যে ব্যাপারটার আসল মুশকিল সবে শুরু হচ্ছে। বিদ্রোহী সিপাহিরা যতক্ষণ বৃহৎ জনসংখ্যায় একত্র হয়ে থাকছিল বড় আকারে অবরোধও সম্মুখসমর, ততক্ষণ এরূপ যুদ্ধকর্মে ইংরেজ সৈন্যদের বিপুল উৎকর্ষের জন্যে সবকিছু সুবিধা থাকছিল তাদেরই। কিন্তু যুদ্ধ এখন যে নতুন চরিত্র নিচ্ছে তার সঙ্গে এ সুবিধা বহু পরিমাণে খোয়া যাবারই সম্ভাবনা।...ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন দিকে একটা গেরিলা লড়াই যেন ছড়াচ্ছে।"[৩১] ৪ জুনে এঙ্গেলস আবার লিখছেন : "যেমন লখনৌ বা দিল্লী, তেমনি রোহিলখণ্ডও নির্ধারক রণক্ষেত্র নয়। একথা সত্যি যে, সম্মুখযুদ্ধের অনেকখানি ক্ষমতাই অভ্যুত্থানের নষ্ট হয়েছে; কিন্তু বর্তমানের এই বিচ্ছিন্ন রূপেই তা বেশি দুর্জয় প্রতিরোধের নতুন নতুন অনেক কেন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখুন।"[৩২] বিদ্রোহের নতুন নতুন সম্ভাবনাগুলির দিকে তাকিয়ে এঙ্গেলস প্রশ্ন করছেন : "যদি বিদ্রোহী হিন্দুরা ইতিমধ্যে রাজপুতানা ও মারাঠাদেশে বিদ্রোহ জাগাতে পারে তাহলে কি হবে? ব্রিটিশ সেনাদলে, যাদের সংখ্যা ৮০হাজার বিজয়ের গৌরব যারা নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করছে এবং ব্রিটিশদের প্রতি যাদের মনোভাব খুব একটা অনুকূল নয়, সেই শিখরা যদি উত্থিত হয় তবে কি হবে?"[৩৩]

এর একমাস পরে আর একটা প্রবন্ধে এই গেরিলা যুদ্ধের সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে লিখছেন যে, যুদ্ধ এখন সেই পর্যায়ে প্রবেশ করছে যেটা হলো ইংরেজের পক্ষে সব থেকে 'বিপজ্জনক পর্যায়'। "ক্যাম্পবেল [ইংরেজ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চিফ] যখন রোহিলাখণ্ডের সীমান্তে ব্যস্ত তখন জেনারেল হোপ গ্র্যাণ্ট অযোধ্যার দক্ষিণে তাঁর সৈন্যদের একবার সামনে একবার পেছনে মার্চ করাচ্ছিলেন, ভারতীয় গ্রীষ্মের রোদে হয়রানির ফলে তাঁর নিজের শক্তিক্ষয় ছাড়া ফল কিছু হচ্ছিল না। অভ্যুত্থানীদের সঙ্গে দ্রুততায় পেরে উঠছিলেন না তিনি। অভ্যুত্থানীরা যেন সর্বত্রই রয়েছে শুধু যেখানে তিনি খুঁজছেন সেখানে বাদে, এবং যখন তিনি তাদের সামনে পাবেন বলে আশা করছেন, ততক্ষণে তারা বহু আগেই জমেছে তাঁর পেছনে। গঙ্গার নিম্নভাগে দানাপুর, জগদীশপুর ও বকসারের মাঝখানকার এলাকায়, তেমনি একটা ছায়ার পশ্চাদ্ধাবনে জেনারেল লুগার্ড ব্যস্ত। দেশীয়রা তাঁকে সর্বদাই ঘুরিয়ে মারছে এবং জগদীশপুর থেকে তাঁকে

টেনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ চড়াও হয় সে জায়গার রক্ষী সৈন্যদের ওপর।

"…এইভাবে হিমালয় থেকে বিহার ও বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা ছেয়ে গেছে সক্রিয় অভ্যুত্থানী দলে, ১২ মাস যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তারা কিছুটা পরিমাণে সংগঠিত এবং কয়েকবার পরাজিত হলেও প্রতি পরাজয়ের অনির্ধারক চরিত্রের দরুন ও ব্রিটিশদের স্বল্প সুবিধালাভের ফলে তারা উৎসাহিত। একথা সত্য যে, তাদের সমস্ত ঘাঁটি ও যুদ্ধকর্মের কেন্দ্র তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে; তাদের রসদপত্র ও কামানের বেশির ভাগই খোয়া গেছে: গুরুত্বপূর্ণ শহর সবই শত্রুর হাতে। কিন্তু অন্যদিকে এই বিপুল এলাকাটায় ব্রিটিশদের দখলে আছে কেবল শহরগুলি এবং খোলা মাঠের শুধু সেইটুকু যেখানে তার ভ্রাম্যমাণ বাহিনী গিয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৩৪]

এই প্রবন্ধেই এঙ্গেলস গেরিলাযুদ্ধের দুটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন: ক. ঘাঁটি অঞ্চল তৈরি করা ও তাকে রক্ষা করা, খ বিদ্রোহকে নতুন নতুন অঞ্চলে প্রসারিত করা। "শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধেই চলবে না। শীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজদের ব্যস্ত রাখার জন্যে দরকার যুদ্ধ কর্মের কেন্দ্র, রসদ, গোলন্দাজ ঘাঁটি গাড়া ছাউনি বা শহর; অন্যথায় পরের গ্রীষ্মে নতুন জীবন পাবার আগেই গেরিলা যুদ্ধ নিভে যেতে পারে। অভ্যুত্থানীরা যদি সত্যিই গোয়ালিয়ার হাতে পেয়ে থাকে, তবে সেটা একটা অন্যতম অনুকূল কেন্দ্র হতে পারে বলে মনে হয়।"[৩৫] বিদ্রোহীরা যখন প্রায় বিনা যুদ্ধে বেরিলি ও কাল্পি ছেড়ে দিল, তখন এঙ্গেলস তাদের ভৎর্সনা করেছিলেন। "কাল্পির বাহিনীটা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ শহরে যুদ্ধকর্মের একটি সুসম্পূর্ণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল; রসদ, বারুদ ও অন্যান্য মাল ছিল তাদের প্রচুর, ছিল অনেক কামান এবং এমনকি ঢালাইশালা ও বন্দুক কারখানা। কানপুরের ২৫ মাইলের মধ্যে হলেও ক্যাম্পবেল তাদের গায়ে হাত দেয়নি।"[৩৬] এই ধরনের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলিকে বিদ্রোহীরা নিশ্চয়ই রক্ষা করতে পারত।

"দ্বিতীয়ত, অভ্যুত্থানের ভাগ্য নির্ভর করছে তার প্রসারিত হতে পারার ওপর, ছড়িয়ে যাওয়া দলগুলি যদি রোহিলাখণ্ড পেরিয়ে রাজপুতানা ও মারাঠা রাজ্যে না যেতে পারে, আন্দোলন যদি উত্তরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে, সামনের শীতই দলগুলিকে ছত্রভঙ্গ ও তাদের ডাকাতে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে—আর জনসাধারণের কাছে তারা অচিরেই শাদামুখো আক্রমণকারীদের চেয়েও হয়ে উঠবে বেশি ঘৃণার্হ।"[৩৭] তাঁতিয়া তোপী সেই চেষ্টাই করেছিলেন।

অযোধ্যার নেতারা গেরিলাযুদ্ধের নীতিগুলি মেনে চলেন নি। এঙ্গেলস তাঁর শেষ প্রবন্ধে বলছেন: "…দেশীয়রা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে। গরমকালে বিশ্রাম নেওয়া যদি ইংরেজদের স্বার্থ হয়, তবে তাদের যথাসম্ভব জ্বালাতন

করাই ছিল অভ্যুত্থানীদের স্বার্থ। কিন্তু সক্রিয় গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন করে শত্রু অধিকৃত শহরগুলির যোগাযোগ ব্যাহত করার বদলে, ছোট ছোট দলের ওপর হামলা করে খাদ্যসন্ধানী ঘোড়সওয়ারিদের জ্বালাতন করার বদলে, রসদের জোগান অসম্ভব করার বদলে—যা ছাড়া ব্রিটিশদের দখলে কোনো বড় শহর বাঁচতে পারে না—ঐসব কাজগুলি করার পরিবর্তে দেশীয়রা কর বসিয়ে ও প্রতিপক্ষের দেওয়া অবসরটুকু উপভোগেই তুষ্ট থেকেছে। আরো চমৎকার যে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করছে বলেই মনে হয়। শান্ত কয়েক সপ্তাহের সুযোগে সৈন্য পুনর্গঠিত, গোলাবারুদের গুদাম ভরে নেওয়া বা খোয়া যাওয়া কামানাদির স্থান পূরণও তারা করেছে বলে বোধ হয় না।" কিন্তু তার পাশে অমর সিং-এর কৃতিত্বপূর্ণ লড়াইগুলি দেখে এঙ্গেলস উৎসাহিত হচ্ছেন. "বাঁশ ও ঝোপঝাড়ের এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল দখল করে আছেন অমর সিং, সক্রিয়তা ও গেরিলাযুদ্ধের জ্ঞান তাঁর মধ্যে যেন দেখা যাচ্ছে বেশি। অন্ততপক্ষে, চুপ করে ব্রিটিশদের জন্যে অপেক্ষা করে না থেকে যেখানে পারছেন সেখানেই তিনি ওদের আক্রমণ করছেন। যদি অযোধ্যার, অভ্যুত্থানীদের একটা অংশও তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়—যে ভয়টা অনেকেই করছে—তাহলে ব্রিটিশদের কপালে পূর্বের চাইতে অনেক বেশি দুর্ভোগ আছে।"[৩৮]

মার্কস এঙ্গেলসের এই প্রবন্ধগুলি থেকে একটা বিষয় খুবই সুস্পষ্ট যে, বিদ্রোহের নেতৃত্ব রাজা-জমিদারদের হাতে ছিল বলে তাঁরা এই বিদ্রোহটাকে, রায় ও দত্তের মতো একটা ফিউডাল, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহরূপে দেখেন নি। কারণ, সেই যুগে ভারতের প্রধান শত্রু কে ছিল—ব্রিটিশ শাসন না সামন্ততন্ত্র—এ সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। রায় ও দত্ত এই মৌলিক প্রশ্নটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। তাই তাঁরা দিল্লির সিংহাসনে একজন মুঘলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন, 'সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে' তাঁরা প্রধান শত্রু বলে ধরে নিলেন এবং 'প্রগতিশীল' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করলেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের নিকট ভারতের এই বিদ্রোহ ছিল প্রধানত ও মূলত উপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক দাসত্বকে ধ্বংস করার সংগ্রাম। তাই তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভারতের এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রবন্ধগুলিতে আমরা দেখতে পাই, ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের জাজ্বল্যমান আপোষহীন সংগ্রাম। ভারতের ক্রমবর্ধমান শোষণ ও দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও অবমাননার ও সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক চক্রের সমৃদ্ধির একটা প্রধান সূত্র হলো ভারতের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন। তাই মার্কস-এঙ্গেলসের মতে ভারতের প্রধান কর্তব্য হ'ল উপনিবেশিকতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

ভারতের এই স্বাধীনতাটাই ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের নিকট মুখ্য : তারপর স্বাধীন ভারতের সিংহাসনে একজন সামন্ততান্ত্রিক মুঘল বাদশাহ বসলেন, কি অন্য কেউ বসলেন এ প্রশ্নটা ছিল তাঁদের নিকট গৌণ। ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তন্ত্রের অবশেষ জীইয়ে রাখছিল ইংরেজ শাসকরা এবং এখনো সাম্রাজ্যবাদই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে তার সামাজিক খুঁটিরূপে সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে ; সামন্ততন্ত্রই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান মিত্র। মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল বিশ্ব-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ ; ভারতের এই জন-সাধারণ সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজের শক্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ধ্বংস করে নিজেদের দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে গণতান্ত্রিক পথে চলবার শক্তিও তারা অর্জন করতে পারত, তা দিল্লির সিংহাসনে বাহাদুর শাহই বসুক বা নানাসাহেবই বসুক। বন্দুকের নলই হলো রাজনীতির উৎস (Politics comes out of the barrel of a gun) – কথাটা ইতিহাসের সত্য।

বিদ্রোহের সময় মার্কস ও এঙ্গেলস সব থেকে বেশি উৎসাহিত হয়েছিলেন এই দেখে যে – "জনসাধারণ শুধু সক্রিয়ভাবেই নয়, অতি উৎসাহের সঙ্গে বিদেশির বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দিচ্ছে। ইংরেজ শাসকরা যখন প্রচার করছিল যে এটা শুধুমাত্র সিপাহিদের একটা বিদ্রোহ, মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের প্রতিটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে এটা শুধু সিপাহিদের নয়, এটা প্রধানতঃ একটা গণবিদ্রোহ, এটা ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে একটা জাতীয় বিদ্রোহ, জনসাধারণই এই বিদ্রোহের চালিকাশক্তি। মার্কসের নিকট ভারতের এই বিদ্রোহের গণচরিত্র ও তার গতিশীলতাই ছিল প্রধান কথা, তার নেতৃত্বটা নয়।

এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে মার্কস আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যে এটা একটা ঔপনিবেশিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, ইয়োরোপের বিপ্লবের মতো নয়, যদিও তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মার্কস লিখেছিলেন . "ভারতীয় বিদ্রোহের কাছ থেকে ইয়োরোপের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য আশা করা হবে একটা অদ্ভুত quid proquo (ভ্রান্তি)।"[৩৯] রায় ও দত্ত ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাপকাঠি দিয়েই ৫৭-র বিদ্রোহকে বিচার করেছেন।

মার্কস আরো দেখিয়েছিলেন যে, ভারতের এই গণবিদ্রোহ ইয়োরোপের আসন্ন বিপ্লবকে প্রভাবান্বিত করবে। এশিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ করে ভারতে ও চীনে যে গভীর পরিবর্তন ঘটছিল তা-মার্কসের মতে – অনিবার্যভাবে ইয়োরোপের বিপ্লবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। তাই মার্কস একটি চিঠিতে এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন (১৪ জানুয়ারি ১৮৫৮) : "ইংরেজদের যে লোকবল ও অর্থক্ষয় হচ্ছে – তাতে ভারত এখন আমাদের সেরা মিত্র – India is now our best ally।"[৪০]

নির্দেশিকা

১. *India in Transition*, p. 17
২. "...by no means could it be looked upon as a national movement. It was nothing more than the last spasm of the dying feudalism. In so far as it aimed at the over throw of foreign domination, which had obstructed the social growth of the people, the rovolt of 1857 was revolutionary but socially it was a reactionary movement, because it wanted to replace British rule by revived feudal imperialism, either of the Mughals or the Marathas." (*Ibid*, p. 161)
৩. *Ibid* p. 161.
৪. "It was provoked by a fierce spirit of social reaction, being a revolt not against the British Government in particular, but against the advanced social and political ideas it embodied the ideas which were hailed by the intellectual middle-class of India, because the latter was materially prepared for them and would itself have evolved them, had they not been brought into the country through the agency of a foreign conqueror.

"Inadvertantly, it [western education] let loose that dpnamic social force which was destined to prove eventually mortal to the British and in order to be able to fulfil its historic mission, had to prove itself an enemy of the native reactionary elements which stood on the way of progress in the name of national culture and tradition. As a result of this policy of introducing western education, a class of intellectuals with modern thought and progressive tendencies had come into existance already in the thirties of the 19th century.

Still in its infancy, this progressive element showed signs of vinour in social religious reformism. ...The social significance of the Revolt of 1857 was the reaction it embodied against thig revolutionary force, which had not appeared as such till then, but which was the harbinger of a new Ineia to be dominated neither by a foreign imperialism however liberal, nor by the native conservatism however glorified." (pp 162-64)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে "let loose a dynamic social force" এবং "advanced social and political ideas" এনে দিল—রায়ের এই স্থত্রায়নের সঙ্গে তিনি ১৯২০ সনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে থিসিস দিয়েছিলেন তার অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাতে রায় বলেছিলেন : "Foreign domination has obstructed the free development of the social forces, therefore its overthrow is the first step towards the revolution in the colonies." (*Documents of the History of the Communist Party of India*, by G. Adhikary, vol. I, pp. 184-85)

৫. মার্কস : 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন', ১০ জুন, ১৮৫৭
৬. —'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল', ২২ জুলাই, ১৮৫৭
৭. 'ভারতে বৃটিশ শাসন,' ১০ জুন, ১৮৫৭
৮. 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল', ২২ জুলাই ১৮৫৭
৯ 'ভারতে বৃটিশ শাসন, ১০ জুন, ১৮৫৭
১০. 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল।'
১১. ...it was not a national war because as yet there was no nation in India, although the unifying policy of the British was rapidly creating one. It was a revolt precipitated by the revolutionary changes introduced by British capitalism in India. ...Historically considered, it was a revolt against nationalism and against modernity. It was an attempt to turn the clock of history back to feudal isolation and to feudal tyranny, to the handloom and the spining wheel and to primitive methods of transport and communication." (Lester Hutchinson, *The Empire of the Nawabs*, 1937, p. 136)

১২. "It was much more than a military mutinv and it spread rapidly and assumed the character of a popular and a war of Indian Independence. ...Essentially it was a feudal outburst, headed by feudal chiefs and their followers and aided by the wide spread anti foreign sentiment." (*Discovery of India*, Calcutta, 1946, p. 383).

১৩. "The rising of 1857 was, in its essential character and dominant leadership, the revolt of the old conservative and feudal forces and dethroned for their rights and privileges whice they saw in process of destruction. The reactionary character of the rising prevented any wide measure of popular support and doomed it to failure. Nevertheless, even so the rising bare the eepth of mass discontent and unrest beneath the surface, and created an alarm in the British ruler., the tradition of which remains" (R. P. Dutt, *India To-day*, Indian ed. 1947, p. 253)

"the revolt of 1857 was the last attempt of the decaying feudal force, of the former rulers of the country, to turn back the tide of foreign domination As has been already pointed out, the progressive forces of the time, of the educated class, representing the nascent bourgeoisie, supported British rule ag.inst the Revolt. The revolt was crushed ; but the lesson was learned." (*Ibid*, p. 358)

১৪. Leaving aside all these arguments, which state in so many words that the native princes are the strongholds of the present abominable English system and the greatest obstacles to Indian progress, I come to Sir Thomas Munro and Lord Elphinstone, who were at least men of superior genius, and of real sympathy for the Indian people. They think that without a native aristocracy there can be no energy in any other class of the community, and that the subversion of that aristocracy will not raise but debase a whole a people. They may be right as

long as the natives, under direct English rule, are systematically excluded from all superior offices, military and civil. Where there can be no great men by their own exertion, there must be great men by birth, to a conquered people some greatness of their own." (Marx, *East India Question*, 1853 ; Marx-Engels, *On Colonialism*, Moscow, pp. 67-68)

১৫. Lenin, *Collapse of the Second International* (Collected Works, vol. 21, p. 218)

১৬. *India To-day*, p. 251

১৭. Franz Metsing, *Karl Marx*, p. 163

১৮. *British Rule in India, On Colonialism*, p. 37

১৯. "The Indians will not reap the fruits of the new element of seconday scattered among them by the British bourgeoisie, till in Great Britain itself the now ruling classes shall have been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindus themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether." (*On Colonialism*, p. 80)

২০. 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-৫৯,' পৃ. ২১৫

২১ এই প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় *New York Daily Herald Tribune*-এ। তারপর প্রায় ১০০ বৎসর এই প্রবন্ধগুলি অজ্ঞাত ছিল। মস্কোর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট ১৯৫৯ সনে প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে একটি বইতে প্রকাশ করে রুশ ভাষায়। তার ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়। বইটির নাম দেওয়া হয় *The First Indian War of Independence 1857-59*. মার্কস বা এঙ্গেলস এই নাম দেননি, এই কথাগুলিও তাঁরা এই প্রবন্ধগুলিতে কোথাও ব্যবহার করেন নি, তাই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—মস্কোর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনষ্টিটিউটের এই নাম দেওয়ার কি অধিকার আছে? মার্কস তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই বলেছেন, সিপাহি ও জনসাধারণ বাহাদুর শাহকে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়েছে, তারা তাঁকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে, ইংরেজদের তারা ধ্বংস করছে ও দিনের পর দিন ধরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এ যদি স্বাধীনতার যুদ্ধ না হয় তাহলে এটা কিসের যুদ্ধ ছিল? আর কোনটা তাহলে স্বাধীনতার যুদ্ধ?

২২. ঐ, পৃ. ৪১

২৩. ঐ, পৃ. ৪৬

২৪. ঐ, পৃ. ৫৭

২৫. ঐ, পৃ. ১৯৭

২৬. ঐ, পৃ. ১৯৯

২৭. ঐ, পৃ. ২০৫

২৮. ঐ, পৃ. ২০৫

২৯. ঐ, পৃ. ১০২

৩০. ঐ, পৃ. ১৫৫

৩১. ঐ, পৃ. ১৬৭-৬৮

৩২. ঐ, পৃ. ১৭৩

৩৩. ঐ, পৃ ১৭৪

৩৪. ঐ, পৃ. ১৮৩-৮৪

৩৫. ঐ, পৃ. ১৮৩-৮৪

৩৬ ঐ, পৃ. ১৮৩

৩৭ ঐ, পৃ. ১৮৭

৩৮ ঐ, পৃ ১৯৩

৩৯. ঐ, পৃ ৬৬

৪০ ঐ, পৃ. ২১৭

৪

মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকীতে বুদ্ধিজীবী

ইংরেজ ইতিহাসবিদরা ভালোভাবেই জানতেন যে, মহাবিদ্রোহ ঘটেছিল প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন ছিল প্রগতিশীল ও উদারপন্থী ইংরেজরা ভারতে রেলগাড়ি, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রচলন করেছিল, স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছিল, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন ও সতীদাহ বন্ধ করেছিল ইত্যাদি। ইংরেজদের এইসব প্রগতিশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধেই নাকি মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-মুসলমানরা বিদ্রোহ করছিল। কেই হচ্ছেন প্রথম যিনি বলেছিলেন যে রেলগাড়ি ও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনই হলো বিদ্রোহের কারণ এবং বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের নজির দিয়ে লিখেছিলেন যে, "ডালহাউসির শাসনকালে জেনানা মহলে প্রবেশ করার এই প্রচেষ্টাই হয়েছিল সর্বাপেক্ষা আতংকজনক।" ম্যালিসন ও ফরেস্টেরও এই একই মত।[১] কিন্তু কেই-ম্যালিসন-ফরেস্ট প্রচারিত এইসব গল্পগুলির যে বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না, তা ইংরেজ শাসকরা ভালো করেই জানতেন। তাঁদেরই একজন সার রিচার্ড টেম্পল সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, এই আজগুবি গল্পটা বিদ্রোহের পর বানানো হয়েছিল এবং তা নিয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক।[২] সে সময়ে ভারতের জনসাধারণ যে আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা বা প্রগতিবিরোধী ছিল না, সেকথা বাংলার তখনকার ছোটলাটকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।[৩] কিন্তু এসব সত্ত্বেও কয়েকজন ভারতীয় ইতিহাসজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী এমন কি 'প্রগতিশীলও' কেই-ম্যালিসন-ফরেস্ট প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারিত মিথ্যা গল্পগুলিকেই অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করতে শুরু করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই কাজে প্রধান উদ্যোগী হয়ে উঠলেন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী মানবেন্দ্রনাথ রায়। ১৯২২ সনে ভারত সম্বন্ধে প্রথম 'মার্কসবাদী' বইতে তিনি লিখলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসকরা প্রগতিশীল চিন্তাধারা বহন করত ও তার দ্বারা তারা ভারতে একটা প্রচণ্ড গতিশীল সামাজিক শক্তির (dynamic social force) সৃষ্টি করেছিল। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বিদ্রোহীরা প্রতি-বিপ্লবের কাজ করেছিল। "১৮৫৭-সনের বিদ্রোহের সামাজিক তাৎপর্য

হলো যে, এই বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়াশীলতার বাহকরূপে সেই বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধেই ঘটেছিল।"[৪]

আর একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, রজনীপাম দত্ত লিখলেন যে, এই বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলে তখনকার ভারতের উঠতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরূপে শিক্ষিত শ্রেনীর 'প্রগতিশীল শক্তিগুলি' ব্রিটিশ শাসনকেই সমর্থন করেছিলেন।[৫]

ভারতে ব্রিটিশ শাসন থাকা পর্যন্ত মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত, সাভারকার ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর বিশেষ কেউ লেখেন নি। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকীর সময় ভারতীয় ইতিহাসবিদরা বড় বড় বই লিখে ফেললেন। এঁরা প্রায় সকলেই, বিশেষ করে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, রায় ও দত্তের মতামতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই, কেই-ম্যালিসন-ফরেস্টদের মতটাকেই খুব উগ্রভাবে সমর্থন করলেন। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের এত গুণকীর্তন এত চমৎকারভাবে কোনো ইংরেজও করতে পারেনি। ড. সেন লিখলেন যে, ইংরেজরা ভারতে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল, তারা আইনের চোখে সকল ভারতীয়ের সমান অধিকার স্থাপন করেছিল, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করেছিল, ইত্যাদি আরো কত কি, এবং এই অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয়রা যদি জিতত, তাহলে তারা ইতিহাসের প্রগতির কাঁটাটাকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিত, সুতরাং প্রতি-বিপ্লবেরই জয় হতো।[৬] ড. সেনের কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করে ভারতের বিপ্লবকেই বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে যাঁরা সেই সময়ে এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও আরো দু-একজন মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বলেই বর্ণনা করেছেন।[৭] অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরীও এই মত সমর্থন করেই তথ্য সমৃদ্ধশালী দুখানি মূল্যবান বই লিখেছেন।[৮] কিন্তু অন্যান্য 'প্রগতিশীলরা' রায়, দত্ত, মজুমদার ও সেনের মতামতগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। বাংলার ও ভারতের প্রগতিশীল চিন্তা যে কত দুর্বল, কত দীন, কত আবেগপূর্ণ, কত ক্লীব তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই শতবার্ষিকীর সময়।

১৯৫৭ সনে 'পরিচয়' ছিল পশ্চিম বাংলায় সব থেকে প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী পত্রিকা বলেই পরিচিত। সেই হিসেবেই তার তৎকালীন সম্পাদক গোপাল হালদারের প্রবন্ধ 'আজি হতে শতবৎসর পূর্বে'-র গুরুত্ব দিতে হয়। প্রবন্ধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে মহাবিদ্রোহের (এতে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথাটাই আগাগোড়া ব্যবহার করা হয়েছে) শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা হলেও তার বেশির ভাগ বিষয়বস্তু হলো তৎকালীন বাঙালির কীর্তিকলাপ—বাঙালির রেনেসাঁস, বাংলা সাহিত্য, ইয়ং বেঙ্গল, বাংলার নীল বিদ্রোহ ইত্যাদি। গোপাল

হালদার লিখেছেন: "উত্তর ভারতের তুলনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায়, সাংস্কৃতিক বিকাশে, অর্থাৎ জীবনাদর্শে বাঙালী তখন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাঙালী রিনাইসেন্সের ক্রমবিকাশে (খ্রী. ১৮৫৭-৬৭) বাঙালী জীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে – সামন্ততন্ত্রের তারা ঘোরতর বিরোধী। উচ্চবিত্তের একাংশকে নিয়ে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উন্নত রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন গঠিত করছে। সাহিত্যে আধুনিক যুগধর্ম বা 'বুর্জোয়া সিস্টেমের' অপরাজেয়তা উপলব্ধি করে এই বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী শিক্ষায় দীক্ষায়, সাহিত্যে জীবনে তা আয়ত্ত করতে বদ্ধপরিকর। এর পরে কোন অন্ধ উত্তেজনায় বা অগ্রপশ্চাৎ বোধহীন রাজনৈতিক উন্মাদনায় তাঁরা বিচলিত হতে পারেন না। – লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে তাঁরা তাতে প্রমাদই গণবেন।"

কথাগুলি মাত্রাতিরিক্ত অত্যুক্তি ও ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন। সেই যুগে বাঙালি সামন্ততন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী কোথায় ছিল? বাংলার সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা – যাকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "বাঙালীর চিরস্থায়ী অভিশাপ" – সেই জমিদারি প্রথার ধ্বংসের কথা কেউ বলেছিলেন কি? এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও বলেন নি। বাঙালি শিক্ষিতেরা ছিলেন 'উন্নত রাজনীতিতে' বিশ্বাসী? তাহলে কি বুঝতে হবে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি, আপোষের রাজনীতি, ভিক্ষার রাজনীতি হচ্ছে উন্নত রাজনীতি, আর আপোষহীন সশস্ত্র রাজনীতি হচ্ছে অন্ধ উত্তেজনার রাজনীতি, নিকৃষ্ট রাজনীতি?

গোপাল হালদার বলেছেন যে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা 'সিপাহি বিদ্রোহে' যোগ দেয়নি – 'স্বার্থবশে ও বিপদের ভয়ে' নয় – ওটা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহ' ছিল বলে ও 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' ছিল বলে। "সামন্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি উদাসীন ছিলেন।… বুঝতে পেরেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই সিপাহী বিদ্রোহের নিষ্ফলতায়ও তাঁরা ব্যাহত বোধ না করে নীল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।"

বাংলার নীল-আন্দোলন ভারতের কৃষকদের মুক্তি আন্দোলনে একটা গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু তাই বলে নীল-বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো যায় না। দুটোর মধ্যে একটা মস্ত বড় গুণগত পার্থক্য রয়েছে।[১০]

তাছাড়া, নীল-বিদ্রোহে বাঙালি শিক্ষিতরা বীরের মতো 'ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন' – এ কথাগুলি কি ঐতিহাসিক তথ্য সম্মত? হরিশচন্দ্রের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া শিক্ষিত সমাজ নীল কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে যাননি। আদালতে অভিযুক্ত নীল-কৃষকদের মামলার সমর্থনে হরিশ্চন্দ্র বহু চেষ্টা করে নিজের টাকায় মাত্র একজন মোক্তার জোগাড় করতে পেরেছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ অনেকেই মৌখিকভাবে করেছিলেন বটে, কিন্তু আন্দোলন

চলাকালীন কৃষকদের প্রকৃত সাহায্যে বড় একটা কেউ এগিয়ে আসেন নি, দলগতভাবেও তাঁরা খুব কিছু করবার চেষ্টা করেন নি।[১১]

গোপাল হালদারের মতে বিদ্রোহীরা ছিল 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন', তাদের 'উচ্চবর্ণের গোঁড়ামির' জন্যে তারা বাঙালির 'মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি', তারা 'তাদের হৃদয়মন, বুদ্ধি ও চেতনা স্পর্শ করতে পারেনি'; তখন বাংলায় নবজাগরণের জোয়ার বইছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, রাজনৈতিক চিন্তায়, সাহিত্যে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে, এক কথায় আধুনিক ভাবাদর্শে তাঁরা হু-হু করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা, প্রগতিশীল চিন্তার ধারক ও বাহকরা, তাঁদের যুগধর্ম পালন করলেন না কেন, তাঁরা তাঁদের নেতৃত্ব দিয়ে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' জনসাধারণের হৃদয়মন জয় করলেন না কেন, তাদের চেতনা ও কর্মকে উন্নততর স্তরে নিয়ে গেলেন না কেন? এই ঐতিহাসিক কর্তব্যটাই অনেক দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা পালন করেছিলেন ও তাঁদের দেশকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সেই কর্তব্য পালন করতে পারেন নি, সেদিনও যেমন পারেন নি, পরবর্তীকালেও পারেন নি। রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার পরও তাঁরা ভারতের কোনো একটা মৌলিক সমস্যারও সমাধান করতে পারেন নি; জনসাধারণের 'কুসংস্কার', অশিক্ষা, দারিদ্র্য যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, বাংলা রেনেসাঁস 'বিশেষজ্ঞ' ও মার্কসবাদী বলে পরিচিত বিনয় ঘোষও মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান অভিমত থেকে ভারতীয় পাঠকদের বঞ্চিত করেন নি। তিনি তাঁর প্রবন্ধে[১২] বুদ্ধির অনেক কসরত দেখিয়ে 'প্রমাণ' করেছেন যে, মহাবিদ্রোহ যে প্রতিক্রিয়াশীল ছিল তার প্রধান প্রমাণ হলো প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাতে যোগ দেন নি। পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর ঔদ্ধত্য ও বিদ্যার দম্ভই এই প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিলিতি 'সাহেবদের' (এই কথাটা তিনি অনেকবার ব্যবহার করেছেন) উক্তি তাঁর নিকট বেদবাক্য। যেমন Hans Kohn 'সাহেব' তাঁর *History of Nationalism in the East* বইতে কি বলে যাননি যে প্রাচ্য দেশগুলিতে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়নি? সুতরাং বিনয় ঘোষ চ্যালেঞ্জ করে বলছেন—১৮৫৭ সনে ভারতীয়দের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে local patriotism থাকলেও 'হিন্দুস্থান', 'ভারতবর্ষ', 'আমার দেশ' এসব ধারণা আসবে কোথা থেকে? "সুতরাং উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি মনে করা এবং তার মধ্যে সর্বভারতীয় 'দেশপ্রেমের' (আধুনিক অর্থে) সন্ধান করা আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করার মতন অর্থহীন।"

বিনয় ঘোষ দম্ভ সহকারে বলে যাচ্ছেন যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ

যেমন ছিল না, অন্য কোনো উচ্চ আদর্শও ছিল না—তারা ছিল অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সামন্ততান্ত্রিক, ধর্মান্ধ, বর্বর: "ধর্মনাশের ও জাতমারার ভয়টাই ছিল ভয়ঙ্কর। মাটির পাত্রের বদলে ধাতুর পাত্র প্রচলনের ফলেই যদি বিহারে জেলখানায় বিদ্রোহের রিহার্সাল হয়ে যেতে পারে, তাহলে শুয়োর বা গরুর চর্বিমাখা কার্তুজ চালানোর চেষ্টায় 'বিপ্লব' হওয়াও বিস্ময়কর নয়।" "হিন্দুস্থানী ও রাজপুত সিপাহীদের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বর্মভেদ করে বাঙালীরা যদি সেদিন তাদের মর্মস্থলে স্বদেশপ্রেমের হোমাগ্নির কোন সন্ধান না পেয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য তাঁদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না।" এ হলো বাঙালি পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর চিরাচরিত জাতিদম্ভের ভাষণ, 'ছোটলোকদের' প্রতি 'ভদ্রলোকদের' ঘৃণার ভাষা সহজভাষায় অনুবাদ করলে তার অর্থ হয়—ওরা ছিল খোট্টা উড়ে, নেড়ে!

তারপর বিনয় ঘোষ বলছেন যে, ভারতে ইংরেজরা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিভূ, তারা ছিল ভারতে সংস্কারক, অতীতের অনেক আবর্জনা তারা ভস্মীভূত করে দিয়েছিল এবং এই কারণেই ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহিরা ক্ষেপে গিয়েছিল—"বিদ্রোহের একমাত্র কারণ না হলেও, অন্যতম কারণ হ'ল নব্য শিক্ষার প্রবর্তন ও সমাজ সংস্কার।"

বিনয় ঘোষের মতে 'সিপাহী' বিদ্রোহ ঘটেছিল কোনো অথ নৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে নয়, ঘটেছিল ধর্মনাশের ভয়ে, সনাতন ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম রক্ষা করার জন্য। 'ধর্মনাশের জিগিরটা যে কতখানি জোরালো ছিল' তা বলে গিয়েছেন ক্যানিং 'সাহেব', মেজর জেনারেল টাকার 'সাহেব' ও ক্যালকাটা রিভিউ-র 'সাহেবরা'। "The primary cause of the Bengal Mutiny has been the utter want of discipline and the spirit of insubordination inseparable from the Brahmanic caste system upheld in the Bengal Army." (*Calcutta Review*, 1857 December)—এই উদ্‌ধৃতিটি দিয়ে বিনয় ঘোষ বলছেন: "এই মূল বক্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর বা অসত্য ভাষণ বিশেষ নেই।" খুবই দুঃখের বিষয় যে, এই ভদ্রলোকটি সাহেব না হয়ে একজন নেটিভরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন! তৎকালীন বাংলার লেফটানেন্ট-গভর্নর হ্যালিডে বলেছিলেন, 'really educated natives' মহাবিদ্রোহে যোগ দেয়নি—এই কথাগুলি উদ্‌ধৃত করে এই really native-টির কী উল্লাস!

এই সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতটি আরো বলেছেন যে, আজকের মতো তখনকার বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও খুবই বিপ্লবী ছিলেন ও তাঁরা এতই কুসংস্কার মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, মধ্যযুগে ফিরে যাবার কথা ভাবতেই পারতেন না, তাঁদের বিদ্রোহে যোগ না দেবার এটাই ছিল প্রধান কারণ। "অতীতের এই কুৎসিৎ

কঙ্কালটাকে কবর থেকে তুলে সমাজের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করতে শিক্ষিত বাঙালীরা নারাজ ছিলেন।" অথচ সেদিনকার বুদ্ধিজীবীরা প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগীয় রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখদের 'গৌরবময় ঐতিহ্যের' কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন, সে সম্বন্ধে অতীতের কঙ্কালের কথা তোলা হয় না।

বিনয় ঘোষ আরো কতকগুলি চমকপ্রদ কথা বলেছেন, একেবারে ওরিজিনাল original – বিদ্যাসাগর আর সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন একই রকমের প্রগতিশীল ব্যক্তি।[১৩] তাঁরা উভয়েই বিদ্রোহে যোগ দেননি। সৈয়দ আহমদ ছিলেন 'প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের মুখপাত্র', কোনো 'শিক্ষিত মুসলমানই' বিদ্রোহে যোগ দেননি। গোপাল হালদারও বলেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখনো "কোন শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি।" এ কথার অর্থ হলো বাহাদুর শাহ, ফিরোজ শাহ, হজরৎ বেগম আজিমুল্লা, আহমদ উল্লা, খান বাহাদুর খান, নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিং প্রমুখ সকল বিদ্রোহী নেতারাই ছিলেন অশিক্ষিত! (যদি ইংরেজি শিক্ষাটাকে শিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়, তাহলেও স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে খান বাহাদুর খান, আজিমুল্লা ও আরো অনেক বিদ্রোহী নেতা সৈয়দ আহমদের চাইতে কম ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু এসব কথাগুলি জানা থাকলে সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতের ওরিজিনাল থিওরি দাঁড় করাতে অসুবিধে হয়।)

সেই সময়কার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নির্ভীকতা প্রমাণ করতে গিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ একটি মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেছেন। তিনি ভারতের ইংরেজ শাসকদের দুই ভাগ করেছেন – রক্ষণশীল ও উদারপন্থী: "শিক্ষিত বাঙালীরা এই শ্রেণীর গোঁড়া রক্ষণশীল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বদাই সংগ্রাম করেছেন···এদেশের রক্ষণশীল সনাতন পন্থীরা এই শ্রেণীর শাসকদের সঙ্গে সব সময় হাত মিলিয়েছেন এবং শিক্ষিত বাঙালী ও মধ্যবিত্তের বৃহত্তর অংশ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উদারপন্থী ইংরেজ শাসকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।·· রাজনীতি ক্ষেত্রে ও রণাঙ্গনে এই ধরনের কৌশল চিরদিনই সঙ্গত ও নীতিসম্মত বলে বিবেচিত হয়েছে। বাংলার সমাজ রণাঙ্গনে যুদ্ধমান বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা না হবার কোনো কারণ নেই।" মধ্যযুগীয় বলেই বুদ্ধিজীবীরা বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন, আর আধুনিক কায়দায় লড়ে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটাবার জন্যেই তারা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন: "কৌশল হিসাবে রাজানুগত্য প্রকাশ করাই তাই স্বাভাবিক।"

পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর পাণ্ডিত্যের দম্ভ, বাক-সর্বস্বতা ও বুদ্ধিবৃত্তির অসাধুতার কী চমৎকার উদাহরণ।[১৪]

আধুনিক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্য দু-জন বিনয় ঘোষের চাইতেও

আরো বেশি মৌলিক হবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রগতিশীল ছিল, তা এদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা উদারনৈতিক বিপ্লব ঘটাচ্ছিল। ১৮৫৭ সনের পর থেকে ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়। তাঁদের মতে "ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণটাই একমাত্র সত্য নয়, ইংরেজ শাসনে আমরা পেয়েছিলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার নূতন আলোক—পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সমাজ দর্শন, পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্প, এক কথায় বলা যেতে পারে আধুনিকতার ধারা ও প্রবাহ। ইংরেজ শাসনে এদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে উদারনৈতিক বা পরিবর্তন বা বিপ্লব হতে শুরু করে, তার গতিকে ত্বরান্বিত করা হয়, ব্যর্থ করাই ছিল বিদ্রোহীদের তৎকালে প্রধান লক্ষ্য।"[১৫]

নিজেদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাঠকদের একেবারে স্তম্ভিত করে দেবার জন্যে এঁরা আরো বললেন: "যে কারণে সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে Fronde-এর মত ব্যাপক অভ্যুত্থানও প্রতিক্রিয়াশীল, ঠিক সেই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রিক পরিবেশে ১৮৫৭-র ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থানও প্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়া।"[১৬]

মোট কথা হলো, মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকীর সময় দেখা গেল যে, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা—তাঁরা রক্ষণশীলই হোন, উদারনৈতিকই হোন, বা প্রগতিশীলই হোন[১৭]—তাঁরা ইংরেজ শাসকদের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁরা এতই গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করার কথা ভাবতেই পারেন না।[১৮]

নির্দেশিকা

১. Kaye, vol. I, p. 185, 190-91, Malleson লিখেছেন: "The determining cause of the Mutiny of 1857 was the attempt to force western ideas upon Eastern people." (*Indian Munity*, p. 4.) Forest-এরও একই কথা (vol. I, pp. 4-5)। ১৯৩২ সনে প্রকাশিত *Cambridge History of India* (vol. I, p. 169). এও বলা হলো যে স্কুল, কলেজ, রেল ইত্যাদি ইয়োরোপীয় সভ্যতার সুফলগুলি ভারতে প্রবর্তন করার বিরুদ্ধেই গোঁড়া ধর্মান্ধদের এই বিদ্রোহ। "More

provocative than settlements and annexations were other measures by which Dalhousie endeavoured to confer upon India the benefits of western civilisation. In the railways which he began to construct, the telegraph wire by which he connected Calcutta with Peshwar and Bombay, the canal which he linked to the sacred stream of the Ganges, Brahmans fancied that sorcery was at work."

২. This wss adduced after the outbreak of the mutinies, as a subsidiary reason to account for events which seemed unaccountably strange. It never had any real foundation, and after the lapse of time, is hardly worth discussing." (Sir Richard Temple , *Men and Events of my life in India,* 1882, p.105). সম্প্রতি মন্মথনাথ দাস কেই-র *Mutiny Papers* (যা হলো বহু মূল্যমান দলিলপত্রের সংগ্রহ, লণ্ডনে India House Library-তে সংরক্ষিত) পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "From the evidence gathered from the *Mntiny Papers* and other documents, a few things stand clear – that the people of India did not oppose the introduction of railways, electric telegraph or the modern post. That the movements in favour of popular education or female instrucion and even the widow remarriage started from inside India." ("Western Innovations and the Rising of 1857" In *Bengal Past and Present,* Jubilee Number, 1957, p. 71)

৩. আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ ঘটেছিল কিনা, তা জানতে চেয়েছিলেন এলেনবোরো। জবাবে হ্যালিডে লিখেছিলেন : "It was vain to talk of this great, but always impending, always inevitable mutiny as if it had been caused by a few schools in Hindusthan." (Sir Frederick Halliday's "Minute of 1858 on a Letter dated 28 April of 1858 written by Lord Ellenborough as President of the Board of Control.")

৪. M. N. Roy, *India in Transition,* 1922, p. 164

৫. R. P. Dutt, *India To-day*, 1947, p. 358

৬. "The English Government had imperceptibly affected a social revolution. They had removed some of the disabilities of women, they had tried to establish the equality of men in the eyes of the law, they had attempted to improve the lot of the peasant and the serf. The Mutiny leaders would have set the clock back. They would have done away with the new reforms, with the new orders, and gone back to the good old days when a commoner could not expect equal justice with the noble, when the tenants were at the mercy of the talukdars, and when theft was punished with mutilation In short, they wanted a counter-revolution."—(S. N. Sen *Eighteen Fifty-Seven*, pp. 412-13)

৭. *New Age*, 1957 August

৮. S. B. Choudhury, *Civil Rebellion in the Indian Mutinies*, 1857-59

৯ পরিচয়, ১৩৬৩ চৈত্র

১০. "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বা 'নীল বিদ্রোহের' সঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম দুটি আন্দোলন চলেছিল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। গভর্ণমেণ্টের নিকট ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই এদের পরিচালকগণ সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু সিপাহীযুদ্ধের প্রকৃতি হ'ল ভিন্নরূপ। এ একেবারে ইংরেজের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেই প্রভু হতে চাইল, আর ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে ধাক্কা দিল।" (যোগেশ বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ৭৫)

১১. প্রমোদ সেনগুপ্ত : 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' দ্রষ্টব্য

১২. 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ', দ্র নূতন সাহিত্য, ১৩৬৪ বৈশাখ

১৩ এই ধরনের 'প্রগতিশীল' উক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত ধৃষ্টতা ও মূল্যবোধহীনতা ছাড়া আর কি? বিদ্যাসাগর বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করেন নি বটে, কিন্তু যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো যে, তিনি বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন নি এবং ইংরেজদের সমর্থনও করেন নি। সৈয়দ আহমদ স্বদেশবাসী ও স্বধর্মীদের প্রতি সক্রিয়ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবতাবাদী, তাতে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই ছিল সর্বজনীন,

কোনো একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্যে নয়। পক্ষান্তরে, সৈয়দ আহমদের সব কর্মপ্রচেষ্টা ও ধ্যানধারণাই ছিল সাম্প্রদায়িক, তাও আবার সেই সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয়দের জন্যে, জনসাধারণের জন্যে নয়। বিদ্যাসাগর দেশের বিরুদ্ধে বা জনসাধারণের বিরুদ্ধে কোনো রকমের ক্ষতিকর কাজ করেন নি, কিন্তু সৈয়দ আহমদ সাম্রাজ্যবাদের divide and rule নীতির যন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছিলেন। গুণগতভাবেই রয়েছে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

১৪. এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের শুধু ভারতে নয়, দুনিয়ার সর্বত্রই এই একই বৈশিষ্ট্য। মার্কস ও এঙ্গেলস এদের ঘৃণার সঙ্গে বলতেন, পেটি-বুর্জোয়া ফিলিস্টাইন। এঙ্গেলস এদের সম্পর্কে লিখেছিলেন: "১৮৩০ সন থেকে জার্মানিতে, ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে সব রাজনৈতিক আন্দোলনেই অপরিবর্তনীয় ভাবে দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর লোক যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো বিপদ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত খুব বড় বড় কথা বলছে, বড় বড় প্রতিজ্ঞা করছে ও এমনকি ভয়ংকর ভয়ংকর শব্দও উচ্চারণ করছে; সামান্য বিপদ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভীত, সন্ত্রস্ত ও আপোষ ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে; আর যখনই দেখে যে আন্দোলনকে তাতিয়ে তুলেছিল. সেই আন্দোলনকে অন্য শ্রেণীর লোকেরা অধিকার করেছে ও গুরুত্ব দিয়েছে, তখনই তারা আশ্চর্য, উদ্বিগ্ন ও দোদুল্যমান হয়ে পড়ে; আর যখনই অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে তখনই এই ক্ষুদে বুর্জোয়ারা তাদের সংকীর্ণ অস্তিত্বের স্বার্থে সমগ্র আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; এবং সর্বশেষে যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা জয়ী হন, তখন এরাই তাদের লঘুচিত্ততার জন্যে বিশেষ করে বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়।" (*Marx-Engels Correspondence*, N. B. A., Calcutta, p. 22)

১৫. হরিদাস ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়: '১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ', পৃ. ২৬। অবশ্য এই তত্ত্বটা এঁদের নিজেদের নয়, একজন 'সাহেব' Lester Hutchinson-এর *Empire of the Nawabs* (p. 41) থেকে নেওয়া।

১৬. ঐ, পৃ. ২৫। এই Fronde-এর ব্যাপারটাও একজন 'সাহেবের' নিকট থেকে ধার করা এবং এক্ষেত্রেও স্বীকৃতি না দিয়ে: "In its passion and futility it (1857) was a fronde rather than a Risorgiments." (Percival Spear : *India, Pakistan and the West*, 1948, p. 162)। ভারতের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে Fronde-এর তুলনাটা একেবারেই প্রযোজ্য নয়—Fronde ছিল বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতায়

প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের নিজেদের দেশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (১৬৪৮-৫২), আর ১৮৫৭ ছিল বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বাধীনতার যুদ্ধ।

১৭ *Indian Speeches and Documents on British Rule 1821-1918* (selected and edited by T. K. Majumder), Calcutta University, 1937 – এই বইখানাতে দেখা যায় ব্রিটিশ বদান্যতার উপর ভারতীয় নেতাদের কী গভীর বিশ্বাস।

১৮. ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসজ্ঞ, অধ্যাপক জি. এস. সরদেশাই, বলেছেন যে, ইংরেজরা বিদ্রোহীদের প্রতি সুবিচার করেনি, বিদ্রোহের 'প্রকৃত ও বাস্তব' ইতিহাস আমাদেরই লিখতে হবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরাও যেন ইংরেজদের প্রতি অবিচার না করি – "It is a great sacrifice on the part of England to have voluntarily retired from India ··This goodwill of England we must not forget So while rewriting a fresh history of that great event in India's destiny, we must take great caution not to unnecessarily hurt British sentiment. We must instead do our best to secure British goodwill towards India...After all the events of 1857 are quite insignificant as compared to the tremendous planned development we have set before ourselves." (G. S. Sardesai, "Significance of 1857", in ISCUS – *Journal of the Indo-Soviet Cultural Socicety* – 1857 Centenary number, vol. IV, no 3, Bombay.)

৫

মহাবিদ্রোহের আন্তর্জাতিক প্রভাব

মহাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৪৮ সনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিফলতার পর সারা ইয়োরোপের জনসাধারণ তখন কতকগুলি রাজার স্বৈরাচারের দাপটে বিক্ষুব্ধ। মহাবিদ্রোহের সময় ইয়োরোপে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠছিল।[১] মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ ভারতের বিদ্রোহীদের সমর্থন জানিয়েছিল। পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের পক্ষেই ছিল।

সেই সময়ে বিভিন্ন দেশের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বিশেষ বিকাশ লাভ করেনি। আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা না থাকায় সংবাদ পৌঁছতে অনেক সময় লাগত। তা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে ভারতের বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক খবর থাকত। ইতিহাসজ্ঞ মীড লিখেছেন যে, এই বিদ্রোহ সর্বত্র একটা বিশ্বজনীন বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। "আমাদের এইভাবে বিপদগ্রস্ত হতে দেখে আইরিশ সংবাদপত্রগুলি আনন্দে চিৎকার শুরু করে দিল, এবং আমাদের মতো একটা শয়তান জাতির উপর এই বিদ্রোহ যে ভগবানেরই ন্যায়বিচার, সেকথা একজন ফরাসি লেখক ঘোষণা করলেন।"[২]

মহাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া স্বভাবত ইংল্যাণ্ডেই বেশি হয়েছিল। সেখানে কোনো শ্রেণীর লোকই এ ব্যাপারে খুব খুশি হয়নি। কবডেন, ব্রাইট প্রমুখের মতো গণতান্ত্রিক নেতারা মৌন হয়ে গেলেন, বিদ্রোহের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথাই বললেন না। লিবারাল পার্টির নেতা গ্ল্যাডস্টোন ১২ অকটোবর এক সভায় ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করলেন।[৩] শান্তিকামীদের মুখপত্র *Non-Conformist*, ১ জুলাইতে লিখলো যে ইংল্যাণ্ড যেভাবে পারস্য ও চীন আক্রমণ করে যে পাপ করেছে, ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ হলো তারই শাস্তি।

ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণীর মুখপত্র *Economist* বেশ বুঝতে পেরেছিল যে,

ভারতের এই বিদ্রোহ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ইয়োরোপের দেশগুলিতে যেরূপ গণজাগরণ দেখা যাচ্ছে, চীনের তাইপিং বিদ্রোহ ও ভারতের এই অভ্যুত্থান এই সাধারণ জাগরণের সঙ্গেই যুক্ত। এশিয়া ও ইয়োরোপে একই সময়ে এই জনজাগরণে তারা বিস্মিত হলো।[৪]

ইংল্যাণ্ডে সাধারণভাবে জনমত সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর পক্ষেই ছিল। ভারতীয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাধারণ ইংরেজদের আরো বেশি করে উত্তেজিত করার জন্যে *Times, Daily Telegraph, Morning Post, New Castle Chronicle* ইত্যাদি পত্রিকাগুলি সিপাহিদের 'নৃশংসতার' গল্পগুলিকে খুব ফলাও করে প্রচার করত ও তার প্রতিশোধ চাই বলে চিৎকার করত।[৫]

নৃশংসতার গল্পগুলি যে সকলেই বিশ্বাস করতেন, তা' নয়। ডিসরেইলি পার্লামেন্টে বলেছিলেন (২৭ জুলাই '৫৭): "নৃশংসতার বর্ণনাগুলি অধিকাংশই তৈরি করা।" *Times*-এ 'যুডেক্স' লিখেছিলেন (29 Jan.' 58): "অসম্মান ও অত্যাচারের গল্পগুলির বেশির ভাগই স্রেফ কল্পিত (pure imagination)।" ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক পত্রিকা *Reynold's News fapers* বিদ্রোহীদের মোটামুটি-ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল।[৬]

ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা চার্টিস্ট (chartist) আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৮৪৮ সনে ইয়োরোপের বিপ্লবের পরাজয়ের সময় ইংল্যাণ্ডে চার্টিস্টদেরও পরাজয় ঘটলো। তারপর থেকে এই আন্দোলনের নেতারা সংস্কারবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। আর্নস্ট জোন্স (Earnst Jones) একরকম একক ভাবেই ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৫১ সনে বন্দী অবস্থাতে *Revolt of Hindostan or the New World* নামক একটি দীর্ঘ কবিতা তিনি লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভারতে মহাবিদ্রোহ ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না"—সাম্রাজ্যবাদীদের এই দম্ভের জবাবে তিনি বলেছিলেন,—"হ্যাঁ, ঠিকই, কিন্তু সেখানে রক্তও কখনো শুকোয় না।"

মহাবিদ্রোহের সময় জোন্স তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে লিখেছিলেন: "সমগ্র ইয়োরোপে ভারতীয় বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটিমাত্র মতই হওয়া উচিৎ। পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলি বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে, এটা তার মধ্যে একটা সব থেকে মহান, ন্যায়সংগত ও আবশ্যক বিদ্রোহ।⋯ কোন পক্ষ অবলম্বন করা হবে—সে সম্বন্ধে ইতস্তত করার কথা আমরা ভাবতে পারি না।⋯পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ কি ঠিক হয়েছিল? তা যদি হয়, তাহলে হিন্দুস্তানেও তাই। হাঙ্গারির বিদ্রোহ কি ন্যায়সংগত হয়েছিল? তাহলে হিন্দুস্তানেও তাই। ইতালির বিদ্রোহ কি সমর্থনযোগ্য ছিল? তাহলে হিন্দুস্তানেও তাই। যার জন্যে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, ইতালি লড়েছিল, হিন্দুস্তানিরাও আজ তার জন্যে লড়ছে।⋯আশ্চর্যের বিষয়

এই নয় যে, আজ ১৭ কোটি ভারতবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ; আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এতদিন ধরে তারা পরাধীনতা মেনে নিয়েছিল।"[৭]

ইংরেজ শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে জোন্‌স আরো লিখেছিলেন : "যে বেআইনিভাবে পরদেশ দখল করা মানুষের ইতিহাসকে সব থেকে কলঙ্কময় করেছে, তাকেই অর্থ দিয়ে, রক্ত দিয়ে রক্ষা করার জন্য ইংরেজ শ্রমিকদের ডাক আসবে। ইংরেজগণ! মানুষের যা সব থেকে পবিত্র, ভারতীয়রা তারই জন্য এখন লড়ছে।... দেশবাসীগণ! অন্যদের স্বাধীনতা ধ্বংস করার পরিবর্তে তোমাদের সামনে একটা মহৎ কাজ আছে – তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা।"[৮] চার্টিস্ট আন্দোলনের পরাজয়ের পর ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই বহু চেষ্টা করেও জোন্‌স তাদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেন নি।

বস্তুতপক্ষে, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর পক্ষে এটা ছিল একটা স্বর্ণযুগ। ১৮৫৭ সনটা ছিল তাদের পক্ষে খুবই অনুকূল। বছর খানেক পূর্বে ক্রিমিয়া ও পারস্যের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে, আফগানিস্তানের দোস্ত মহম্মদ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। ব্রহ্মদেশও তার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই সুযোগ গ্রহণ করলো না। ইংল্যাণ্ডের বহুদিনকার শত্রু ফরাসি সরকার তখন লুই নেপোলিয়নের অধীনে ইংল্যাণ্ডের পরম বন্ধু। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড তুর্কির পক্ষে লড়েছিল বলে স্বভাবতই তুর্কি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।[৯] ইংল্যাণ্ডের পরম শত্রু রাশিয়া, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রক্তক্ষয়ের পর বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া বা আমেরিকার সঙ্গেও তখন ইংল্যাণ্ডের বিশেষ শত্রুতা ছিল না।

ঠিক এই সময়ে, ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীও ছিল বেশ যুদ্ধোপযোগী ও সব থেকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরই ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীতে উৎকৃষ্টতর বন্দুক, এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তিত করা হয়েছিল। এই এনফিল্ড রাইফেল মহাবিদ্রোহে ইংরেজের জয়ের অন্যতম কারণ ছিল, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। মহাসমুদ্রেও ইংল্যাণ্ডের তখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তার নৌবহর ছিল সব থেকে শক্তিশালী। ইংল্যাণ্ড তখন সত্য-সত্যই সমুদ্র-তরঙ্গের অধিনায়ক।

ইংল্যাণ্ডের এইসব অনুকূল অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখেই লর্ড সাফ্‌টবেরি পার্লামেণ্টে আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন : "বিদ্রোহ ঘটাবার এটাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সব থেকে অনুকূল সময়।" *Times* বলেছিল : "বিদ্রোহ যদি ঘটাবারই ছিল, তাহলে এর চাইতে প্রকৃষ্টতর সময় আর ছিল না।" এই সব কারণেই ইংল্যাণ্ড নিশ্চিন্ত মনে তার সেনাবাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে ভারতে পাঠাতে পেরেছিল।[১০]

মহাবিদ্রোহকে উপলক্ষ করে ফরাসি দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ভালোভাবেই প্রকাশ পেল। প্রতিক্রিয়াশীল মাসিকপত্র *Le Paye* লিখলো (সেপ্টেম্বর' ১৮৫৭) : "ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের অর্থ হবে বর্বরতার নিকট সভ্যতার পরাজয়।" সাম্রাজ্যবাদী *Journal des Debats* লিখলো (৯ অকটোবর '৫৭) : "এই ভয়ংকর সংকটে সভ্যতার স্বার্থের জন্যেই ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ করা উচিত।" এই পত্রিকাটি ৯ নভেম্বরে আবার লিখলো : "ইংল্যাণ্ড হচ্ছে আমাদের মিত্র, স্থতরাং তার বিপদের সময় আমরা যদি কোনো স্থযোগ নেবার চেষ্টা করি, তাহলে এই মৈত্রীবন্ধন ছিঁড়ে যাবার আশংকা আছে।" উদারনৈতিক *Revue des Deux Mondes* বললো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণ, জোর জবরদস্তির দ্বারা রাজ্য দখল ও দুষ্কর্মগুলিই বিদ্রোহের কারণ। দিল্লি পুনর্দখলের পর ইংরেজদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে *Le Siecle* লিখলো (১৭ সেপ্টেম্বর '৫৭) : "সিপাহিদের কোনো অপরাধের দ্বারাই ইংরেজদের এই বর্বর কাজগুলি সমর্থিত হয় না। আমরা দ্বিধাহীন ভাবে তার নিন্দা করছি। গণতান্ত্রিক *L' Estaffette* দৃঢ়কণ্ঠে দাবি জানালো (২৯ আগস্ট '৫৭) : "যদি ইংরেজরা এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের নীতি চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে বড় শক্তিগুলিকে, বিশেষ করে ফ্রান্সকে হস্তক্ষেপ করতে হবে, যাতে করে ভারতীয়দের পশুর মতো আর হত্যা করা না হয়।"

বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে এই গণতান্ত্রিক পত্রিকাটির ধারণা ছিল পরিষ্কার : এখন নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হচ্ছে যে, 'ধর্মের' প্রশ্নটা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র ; আসল কারণ হচ্ছে সেখানে জাতীয়তাবাদের একটা জোয়ার বইছে।...যেমনই একটা নব্য ফ্রান্স আছে, নব্য জার্মানি আছে, তেমনই একটা নব্য ভারত আছে। ...যে নীতি থেকে এই নব্য ভারতের জন্ম হয়েছে তা হলো :৮ ও ১৯ শতকের প্রথম দিককার নীতি [লুই নেপোলিয়ানের স্বৈরাচারী শাসনে ফরাসি বিপ্লব কথাটা উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না]। তখনকার একজন ভারতীয় রাজা রাম-মোহন রায় দার্শনিক ইংল্যাণ্ডে এবং দার্শনিক ও বৈপ্লবিক ফ্রান্সে ভ্রমণ করেছিলেন।"

যখন ভারতীয়দের 'নৃশংসতার' কথা সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছিল, *L' Estaffette* লিখলো "Nana Sabeb has made himself the avenger of his people"—ভারতীয় জনগণের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন নানা সাহেব। ফরাসি রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি ইংরেজদের সাহায্যার্থে একটা ফরাসি বাহিনী পাঠাবার দাবি করেছিল। *L' Estaffette* তার প্রতিবাদে লিখলো (১১ সেপ্টেম্বর) : যদি ফরাসি বাহিনী পাঠাতেই হয়, তাহলে তা পাঠাতে হবে ভারতীয়দের সাহায্য করার জন্যে, কারণ "আমরা পুনরায় ঘোষণা করছি —আমাদের সহানুভূতি ভারতীয়দের প্রতি, কেননা তারা মাতৃভূমির জন্যে ও

জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে এবং মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা হচ্ছে পবিত্র।"[১১]

কলকাতায় ফ্রান্সের কন্‌সাল তাঁর নিজের ও ভারতে সমস্ত ফরাসিদের সাহায্য ইংরেজ সরকারকে দিতে প্রস্তুত আছেন বলে ক্যানিংকে জানিয়েছিলেন।[২]

শুধু ফরাসি কনসালই নয়, কলকাতায় আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধিও ইংরেজ সরকারের সমর্থনে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্ট ধরনের প্রচার শুরু করে দিলেন। তিনি বলতে লাগলেন বিদ্রোহীরা হচ্ছে বর্বর, ফিজি দ্বীপের লোকদের মতো নরমাংস ভোজনকারী; শুধু ইংরেজদেরই নয়, সমগ্র সভ্য জাতিরই কর্তব্য বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা।[১৩] ১৫-ই আগস্ট লণ্ডন টাইম্‌স খবর দিয়েছিল যে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আমেরিকায় ৫০ হাজার ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা যেতে পারে। জেনারেল হ্যাভলকের মৃত্যু-সংবাদে নিউ ইয়র্কে সরকারিভাবে শোক প্রকাশ করা হয়েছিল।

মহাবিদ্রোহের সময় ইতালি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং তার একটা অংশ অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সুতরাং জাতির স্বাধীনতা অর্জন ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল ইতালির লক্ষ্য। রাজা ইমানুয়েল ও কাভুর চেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের সাহায্যে এই ঐক্য স্থাপন করতে। আর, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রীরা চেয়েছিলেন, একটা জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। প্রজাতন্ত্রীদের সহানুভূতি ছিল, ভারতীয়দের প্রতি ও তাঁরা অনেকেই ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কঠোর সমালোচক।

প্রজাতন্ত্রী *Italia del Popolo* ৮ জুলাইতে লিখেছিল: "ভারতবর্ষ ছাড়া ইংল্যাণ্ডের আর কোনো চিন্তাই নেই। বিদ্রোহের ফলে একেবারে তার আঁতে ঘা লেগেছে। নিজের দেশে স্বাধীনতা কিন্তু অন্যদেশে দাসত্ব—তার এই নীতির ফলে তাকে গত শতাব্দীতে আমেরিকা হারাতে হয়েছিল, এখন দেখা যাক ভারতে কি হয়।" *Ragiene* (Reabon) ৫ সেপ্টেম্বরে লিখলো: "আমরা যারা প্রত্যেক জাতির পবিত্র অধিকারে বিশ্বাস করি, আমরা চাই যে ইংরেজরা চিরকালের জন্যে ভারত থেকে বিতাড়িত হোক। ভারতে ব্রিটিশ সরকারই খুব সম্ভব সব থেকে নিষ্ঠুর, সুতরাং ইয়োরোপীয়দের উপর ভারতীয়রা এখন যে প্রতিশোধ নিচ্ছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।" রোমের পোপ অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদেরই সমর্থন করলেন ও বিদ্রোহে ক্ষতিগ্রস্ত খ্রীস্টানদের জন্যে অনেক সাহায্য পাঠালেন।

রুশদেশে ভারতের বিদ্রোহের খবর প্রথম পৌঁছলো ২৭ জুনে, লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতের স্মারকলিপির মারফৎ। এই স্মারকলিপির সঙ্গে আরো ছিল রুশ দূতাবাসের সামরিক অ্যাটাশে কর্নেল ইগনাটিয়েভের লিখিত বিদ্রোহ সম্বন্ধে

একটি বিস্তারিত রিপোর্ট। ইগনাটিয়েভের মূল বক্তব্য ছিল : "ভারতের এই বিদ্রোহ কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র কয়েকটি ভারতীয় বাহিনীরই আকস্মিক বিদ্রোহ নয়। বস্তুতপক্ষে, এই বিদ্রোহ হচ্ছে ঘৃণিত বিদেশি শাসনের হাত থেকে ঐ দেশের মানুষের মুক্তি পাকার ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।" এরপর থেকে রুশ পত্রিকাগুলিতে ভারতবর্ষের বিদ্রোহের খবরগুলিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত; পাঠকরা এর জন্যে খুব আগ্রহান্বিত হয়ে থাকত।[১৪]

সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদী জার সরকারই ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রধান শত্রু। তাই ইংল্যাণ্ডের এই মহাবিপদে রুশ সরকার যে স্বভাবতই খুব খুশি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যদি রাশিয়াকে দুর্বল না করে ফেলত, তা হলে রুশ সরকারের পক্ষে ভারতের বিদ্রোহের সুযোগ নেওয়া অসম্ভব ছিল না।

অবশ্য, রুশ শাসকশ্রেণীর মধ্যেও বর্ণবিদ্বেষ ও শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্ব মনোভাবের অভাব ছিল না এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ইয়োরোপীয়দের 'সভ্যতা বিস্তারের' ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিল। এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে এই শ্রেণীর রুশরাও ইংরেজ, ফরাসি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই উৎসাহী ছিল এবং তাদেরই মতো রুশ সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের নিজেদের উপনিবেশগুলিতে শোষণ ও নির্যাতন চালাত।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে রুশ সরকারের দু'মুখো নীতি স্পষ্ট হতে লাগলো। একটি সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা *Russky Inbalid*, ভারতের বিদ্রোহের খবরগুলি বিশদ ভাবেই ছাপাত, ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধও ছাপাত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৩ অকটোবরের Sergeberg-এর 'Indian Affairs' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে লেখক দেখিয়েছিলেন যে, ভারতে ইংরেজদের অমানুষিক শোষণের জন্যে এবং ভারতীয়দের মানবিক অধিকারগুলি পদদলিত হওয়ার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছে। কিন্তু মুশকিল হলো যে, এই ধরনের প্রচার রুশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই সাহায্য করছিল। জার সরকারের পক্ষে এটা বেশ একটা আশংকার কারণ হয়ে উঠলো।

অন্যদিকে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহীরা কোনো রকমের সাফল্য দেখাতে পারছিল না। কোনো একটা যুদ্ধে তারা জয়লাভ করতে পারলো না। চারমাসের মধ্যে দিল্লি তাদের হাতছাড়া হলো। এই অবস্থায় জার সরকার, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে শত্রুতা না বাড়াবার নীতি অবলম্বন করলো। তারা প্রচার করতে লাগলো যে, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বৈদেশিক নীতিতে মতভেদ থাকলেও এশিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশগুলিতে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আলোক বিস্তার করা উভয়েরই কর্তব্য; সেই সূত্রে উভয়েই মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ।[১৫]

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর, রুশ সমাজের মধ্যেও একটা মহাসংকট দেখা দিয়েছিল। জারের স্বৈরাচার ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে

জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষ খুবই বেড়ে যাচ্ছিল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এই বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিকরাই ছিলেন ভারতীয় বিদ্রোহীদের প্রকৃত বন্ধু। Dobrolyubov, Chernyshevsky, Belinsky, Herzen প্রমুখ মনীষীরা ছিলেন এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার নায়ক।

ভারতীয় বিদ্রোহীদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে দোব্রোলিউবভ "The History and the contemporary state of the East India Company" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তা তখনকার রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পত্রিকা *Sovremennik*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দোব্রোলিউবভ মহাবিদ্রোহকে "ঐতিহাসিক ভাবে প্রয়োজনীয় ঘটনা" (Historically necessary affair) ও বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মুক্তিসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেরনিসেভ্স্কি এই প্রবন্ধের অনেক প্রশংসা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রুশ মনীষীর এই লেখা প্রগতিশীল রুশ বুদ্ধিজীবীদের খুবই প্রভাবিত করেছিল।

মহাবিদ্রোহের সময় লিও টলস্টয় ছিলেন একজন তরুণ উদীয়মান লেখক। তাঁর ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের খবরগুলি কী আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। দিল্লি, লখনৌ, কানপুর যখন ইংরেজরা পুনরায় দখল করে নিল, তখন টলস্টয় তীব্র বেদনা অনুভব করেছিলেন এবং বিজয়ী ইংরেজদের নৃশংসতা, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনকে 'ব্রিটেনের অমানুষিকতা' বলে নিন্দা করেছিলেন।[১৬]

ভারতীয় বিদ্রোহের প্রভাব চীন দেশের উপরেও পড়েছিল। চীন তখন নিজেও তার প্রচণ্ড তাইপিং বিদ্রোহের (১৮৫১-৬৪) মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এই সুযোগে ইংল্যাণ্ড চীনের বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ (১৮৫৬-৬০) শুরু করে দিল। হং কং-এর ব্রিটিশ প্রতিনিধি বড়লাট ক্যানিংকে জরুরি সাহায্যের জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন। ভারতে ইংরেজ সরকার যখন সিপাহিদের চীনে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল, তখন সিপাহিরা কিভাবে তা ব্যর্থ করে দিয়েছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহিদের এই বিদ্রোহী মনোভাবের ফলে, ভারত সরকার ভারতস্থ ইংরেজ সৈন্যদেরও চীনে পাঠাতে পারেনি। তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারত-চীন এই দুটি মহান দেশ জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে, পরস্পরকে সাহায্য করতে শুরু করেছিল।

অবশেষে ইংল্যাণ্ড থেকেই একটা ব্রিটিশ বাহিনী লর্ড এলগিনের অধীনে চীনে পাঠানো হলো। এলগিন সিঙ্গাপুরে পৌঁছে মিরাট বিদ্রোহের খবর পেলেন। এবার এলগিনের নিকট ক্যানিং জরুরি সাহায্য চাইলেন। এলগিন তাঁর বাহিনী নিয়ে ভারতের দিকে রওনা হলেন।

ঠিক সেই সময়েই ভারতের বিদ্রোহের খবর চীনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। চীনে তখন কোনো সংবাদপত্র ছিল না। একজন চীনা উচ্চ-পদস্থ কর্মচারি লিখেছিলেন: "মুখে মুখে এই সংবাদ প্রচারিত হলো...সকলেই ভীষণ আনন্দিত।" কোয়াংটুং ও কোয়াংসি প্রদেশের শাসনকর্তা জেনারেল ইয়েমিং-সেন[১৭] চীন সম্রাটকে ভারতীয় বিদ্রোহের খবর জানিয়ে লিখেছিলেন যে "বিদেশিদের ভাগ্য বিশেষ ভালো নয়" এবং সেইজন্যেই "তারা (ইংরেজরা) এখানে নতুন সৈন্য পাঠাতে পারছে না।"

বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সরকার বহু ভারতীয় সৈন্য চীনদেশে নিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধে লড়বার জন্যে ও তাইপিং বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে। সেই সময়ে কয়েকজন ভারতীয় সিপাহি তাইপিংদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।[১৮]

ভারতের মহাবিদ্রোহ ও চীনের তাইপিং বিদ্রোহ মার্কস ও এঙ্গেলস-এর উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। এশিয়ার এই অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানগুলি মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মনে বিশ্বব্যাপী একটা গভীর সমাজবিপ্লবের আশার সঞ্চার করেছিল। ১৮৪৮ সনে *Communist Manifesto* লেখার সময় থেকেই বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের সমস্যাগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৪৮ সনে যখন জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হয়, তখনই মার্কস অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ হাঙ্গারি ও ইতালির স্বাধীনতা যেমন দাবি করেছিলেন, তেমন তিনি প্রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যাণ্ডেরও স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করেছিলেন। সেই সময় নয়ে-রাইনিশে ট্সাইটুং-এ মার্কস লিখেছিলেন: "এখন যখন জার্মানরা নিজেদের শৃংখল ভাঙতে শুরু করেছে, অন্য দেশের প্রতিও তাদের নীতি বদলাতে হবে, তা নইলে তারা অন্যের জন্য যে শৃংখল তৈরি করেছে, সেই শৃংখলই তাদের নবজাত ও অর্ধলব্ধ স্বাধীনতাকে শৃংখলিত করে ফেলবে। জার্মানি যে পরিমাণে অন্যের স্বাধীনতার সম্মান করবে, জার্মানিও সেই পরিমাণে স্বাধীন হবে।"

১৮৫৩ সনে পার্লামেণ্টে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্বিবেচনার সময় মার্কস ভারতের উপর প্রবন্ধগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেই সময়ই মার্কস গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নটা তুলেছিলেন—"(Can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia?"—এশিয়ার সামাজিক অবস্থার একটা মৌলিক বিপ্লব ব্যতীত মানবজাতি কি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?[১৯] বিপ্লবের সমস্যাগুলি তখন পর্যন্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ সনে যখন চীনে ও ভারতে গণঅভ্যুত্থান ঘটলো এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হলো, তখন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর

আন্তর্জাতিক চিন্তায় এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করলো এবং তাঁদের বিশ্ববিপ্লবের পরিকল্পনায় একটা নির্দিষ্টরূপ গ্রহণ করলো।

১৮৪৮ সনের বিপ্লবের পরাজয়ের পর যখন ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলন সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, সেইরকম অবস্থায় ভারতের মহাবিদ্রোহ মার্কসকে যে আবার কতখানি আশান্বিত করেছিল, তা এঙ্গেলসকে লিখিত তাঁর একটা চিঠি থেকেই বোঝা যায়—"ভারত হচ্ছে এখন আমাদের শ্রেষ্ঠ মিত্র।"[২০] ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলস ভারত ও চীন সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[২১] তাতেই দেখা যায় যে, তাঁদের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদকে এত নির্ভীকভাবে ও আপোষহীন ভাবে আর কেউ আক্রমণ করেন নি। তাঁরাই প্রথম যাঁরা পরাধীন দেশগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন। তাঁরাই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের মহাবিদ্রোহ, চীনের তাইপিং বিদ্রোহ, পারস্যে বাবীপন্থীদের অভিযান, ইন্দোনেশিয়ার গণবিদ্রোহ, সিরিয়া ও লেবাননের কৃষকবিদ্রোহ—এগুলি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। এগুলি শুধুমাত্র এশিয়ারই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নয়, এগুলি হচ্ছে ইয়োরোপের ও সমগ্র পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত।

১৮৬৭ সনে আইরিশ বিদ্রোহের পর মার্কস ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটাকেই প্রথম-আন্তর্জাতিকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। মার্কস আন্তর্জাতিকে প্রস্তাব আনলেন যে "তাঁর বিশিষ্ট কাজ হলো ইংরেজ শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তোলা যে আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় মুক্তি তাদের কেবল একটা বিশুদ্ধ মানবতাবাদী ন্যায়বিচারের অনুভূতি নয়, তাদের নিজেদের মুক্তির প্রথম শর্ত।" এই মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি: "A nation which enslaves another nation, forges its own chain"—যে জাতি অন্য জাতিকে দাস করে রাখে, সে তার নিজের শৃংখলকেই সুদৃঢ় করে।

ভারত, চীন, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই মার্কস জাতীয় ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি আরো দেখিয়েছিলেন, যেহেতু ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতাবাদ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, সেই কারণে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। তাই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—মার্কস এঙ্গেলস-এর এই নির্দেশ, যা তাঁরা বীজ আকারে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে রোপণ করেছিলেন, তা-ই কালক্রমে বিশ্ববিপ্লবের মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

নির্দেশিকা

১. "In Europe, the Revolution of 1848 and the *Communist Manifesto* of Karl Marx marked the midway point between the French and the Russian revolutions. Asia too had reached a turning point by the mid-nineteenth century. In China...Hung Hsiu-chiuan, who had never heard of Marx, led half a million men against the Manchu in Taiping Rebellion of 1851 to establish a kind of Communist utopia. In India, the world-wide popular awakening was reflected in what the British called the 'Mutiny' of 1857, but which Indian nationalists more properly named the 'First War of Independence.' (Chester Bowles, *Ambassador's Report*, p. 53)

২. Mead, p 192.

৩. "I am bound to admid that for the last 25 years, I have observed grievious instances of policy in respect of our Indian Empire — measures undertaken without a shade of justice, and a perfect scandal to English history." (*People's Paper*, 17 Oct. 1857)

৪. "[It appears to be] a social change or convulsion such as of late afflicted Europe. It is singular to find similar commotions at the same time in Asia and Europe...Nor is it less singular to find several other powers at once interested in the fate of China." (*Economist*, 21 May 1859)

৫. "It is not time for mercy now ; our vengeance should be sharp and bloody, and of such a nature as to make our Indian subjects tremble, in future at the name of Delhi... [inhabitants of Delhi should be] exterminated as if they were so many wild beasts."(*New Castle Chronicle*, 23 Oct. 1857)

৬. "...the commencement of that tremendous retribution, which, if there were justice in the world, the gigantic and unparalleled crimes of the British Government and East India Company are certain to evoke.. while deploring the excesses in which the revolted regiments have indulged, our sympathies as they always have been are with the weak against the strong—with the oppressed struggling with their tyrants—with the tortured, plundered, enslaved and insulted natives of India, in striving to free themselves of the iron yoke of their cruel, remorseless, rapacious and hypocritical masters. . Our sympathies are with the insurrectionists, with the mutinous 'scoundrels' whom the *Times* and its colleagues wish to make an example of, by shooting, hanging and gibbeting." (*Reynold's Newspaper*, 5 July 1857)

৭. Earnst Jones, *Revolt of Hindostan*, Calcutta, 1857, pp. 51-52.

৮. *People's Power.* 4 July 1857. আবার, কয়েকদিন পরে জোন্স লিখলেন : "of one thing we are certain—that whether this insurrection be suppressed or not, it is the precursor to our loss of India···Our advice is···recognise the independence, of the Indian race···One hundred years ago·· a foreign tribe, the peddlars of the earth, the merchants-robbers of Leadenhall Street, stole on a false pretence into the heart of this mighty galaxy of empires and robbed it of its jewel—independence. Within that reign of 100 years a millanium of guilt has been compressed." (*People's Power*, 1 August 1857)

৯. "Early in July [in 1857] the Sultan, without hesitation, upon the application of Lord Strafford de Radcliffe, granted his firman for the passage of British troops across the Isthmus of Suez. The Pasha of Egypt voluntarily and without any application being made to him···(agreed) to send troops across his territory to the Red Sea, he would afford such troops every facility of transit ;···the

Emperor of the French, of his own accord, informed the British Government that if it would be any convenience to them to send troops to India across France, they had his full and free leave to traverse his territory." (Earl of Derby's Speech in the House of Lords, 3 December, 1857)

১০. যখন ইংল্যাণ্ডের দেশরক্ষী বাহিনীকে তুর্বল করে এত অধিক সংখ্যায় সৈন্য ভারতে পাঠানো হলো, তখন পার্লামেণ্টে বিপক্ষ দল বলেছিল যে, বিশেষ করে ফ্রান্সে এর প্রতিক্রিয়া সুবিধাজনক নাও হতে পারে, কারণ ফরাসিরা এই সুযোগ গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডের মিত্র নেপোলিয়ানকে হঠিয়ে দিয়ে তাদের দেশে বিপ্লব ঘটাতে পারে, এবং সে বিপ্লব সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

১১. বিদ্রোহীদের 'নৃশংসতার' প্রসঙ্গে *Estaffette* আরো লিখেছিল: "In the first instance, they (the British) have cruelly oppressed the Indians, who are now taking their revenge··· The English have hurt their national feeling and have committed acts of breach of civilisation. They have to answer now a terrible account; instead of civilising India they have exploited it. They only wanted slaves but they have created Spartacusses." (Quoted by *Friends of India*, 1857 July-Dec) স্বভাবতই ফরাসিদের এই ধরনের প্রচার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা পছন্দ করেনি। তাই *Spectator* (8th August, 1857) অভিযোগ করেছিলঃ "The Emperor of the French [Louis Napoleon], for instance, visits our Queen as a friend; but the Press of France does not talk in friendly fashion."

১২. Ball, vol. II, p. 156

১৩. The American representative in Calcutta said, "They (the mutineers) constitute what pirates are, what Cannibals in the Fiji Islands are, enemies of the human race and meriting not from one nation, not from one people, but from the whole of the human race, summary and peremptory extermination." (Hindu, *Mutinies and the People*. p. 5)

১৪. *Otechestvennye Zapiski* (Fatherland Notes) লিখলো : "There is hardly a question more important, interesting or grave than that of India in the political world today. News from India is awaited with the greatest impatience ; the most exciting headlines are 'India', 'Indian Post', and 'Correspondence from Calcutta'." *Russky Vestnik* লিখলো : "Indian affairs have become the most vital problem of the day The eyes of all Europe have been fixed on India for five months"

১৫. *Russky Vestnik* লিখলো : "We do not sympathise with England's foreign policy ; we have points of conflict with her. But, we shall always have the magnanimity and consciousness to recognise the unity of our tasks. Both England and Russia are called upon to spread the light of European way of life in the moral darkness of stagnating Asia. Here we are allies ; here there is solidarity between us."

১৬. J. Shifman, *Leo Tolstoy—friend of the Indian People.* ISCUS (Journal of the Indo-Soviet Cultural Society), 1954 November.

১৭. দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধে Yeh Ming-Shen আপোষহীন ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, কিন্তু একটা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে জেলে ১৮৬০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। ইংরেজের হাতে বাহাদুর শাহ বন্দী হওয়ার পর তাঁকে হংকং-এর জেলে রাখার প্রস্তাব হয়েছিল।

১৮. Yu Sheng-wu and Chang Chen-kun's article : "China and India in the Mid-19th. Century", in *Rebellion 1857*, New Delhi, 1957, p. 346.

১৯. Marx, *The First Indian War of Independence*, p. 50

২০. "With the dram of men and bullion which it must cost the English, India is now our best ally." (Marx-Engels, *Correspondence*, p. 208)

২১. *Marx and Engels on Colonialism* (Moscow) নামক পুস্তকে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

৬

মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের কারণ

বিদ্রোহীদের এত জনবল, অসংখ্য লোকের দৃঢ় সংকল্প, কঠোর সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জন এবং এত সুবিধা-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মহাবিদ্রোহ কেন পরাজিত হলো, তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদগণ ভারতীয়দের পরাজয়ের জন্যে যে মামুলি কারণগুলি দেখিয়ে থাকেন, ভারতীয় ইতিহাসজ্ঞরাও এবং 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীরাও নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। ড মজুমদার বিদ্রোহীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসেবে বলেছেন: তাদের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না, আর ইংরেজেরা জিতেছিল তার কারণ তারা সাম্রাজ্য রক্ষার্থে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।[১]

যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে তার উচ্চ আদর্শের অভাব, তাহলে কি বুঝতে হবে, জগতে যেসব বিদ্রোহ-বিপ্লব পরাজিত হয়েছিল তা উচ্চ আদর্শের অভাবেই হয়েছিল? জগতের প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাসের পাতাগুলি তো অসংখ্য বিপ্লব ও গণ-অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার ইতিহাসেই পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের ১৮৪৮ সনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউন, ১৯০৫ এর রুশ বিপ্লব সবই ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না বলেই কি ব্যর্থ হয়েছিল? কাজেই আমাদের ইতিহাসবিদদেরও এ প্রশ্ন করা যেতে পারে: উচ্চ আদর্শ থাকলেই কি একটা বিদ্রোহের জয় সুনিশ্চিত? আসল কথা হচ্ছে, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ আরো অনেক বিপ্লবের মতো যে ব্যর্থ হয়েছিল তা মোটেই উচ্চ আদর্শের অভাবের জন্যে নয়। ভারতের তৎকালীন ইতিহাসের অনেকগুলি জটিল কারণের জন্যেই ভারতের এই মহা অভ্যুত্থান পরাজিত হয়েছিল। সরলীকরণের পরিবর্তে, সেই ঐতিহাসিক কারণগুলি অনুসন্ধান করাই তো ইতিহাসবিদদের কাজ।

মানবেন্দ্রনাথ রায়, রজনীপাম দত্ত, নেহেরু, পানিক্কার প্রমুখের মতে, মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল তার সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব। দত্ত বলেছেন যে, এ বিদ্রোহ সামন্তশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং বিদ্রোহের এই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের জন্যই তো প্রভূত পরিমাণে জন সমর্থন পায়নি,

সেই কারণেই এটা পরাজিত হয়েছিল।"[২] এটাও একটা বিভ্রান্তিমূলক অত্যধিক সরলীকরণ। তাছাড়া, সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব থাকার ফলে প্রভূত পরিমাণ জনসাধারণ এ বিদ্রোহে যোগ দেয়নি – এ কথাগুলি একেবারেই ঠিক নয়। সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এত বড় গণবিদ্রোহ আর কখনো ঘটেনি।

সেইযুগে সামন্তশ্রেণীর ভূমিকা, এশিয়াতে তো নয়ই, ইয়োরোপেও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি।[৩] রাশিয়ার জারের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই নেপোলিয়ানের দুর্ধর্ষ আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও নেপোলিয়ান ও তাঁর বাহিনী সব বিষয়েই রুশদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড, ইতালিতে জাতীয় আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই চালিত হয়েছিল। মহাবিদ্রোহের বহু পরেও জার্মানি ও ইতালিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই জাপান তার জাতীয় সংকটের দিনে বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করেছিল এবং তাকে একটা আধুনিক দেশে পরিণত করেছিল। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও সামন্ততান্ত্রিক রাজা আমানুল্লাও হাইলে সেলাসির প্রগতিশীল ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি। আজও আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, একজন সামন্ততান্তিক রাজা সিহানুক, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কী গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই বর্তমান যুগেও অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সংগ্রাম সফল হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব মহাবিদ্রোহের বিফলতার কারণ নয়; সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই এই গণবিদ্রোহের সাফল্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

কেন বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে তখনকার ভারতে শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে। ভারতে সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে পড়ছিল, বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠছিল না। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে যে স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠছিল, তা ইংরেজদের ভারত বিজয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল কম্প্রাডর (মুৎসুদ্দি) বুর্জোয়াতে। পাশ্চাত্যে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বাধীন এবং বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল; তারা সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করেছিল ও জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। ভারতের কম্প্রাডররা ছিল ইংরেজ বণিকদের দালাল। ইংরেজরা যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সামন্ততন্ত্রকে একটা অতিরিক্ত মেয়াদ দিল, তখন এই কম্প্রাডররা জমিদার হলো। ইংরেজ শাসনের অস্তিত্বের সঙ্গে এই শ্রেণীর স্বার্থ ছিল এতই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, এদের পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যে সব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম হলো, তারাও ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামন্ততন্ত্রের সন্তান। স্বাধীন ভারতের কল্পনা তাদের মস্তিষ্কে তখনো স্থান পায়নি। তারা ইয়োরোপের মধ্য-

শ্রেণী নয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এদের নিকটও ছিল কল্পনার অতীত।

তখনকার ভারতে রাজা মহারাজা ও জমিদাররাই ছিল ভারতের শক্তি কেন্দ্র। তখনো তারাই ছিল ভারতের জনগণের 'স্বাভাবিক নেতা'। এই রাজা-মহারাজাদের ক্ষমতাচ্যুত করেই ইংরেজেরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। মহাবিদ্রোহের মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে, ১৮৪৯ সনে পাঞ্জাব রাজ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে লড়েছিল। তখন পর্যন্ত ইংরেজদের প্রধান বিরোধ ছিল এই রাজাদের সঙ্গে এবং রাজাদেরও প্রধান বিরোধ ছিল বিদেশি আক্রমণকারী ইংরেজদের সঙ্গে।

ডালহাউসি তাঁর Doctrine of Lapse ইত্যাদির দ্বারা রাজাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছিলেন, তার ফলে তাঁরা কিরূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাইজাস, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভূপাল, পাতিয়ালা, নাভা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী রাজাদের মধ্যে একজনও নিজের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে মহাবিদ্রোহে যোগ দেননি। বিদ্রোহের সময় বহুদিন যাবত ইংরেজ শাসনের ভাগ্য একটা সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছিল।[৪] এই সব শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে যদি একজনও বিদ্রোহে যোগ দিতেন, তাহলে বিদ্রোহের ভারসাম্য বিদ্রোহীদের দিকেই হেলে পড়ত। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, পাতিয়ালা[৫] বা নাভার রাজা যদি বিদ্রোহে যোগ দিতেন তাহলে দিল্লির পতন ঘটত না এবং বিদ্রোহ সারা পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ত। নাইজাস যদি বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন, তাহলে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ত। হোলকার বা সিন্ধিয়ার মধ্যে যদি একজনও বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরতেন, তাহলে এক মুহূর্তে বিদ্রোহের আগুন সমগ্র মধ্যভারত ও মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করে ফেলত।[৬] এই সম্ভাবনার কথা ক্যানিং ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন—সিন্ধিয়া যদি বিদ্রোহে যোগ দেন তাহলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কালই ভারত ছাড়তে হবে—If Scindhia goes over to the rebels, we better pack off tomorrow

যাই হোক, ঐতিহাসিক কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও এবং যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, ভারতের মূল সামন্ত শক্তি বিদ্রোহে যোগও দেয়নি, নিরপেক্ষও থাকেনি। তারা বিদেশি শাসনকেই পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। বিদ্রোহী দিল্লির অবরোধকারী ইংরেজ বাহিনীর অবস্থা যখন সিপাহিদের আক্রমণের ফলে খুবই বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছিল, তখন পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দের রাজারা যাতায়াতের পথ নিরাপদ রেখে, ইংরেজ বাহিনীকে রসদ জুগিয়েও আরো নানা উপায়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। এইরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য না পেলে ইংরেজের পক্ষে দিল্লি পুনর্দখল করা সম্ভব হতো না। যে সময়ে ঝান্সির দুর্গের সম্মুখে লক্ষ্মীবাঈয়ের আক্রমণের ফলে আক্রমণকারী জেনারেল রোজের

বাহিনীর ভাগ্য দোদুল্যমান, সেই সংকট মুহূর্তে ভুপালের বেগমের সাহায্য যদি তিনি না পেতেন তাহলে ঝান্সি দখল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। ভারতীয় সামন্তবাদের প্রধান শক্তি রাজা-মহারাজাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ছিল মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

আসল কথা হচ্ছে, ভারতের রাজা-মহারাজারা বুঝতে পারছিল যে, তাদের সামন্ততান্ত্রিক যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে—এখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে আর যতদিন টি'কে থাকা যায়-এইটাই ছিল তাদের শেষ আশা। রাজারা বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এই বিদ্রোহ সিপাহি ও জনসাধারণের উদ্যোগেই ঘটছে এবং তারা বুঝতে পারছিলেন যে, জনসাধারণের এই সশস্ত্র বিদ্রোহ যদি জয়লাভ করে, তাহলে তার ফল আর যাই হোক না কেন তাতে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারকে শক্তিশালী করবে না। জনসাধারণ নিজেদের উদ্যোগে অস্ত্রধারণ করছে ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে—এই ঘটনার মধ্যেই যে সামন্তবাদ-বিরোধী তাৎপর্য রয়েছে, তা ভারতের ইতিহাসজ্ঞরা ও 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীরা না বুঝতে পারলেও সামন্ত রাজারা পরিস্কার ভাবেই বুঝেছিলেন।

বিদ্রোহের প্রথমদিকে, মে মাস থেকে সেপ্টেম্বরে দিল্লির পতন পর্যন্ত দিল্লিই ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্রে সিপাহিদের হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা। যদিও সিপাহিরা বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল, সিপাহিরা কোনো ক্ষমতাই তার হাতে ছেড়ে দেয়নি। সিপাহিরা নিজেদের 'কোর্ট' স্থাপন করে যখন কেন্দ্রীয় সামরিক নেতৃত্ব গঠন করার দায়িত্ব গ্রহণ করল তখন ঠিক পথই ধরেছিল, কিন্তু তারা নিজেদের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা, তুচ্ছ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সময়ের অভাবের জন্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠন করতে পারেনি। এটাই মহা-বিদ্রোহের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

দিল্লিতে বিদ্রোহী সিপাহিদের কার্যাবলী মার্কস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আগ্রহ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সিপাহিরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে বাহাদুর শাহকে স্বাধীন হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করলো তখন তিনি তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, এক মাসের মধ্যেও সিপাহিরা শৃংখলা স্থাপন করতে পারছে না, একজন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করতে পারছে না ও তারা একটা বিশৃংখল দঙ্গলে পরিণত হচ্ছে।[৭] মার্কসের এই লেখার কিছুকাল পরে এঙ্গেলস এই নেতৃত্বের প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন: "দিল্লির সঙ্গে সেভাস্তপোলের তুলনা করলে অবশ্যই মানতে হবে যে সিপাহিরা রুশ নয়; বৃটিশ সৈন্য শিবিরের বিরুদ্ধে তাদের কোনো হামলাই ইঙ্কেরমানের[৮] মতো নয়; কোনো টটলেবেন [রুশ সুদক্ষ জেনারেল] ছিল না দিল্লিতে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সিপাহি ও কোম্পানি সাহসের

সঙ্গে লড়লেও সিপাহিরা ছিল একান্তই নেতৃত্বহীন এবং তা শুধু ব্রিগেড ও ডিভিসনের বেলায় নয়, এমনকি প্রায় ব্যাটালিয়ানগুলির ক্ষেত্রেও; তাদের নেতৃত্ব তাই কোম্পানি ছাড়িয়ে এগোয় নি; এবং বর্তমান কালে যে বৈজ্ঞানিক উপাদান ছাড়া সেনাবাহিনী অসহায় এবং কোনো শহর রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব, তা তাদের মোটেই ছিল না।"[৯]

বিদ্রোহের প্রথম তিন-চার মাস সমস্ত সুবিধা-সুযোগ বিদ্রোহীদের দিকেই ছিল। মে মাসে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৫০০ ; আর তাদের অনুগত সিপাহিদের সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার। বিদ্রোহীরা যদি তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারত, একটা কেন্দ্রীয় হাইকমাণ্ড গঠন করতে ও একটা ক্ষমতা সম্পন্ন বিকল্প (alternative centre of authority) স্থাপন করতে পারত (যে কাজগুলি করা একেবারেই অসম্ভব ছিল না), তাহলে এই বিস্তৃত অঞ্চলে ইংরেজদের সমূলে ধ্বংস করা অসম্ভব হতো না। আগস্ট মাস পর্যন্ত দিল্লির সম্মুখে ইংরেজ শিবিরের অবস্থা মোটেই শক্তিশালী ছিল না। সেই সময়ের মধ্যে তাদের ধ্বংস করা মোটেই কঠিন ছিল না।[১০] কিন্তু এই ভাগ্য নির্ণয়কারী মূল্যবান সময়টার সিপাহিরা সদব্যবহার করতে পারলো না। বরং ইংরেজরাই তাকে কাজে লাগালো। যে প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতে তারা ধ্বংস হতে যাচ্ছিল তা তো তারা সামলে নিলই, তাছাড়া তাদের শত্রুকে প্রতি-আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হবারও যথেষ্ট সময় পেল।

ব্যক্তিগতভাবে সিপাহিরা ছিল উৎকৃষ্ট সৈনিক, ইংরেজ টমিদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর। একটা উৎকৃষ্ট বাহিনী তৈরি করার জন্যে তারা ছিল চমৎকার উপাদান। দুঃসাহস, শৌর্যবীর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণগুলি সিপাহিদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। তারা টমিদের চাইতে অনেক কম সাজ-সরঞ্জাম এবং রৌদ্র-বৃষ্টিবাদলেও টমিদের তুলনায় অনেক বেশি মার্চ করতে পারত। ১৮৫৭ সনে সামরিক শিক্ষার দিক থেকেও—তা গোলন্দাজই হোক আর অশ্বারোহী বা পদাতিকই হোক—সিপাহিরা ইংরেজদের প্রায় সমকক্ষই ছিল। বিরাট বিদ্রোহী অঞ্চলটা ছিল সিপাহিদের পরিচিত, ভাষায় আচারে ব্যবহারে, আশা-আকাংখা ও লক্ষ্যে সিপাহি ও জনসাধারণ একাত্ম। নৈতিক শক্তিও ছিল সিপাহিদের দিকেই। কারণ তারা একটা মহান আদর্শের জন্যে, নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে লড়ছিল। কিন্তু প্রধানত একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবের জন্যেই বিদ্রোহীরা এইসব সুযোগ সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে পারলো না।

পক্ষান্তরে, ব্রিটিশদের নেতৃত্ব ছিল কেন্দ্রীভূত এবং সাংগঠনিক দিক থেকেও বিদ্রোহীদের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। যদিও তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাদের নিজেদের থেকে বহুদূরে একটা বিরাট অঞ্চলে, যেখানে শুধু সিপাহিরাই

নয়, সমস্ত জনসাধারণও ছিল তাদের শত্রু। কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকার ফলে তাদের বিভিন্ন সামরিক রাজনৈতিক অভিযানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল এবং বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন দলগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে ধ্বংস করতে পেরেছিল।[১১]

ব্রিটিশ বাহিনীতে ভারতীয়রা চিরকাল সিপাহিই থাকত, তাদের মধ্য থেকে কেউ অফিসার হতে পারত না—অফিসারের শিক্ষা কোনোদিনই দেওয়া হতো না। হুকুম মেনে চলার শিক্ষাটা তারা ভালোভাবেই পেত, হুকুম করার শিক্ষাটা তারা পেত না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়ে প্রেরণা (initiative) নিয়ে কাজ করার বা চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিকাশলাভ করত না। তাই বখত খান বখত খানই থেকে গেলেন, হায়দার আলি হতে পারলেন না। দিল্লিতে কোনো সুযোগ্য নেতার আবির্ভাব হলো না।

ইংরেজ বাহিনীতে যে শৃংখলা সিপাহিরা মেনে চলত, তা তারা বিদ্রোহ করে নিজের হাতেই ধ্বংস করে দিল। কিন্তু তার পরিবর্তে কোনোরূপ বৈপ্লবিক শৃংখলা তারা স্থাপন করতে পারলো না। বিদ্রোহের পর যাঁরা অফিসারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন, তাঁরা সিপাহিদের মধ্যে শৃংখলা আনবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই শৃংখলাবদ্ধ হতে পারেন নি। এইসব অফিসারদের শৃংখলাবদ্ধ রাখার যেমন কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র ছিল না, তেমনই অফিসার-রাও সিপাহিদের ওপর কোনো ক্ষমতা স্থাপন করতে পারেন নি। সিপাহিরা ব্যক্তিগত ভাবে যত বীরত্বই দেখাক না কেন এবং যত আত্মোৎসর্গই করুক না কেন, শৃংখলার অভাবে তারা কোনো সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি।

দিল্লি ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ও অক্ষনাভি। দিল্লি দখল করেই সিপাহিরা বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসালো, তাঁকে সারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করলো ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। সেই সময়কার ভারতে বিদ্রোহীদের পক্ষে এর চাইতে উৎকৃষ্টতর বৈপ্লবিক কৌশল আর কিছু হতে পারত না। অন্যত্র যে যেখানে বিদ্রোহ করেছিল, সকলেই বাহাদুর শাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিল। বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করেই বিদ্রোহীরা সর্বোচ্চ ক্ষমতা-কেন্দ্র (central authority) গড়ে তুলতে পারত।

অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন কবি, শিল্পী ও মহৎ প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে একটা গণবিদ্রোহ পরিচালনা করবার মতো শারীরিক বল বা মানসিক শক্তি—কোনোটাই তাঁর ছিল না, যদিও তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুসারে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁর অক্ষমতা ও সিপাহিদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একদল অপদার্থ শাহজাদা জেনারেলের পোশাক পরে নিজেদের স্বার্থের জন্যে ধনী বানিয়াদের অবাধে লুঠ করছে; আর দরবারের আরেকদল পরজীবী চাটুকার ও বিশ্বাস-

ঘাতক শত্রুকে সাহায্য করে ভিতর থেকে বিদ্রোহীদের সর্বনাশ করছে। পুরাতন শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার স্থানে নতুন কাঠামো তৈরি হচ্ছে না, যার ফলে বিশৃংখলা বেড়েই যাচ্ছে, জোর করে লক্ষ-লক্ষ টাকা আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু তার অপব্যবহারই বেশি হচ্ছে, তাতে সাধারণ রাজকার্যও চলছে না, সিপাহিরা তাদের সামান্য বেতনও পাচ্ছে না। জেনারেল ও অফিসাররা নিজেদের অক্ষমতার জন্যে কোনো মিলিটারি কমাণ্ডই গঠন করতে পারছে না, শত্রুকে উপেক্ষা করে আত্মঘাতী কলহেই তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে, আর অন্যদিকে সিপাহিরা খাদ্য ও বেতনের জন্যে মাঝে মাঝে চিৎকার করছে। আর দিনের পর দিন অন্ধের মতো পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, দলে দলে বীরের মতো অনর্থক প্রাণ দিচ্ছে, তারপর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অনভিজ্ঞ জনসাধারণও কোনো রকম রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠন করবার চেষ্টা করছে না।[১২]

বিদ্রোহের কেন্দ্ররূপে দিল্লির রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য ভালভাবেই ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল। সেইজন্যেই দিল্লি বিদ্রোহীদের ক্ষমতাকেন্দ্র রূপে সংগঠিত হওয়ার পূর্বে ইংরেজরা তাকে ধ্বংস করার জন্যে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল।

লখনৌতেও প্রায় দিল্লির মতোই অবস্থা। সেখানেও বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহিরা একটা 'কোর্ট' স্থাপন করেছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এই 'কোর্ট' দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল এবং তারা পৃথকভাবে চলতে লাগলো। একদল সমর্থন করত মৌলভিআহমদ উল্লার নেতৃত্বকে, আর একদল সমর্থন করত মাম্মু খানের নেতৃত্বকে।[১৩] এখানেও কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থাপিত হতে পারলো না। লখনৌতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবেই বিদ্রোহীদের যথেষ্ট জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা রেসিডেন্সি দখল করতে পারেনি এবং পরে শত্রুর আক্রমণগুলিরও প্রতিরোধ করতে পারেনি। কানপুরেও নানাসাহেব সুযোগ্য সামরিক নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারেন নি।

কেবলমাত্র ঝান্সিতে লক্ষ্মীবাঈ, শাহাবাদে কুমারসিং ও মধ্যভারতে ফিরোজ শাহ শৃংখলা স্থাপন করতে পেরেছিলেন ও সুযোগ্য নেতৃত্ব গঠন করতে, পেরেছিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি ছিল প্রধান প্রধান বিদ্রোহ কেন্দ্র দিল্লি লখনৌ, কানপুর থেকে বহুদূরে। সুযোগ্য সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বই গঠন করা বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এঁরাই হলেন তার প্রমাণ।

মহাবিদ্রোহে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাটাই ছিল মহাবিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরাই ছিল বিদ্রোহের মূল শক্তি এবং একটা বৈপ্লবিক শক্তি। প্রত্যেক বিপ্লবের সর্বপ্রথম কর্তব্যটা এরা খুব দক্ষতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিল। ইংরেজের শাসন যন্ত্রটাকে, তার,

আইন-আদালত সেনাব্যারাক, পুলিশ স্টেশন, ভূমিব্যবস্থা, সম্পত্তি-সম্বন্ধ সবই জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এক মুহূর্তে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ব্রিটিশ শাসন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকটাই ছিল অস্পষ্ট; এই বিপ্লবী শক্তিকে সংহত ও পরিচালিত করার মতো কোনো শক্তি ছিল না। বিদ্রোহী অঞ্চলে তখনো অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। এই অনগ্রসর সামাজিক অবস্থার জন্যেই সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের জন্যে ততটা নয়—জনসাধারণের অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ প্রকৃত বিপ্লবের দিকে যেতে পারেনি।

বিদ্রোহ ঘটবার পরই বহু স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতকগুলি পৌরসভা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আদালত ইত্যাদির মতো গণপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কানপুরের পৌরসভার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তার হাতে কম ক্ষমতা ছিল না, নানাসাহেব যা খুশি করতে পারতেন না। এই ধরনের গণতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে নানাসাহেব ও অন্যান্য নেতারা সহযোগিতা করেছিলেন বলে মনে হয় না। একমাত্র ঝান্সিতেই দেখা যায় যে, রানী লক্ষ্মীবাই-এর সঙ্গে এইসব গণ প্রতিষ্ঠান-গুলির কোনো বিরোধ ছিল না। ঝান্সিতে এই গণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, প্রায় সর্বত্রই এই গণসংগঠনগুলি খুবই দুর্বল। জনগণের এই প্রচেষ্টাগুলিকে নেতারা শক্তিশালী করতে পারেন নি, তাই তাদের মধ্যে যে বৈপ্লবিক কর্মোদ্যম ছিল তাকে তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন নি। এই ধরনের গণতান্ত্রিক কাজের পরিচালক শক্তি রূপে কোনো রাজনৈতিক পার্টিও ছিল না, এবং জনসাধারণও ছিল তার জন্যে অপরিণত। পুরাতন ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণের সময়টাই হচ্ছে প্রত্যেক গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লবের চরম সংকটপূর্ণ কাল। এই উত্তরণ কালে খুব দ্রুতভাবে একটা নতুন শক্তিকেন্দ্র, একটা বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্র গঠন করাই হচ্ছে গণ অভ্যুত্থানের প্রধান কতর্ব্য। এই সমস্যার সঠিক সমাধানের ওপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ। এই কঠিন কতর্ব্য পালনে ১৮৫৭ সনে ভারতের জনসাধারণ ও নেতারা ছিলেন অপরিণত।

নেতৃত্বের দিক থেকে ইংরেজরাও, বিশেষ করে বিদ্রোহের প্রথম দিকে, খুব কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। বিদ্রোহের প্রথম আসতে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল. এই রকম একটা ব্যাপারের জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

মিরাটে ইংরেজ সৈন্য ছিল বহুসংখ্যক, সেখানকার কমাণ্ডার হিউইট বিদ্রোহী সিপাহিদের শহর দখল করতে বাধা দিতে পারতেন ও বিদ্রোহীদের দিল্লি যাবার পথও আটকে দিতে পারতেন। কিন্তু এই সংকটের মুখে হিউইট ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসাররা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মিরাট বিদ্রোহের আটদিন পর কানপুরের কমাণ্ডার জেনারেল হুইলার ১৮ জুন বড়লাটকে লিখে

পাঠালেন: "কানপুরে সব ঠিক আছে · সত্যসত্যই সংক্রামক ব্যাধিটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা গিয়েছে।" এর মাত্র কয়েকদিন পরে, ৫ জুন তারিখে, কানপুরে বিদ্রোহ ঘটলো। দিল্লি থেকে মিরাট পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই ইংরেজ শাসকরা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল।

মাদ্রাজের ব্রিটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল প্যাট্রিক গ্রাণ্ট যখন বড়লাটের আদেশে কলকাতায় এলেন, তখন তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে, সেখানে তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকার একটা ভয়ানক সামরিক সংকট ও বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কোনো মিলিটারি হেড কোয়ার্টার নেই, জেনারেল স্টাফের কোনো উচ্চ পদস্থ অফিসার নেই, কোনো কার্যকরী সামরিক বিভাগও নেই। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকার ফলে, তারা শীঘ্রই এইসব সমস্যার সমাধান করে বিদ্রোহ দমনের জন্যে একটা ঐক্যবদ্ধ সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়েছিল। বিদ্রোহের প্রথম ৩-৪ মাস বিদ্রোহীরা যে আত্মকলহে নষ্ট করলো, ইংরেজরা সেই সময়টার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো।

এই যুগে একটা চূড়ান্ত সুবিধা ছিল ইংরেজদের দিকে, তা হলো বিজ্ঞান। ইংরেজরা যখন প্রথম ভারতে এসেছিল। তখন বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়, শিল্পে বাণিজ্যে কোনো বিষয়েই ভারতীয়দের থেকে বিশেষ অগ্রসর ছিল না। কিন্তু তার পরবর্তীকালে তাদের দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটলো সমাজে কতকগুলি আমূল পরিবর্তন হলো, শিক্ষায় ও শিল্পে বিজ্ঞানের প্রসারলাভ করলো। ও শিল্প-বিপ্লব ঘটলো, সকল ব্যাপারে ইংরেজরা অনেক অগ্রসর হয়ে গেল, আর ভারতীয়রা পশ্চাতেই পড়ে রইল।

শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে ইংরেজ বাহিনী পেল এনফিল্ড রাইফেল (প্রচলিত ভাষায় মিনি রাইফেল)—যার পাল্লা ছিল গাদা বন্দুকের চাইতে অনেক বেশি। এই রাইফেলের টোটা উপলক্ষ করেই সিপাহি-দের বিদ্রোহ হয়েছিল। বিদ্রোহের শুরু হবার আগে এই রাইফেল ভারতে খুব বেশি আসেনি, তাই বিদ্রোহীদের হাতে মিনি রাইফেল ছিল না বললেই চলে। ইংরেজ বাহিনী এই অস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক ভাবে ব্যবহার করে-ছিল। একজন ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "যদি বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহী সিপাহিদের হাতে মিনি রাইফেল থাকত, তাহলে দিল্লি হয়তো মোগলদেরই হাতে থাকত এবং তৈমুরের বংশধর আজ বন্দীশালায় একটা জঘন্য চারপাই-এর উপর না বসে, তাঁর পূর্ব-পুরুষদের প্রাসাদে মণিমুক্তার সিংহাসনেই বসতেন।"[১৪] একথাও বলা যায় যে, বিদ্রোহ যদি '৫৭ সনের দু'-এক বৎসর আগে বা পরে ঘটতো, তাহলে তাঁর ভাগ্য অন্যরকম হতে পারত।

মিনি রাইফেলের সামনে সিপাহিরা যে দাঁড়াতে পারত না এবং ইংরেজ সৈন্যদের সামনে পৌঁছতে পারত না, বিদ্রোহের প্রথম দিকেই তা প্রমাণিত হয়ে

গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৫৭, ১১ জুলাই তারিখের শিয়ালকোক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। "কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫২-তম ইংরেজ বাহিনীর এনফিল্ড রাইফেলগুলি মারাত্মক ভাবে প্রমাণ দিতে শুরু করলো যে, সিপাহিদের মাস্কেট বন্দুকগুলি কতক খেলার পুতুলের মতো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ···সত্যকথা এই যে, এনফিল্ড রাইফেলের সামনে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদের অনেক বীরত্ব ও কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের 'ব্রাউন বেস' বন্দুকগুলি আমাদের কামান ও এনফিল্ড রাইফেলের বিরুদ্ধে কি করতে পারে"[১৫] আমরা দেখেছি, বেরিলির যুদ্ধে জেহাদিরা তলোয়ার নিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করছে, কিন্তু মিনি রাইফেলের বেয়নেট অতিক্রম করে তাদের তলোয়ার খুব কম শত্রুকেই স্পর্শ করতে পেরেছিল। বেয়নেটের আঘাতে জেহাদিরাই প্রাণ দিয়েছিল।

ইংরেজদের কামানগুলি ছিল শ্রেষ্ঠতর, তার পাল্লা ছিল অনেক বেশি। এই কামানের সাহায্যে ইংরেজরা অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ইংরেজদের যুদ্ধ পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার লিখেছিলেন, "১৮৫৭ সনের মিউটিনির সময় আমাদের নিকট রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ হাজার হাজার লোকের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান হয়েছিল।" ভারতে লণ্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি রাসেল লিখেছিলেন: "বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ভারতে আজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসের কাজ করছে, এর পূর্বে তা কখনো করেনি। টেলিগ্রাফ ব্যতীত কমাণ্ডার ইন-চিফের অর্ধেক বাহিনীর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেত।"

আর একটা বিষয়েও ইংরেজরা ছিল খুব সৌভাগ্যবান—তাহলো তাদের নৌশক্তি। ইংরেজেরা এটাকে বলত 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ'। মৃত্যুর পূর্বে হায়দার আলি বলেছিলেন: "বহু ব্রেইটওয়াট ও বেইলির [এই দুইজন ইংরেজ জেনারেলকে হায়দার আলি হারিয়ে দিয়েছিলেন] পরাজয় ও ইংরেজদের ধ্বংস করতে পারবে না। স্থলপথে আমি তাদের সমস্ত শক্তি নষ্ট করে দিতে পারি, কিন্তু আমি সমুদ্র শুকিয়ে খেলতে পারি না।"

বিদ্রোহের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সরকার ৩০ হাজার ইংরেজ সৈন্য (যাদের চীনে যাবার কথা ছিল) এবং অস্ত্রশস্ত্র কলকাতার বন্দর দিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঠাতে পেরেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সময়ে ইংরেজদের বিশেষ কেউ শত্রু ছিল না, তাই জলপথে ইংল্যাণ্ড বহু সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে পেরেছিল।

রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর নিকট শক্তিশালী সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সনের আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী তেমন সংঘবদ্ধও হয়নি, সচেতনও হয়নি। কাজেই ভারতীয় বিদ্রোহীদের এককভাবে ও

বিচ্ছিন্নভাবেই লড়তে হয়েছিল।

মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে, বিদ্রোহীরা ভুল রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করেছিল। অস্ত্রশস্ত্রে বিদ্রোহীরা তাদের শত্রুদের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট ছিল, এটাই তাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ নয়। শ্রেষ্ঠতর রণকৌশল, নেতৃত্ব সংগঠন ইত্যাদির দ্বারা এই ধরনের নিকৃষ্টতাকে অতিক্রম করা যায়। অস্ত্রে, অর্থে, জনবলে শিবাজির অবস্থা আওরঙ্গজেবের চাইতে অনেক বেশি নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শিবাজিই জয়লাভ করেছিলেন। বহু দেশের ইতিহাস থেকে এইরকম উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই যে, ভিয়েতনামের মতো একটি ছোট ও অনগ্রসর দেশ তার শ্রেষ্ঠতর গেরিলা রণকৌশল, সংগঠন, জনসাধারণের বৈপ্লবিক রাজনীতি ও দৃঢ় সংকল্প নেতৃত্বের দ্বারা আমেরিকার মতো সব থেকে শক্তিশালী দেশের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও তার অপরিসীম ধনবল লোকবলকে পরাজিত করতে পারে।

যেহেতু সিপাহিরা অস্ত্রে শত্রুদের চাইতে নিকৃষ্ট ছিল. সেই কারণেই প্রথম থেকেই তাদের গেরিলানীতি অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য ছিল সম্মুখ-যুদ্ধের নীতি পরিহার করে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের কথা সিপাহিদের মনে একেবারেই স্থান পায়নি। তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পর যে সামরিক শিক্ষা পেত, তাতে গেরিলাযুদ্ধের কোনো স্থানই ছিল না। চিরাচরিত অবস্থানগত (positional) যুদ্ধেই ছিল তারা অভ্যস্ত। পরবর্তীকালে, বড় বড় শহরগুলি হাতছাড়া হবার পর বিদ্রোহীরা যে গেরিলানীতি অবলম্বন করেছিল, তা হয়েছিল বেসামরিক নেতৃত্বে যখন থেকে সিপাহি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল ও গণযুদ্ধ শুরু হলো।

বিদ্রোহের প্রথম ৩-৪ মাস পর্যন্ত বেশির ভাগ সুযোগ-সুবিধাগুলি বিদ্রোহীদের দিকেই ছিল। সেই সময়ে তাদের পক্ষে দ্রুত ও আকস্মিকভাবে ইংরেজ বাহিনী-গুলিকে আক্রমণ করা সহজ ছিল। সুযোগ থাকতে থাকতে এ কর্তব্য পালন না করার ফলে সেই সুযোগই তাদের বিরুদ্ধে চলে গেল।

দিল্লির সামনে ইংরেজ শিবিরে যখন ইংরেজরা আক্রমণের জন্যে দিনের পর দিন প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল,[১৩] যখন তারা পাঞ্জাব থেকে পানিপথ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র রসদ ও দলে-দলে সৈন্য নিয়ে আসছিল সেই সময়ে শত্রুর এই প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দেবার জন্যে দিল্লির সিপাহিদের যথেষ্ট শক্তি ছিল। দিল্লি থেকে পানিপথ পর্যন্ত, রাস্তাটা ছাড়া আর প্রায় সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে। অনেক ক্ষেত্রে এইসব কৃষকরা নিজেদের বাহিনীও গড়ে তুলেছিল, এবং তারা নিজেরাই ইংরেজ সৈন্যের যাতায়াতের অনেক বাধার সৃষ্টি করেছিল। এদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, এদের মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে এদের সহযোগিতায় গেরিলা পন্থা অবলম্বন করে ইংরেজদের সীজ-ট্রেন পথের মাঝেই ধ্বংস করে দিতে পারত। বাহাদুর শাহ বারবার সিপাহিদের এই

উপদেশই দিচ্ছিলেন। এইভাবে ইংরেজদের দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনাকে প্রথমদিকে ব্যর্থ করে দেওয়াটা মোটেই কঠিন কাজ ছিল না।

দিল্লিতে সিপাহি বাহিনীগুলি পরিকল্পনাহীন ভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে নির্বোধের মতো বারবার ইংরেজ শিবির আক্রমণ করেছিল ও দলে দলে প্রাণ দিয়েছিল[১৭] কিন্তু যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অন্য বাহিনী গুলি তাদের সাহার্য্যার্থে অগ্রসর হয়ে আসেনি। এইভাবে একটার পর একটা বিজয়ের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এইরমম আক্রমণের ফলে, সেগুলি অসংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও, একসময়ে ইংরেজ শিবিরের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে তারা দিল্লি পরিত্যাগ করার প্রশ্ন আলোচনা করছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে সামান্যতম নেতৃত্বও যদি থাকত, তাহলে তাদের সফল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই ছিল। বিদ্রোহীদের এই প্রধান দুর্বলতাটা ইংরেজরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই একে বারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদের সম্মুখীন হয়েও তারা দিল্লির শিবির আঁকড়ে থাকলো। তারা যদি তখন দিল্লির পরিত্যাগ করতো, তাহলে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হতো।

দিল্লি ফ্রন্টে যেসব ভুল বিদ্রোহী নেতারা করেছিলেন, লখনৌ, কানপুর, এলাহাবাদের ফ্রন্টেও তাঁরা সেই ভুলগুলিই করেছিলেন, কলকাতা থেকে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে হ্যাভলক ও নীলের অভিযানকে তাঁরা লখনৌ ও এলাহাবাদ থেকে বহুদূরেই বাধা দিতে পারতেন। ভুল সমরনীতি ও কৌশল অনুসরণ করে কানপুরের যুদ্ধে নানাসাহেব এবং বেতোয়া, কালপি ও গোয়ালিয়ারের যুদ্ধে তাঁতিয়া তোপী তাঁদের শত্রুদের জয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আক্রমণাত্মক কৌশল (offensive tactic) গ্রহণ করাই হচ্ছে গণ-বিদ্রোহের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নীতি। সর্বত্রই বিদ্রোহীদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল শত্রুকে এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে, তার মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায়, তাকে সর্বত্র আক্রমণ করা। জয়লাভের এইটাই ছিল একমাত্র পন্থা। দিল্লি, লখনৌ, কানপুর বেরিলি, ফয়জাবাদ, ঝান্সি ইত্যাদি শহরগুলিকে মূলকেন্দ্র (base area) করে অনায়াসে চতুর্দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে পারত। এইভাবে শত্রুকে সর্বত্র আক্রমণ করার কৌশলই (offensive-defensive tactics) ছিল শহরগুলিকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ নীতি।

কিন্তু এই আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করার পরিবর্তে বিদ্রোহী নেতারা সর্বত্রই আত্মরক্ষামূলক (defensive) নীতি গ্রহণ করলেন, যেটা হলো সেই অবস্থায় আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। (প্রথমদিকে দিল্লির সামনে ইংরেজ শিবিরের উপর বিদ্রোহীরা যেসব আক্রমণগুলি করেছিল, সেগুলি সবই ছিল স্থানীয় স্বতঃস্ফূর্ত অন্ধ আক্রমণ, সর্বাত্মক রণকৌশলের আক্রমণ নয়।) শত্রুর

যুদ্ধজয়ের অর্ধেক সুযোগ বিদ্রোহীরা এইভাবে নিজেরাই সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

দিল্লি, ঝান্সি ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহীরা বড় বড় দুর্গে ও শহরে আশ্রয় নিয়ে শত্রুর আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে রইলো। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্মীবাঈ নানা-সাহেব, তাঁতিয়াও প্রথমদিকে শিবাজির রণকৌশলের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। শহর থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরই তাঁতিয়া গেরিলানীতি গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আগে করলে বিদ্রোহের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। বিদ্রোহী অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থায় নেতাদের পক্ষে সচল আত্মরক্ষানীতি (mobile defence) গ্রহণ করা মোটেই কঠিন হতো না এবং এই কৌশলের দ্বারা তাঁরা তাঁদের প্রতি-রোধের অভিযানকে দেশের অভ্যন্তরে (defence in depth) প্রসারিত করে দিতে পারতেন এবং প্রত্যেকটিই ক্ষেত্রেই কৌশলী অভিযানের (manoeuvre) দ্বারা শত্রুকে তাঁরা কাহিল করে দিতে পারতেন যুদ্ধের এই নীতিগুলি অবলম্বন করার জন্যে খুব একটা বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রয়োজন করে না। শিবাজি পেরে-ছিলেন, সুতরাং বিদ্রোহী নেতারাও পারতেন। তা না করে তাঁরা অন্ধভাবে সম্মুখযুদ্ধে শত্রুকে প্রতিরোধ করার কাজেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

বিদ্রোহীদের এত সব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তারা দুই বৎসর ধরে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়েছিল। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে সাম্রাজ্য-বাদীদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। এ পর্যন্ত তারা রাজা-মহারাজাদের ফিউডাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অল্প সময়ের মধ্যেও সহজে জয়লাভ করতেই অভ্যস্ত ছিল। মহাবিদ্রোহের মতো এত দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ়সংকল্প গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখীন তাদের কোনোদিনই হতে হয়নি। এই বিদ্রোহ ছিল তাদের নিকট একটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা।

এই দীর্ঘস্থায়ী আমরণ সংগ্রাম জনসাধারণের পক্ষে চালানো সম্ভব হয়েছিল এইজন্যে যে, তাদের নৈতিক আত্মবিশ্বাস (moral) ছিল দৃঢ়। তারা একটা উচ্চ আদর্শের জন্যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়ছিল, এ বিষয়ে তারা সচেতন ছিল। এই কারণের জন্যে তারা দৃঢ় সংকল্প, দুঃসাহসিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা মৃত্যুভয় শূন্যতা ইত্যাদির মতো তাদের অন্তর্নিহিত অনেক বৈপ্লবিক গুণের পরিচয় দিয়েছিল।

মহাবিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণ। সাম্রাজ্য-বাদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে তারা তাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তাদের বিভিন্ন অবস্থায় তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব গঠন করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। নির্যাতিত স্থানীয় রাজা ও তালুকদারদের একটা অংশ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। এবং তাঁরাই জনসাধারণের তখন-কার 'সাধারণ নেতা' হিসাবে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর, অন্য কোনো শ্রেণীর নেতৃত্ব তখন সম্ভব ছিল না। একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থায়

নিজের খুশি মতো একটা 'আদর্শ' নেতৃত্ব স্থাপন করা যায় না। বিদ্রোহী নেতারা রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিং, ফিরোজ শাহ, ফয়জাবাদের মৌলভি আহমদ উল্লা, খানবাহাদুর খান, অমর সিংহ সকলেই স্থানীয় ভাবে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আপোষহীন ভাবে বীরের মতো লড়েছিলেন। তাঁদের সব থেকে বড় দুর্বলতা ছিল, তাঁরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়তে পারেন নি। যুগ-যুগান্তরের অনগ্রসর রক্ষণশীল সামাজিক অবস্থাটা ছিল নেতা ও জনসাধারণের উভয়ের পক্ষেই একটা পিছু-টান। কিন্তু, অন্যদিকে আবার সকলকেই বিদ্রোহের তাগিদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতেও হচ্ছিল, এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের অনেক পুরনো সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় প্রধান রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যদি একজনও এই বিদ্রোহে যোগ দিতেন, তাহলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমস্যাটার সমাধানের পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে যেত।

ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহীরা ও তাদের নেতারা ছিলেন তাঁদের শত্রুদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকার ফলে শত্রুরা ছিল শ্রেষ্ঠতর সৈনিক। কিন্তু শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে তারা শ্রেষ্ঠতর সৈনিক হতে পারেনি। এই কারণেই বিদ্রোহীদের গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি—বিদ্রোহী বিপ্লবীতে পরিণত হয়নি।[১৮] এই গুণগত পরিবর্তন আনার জন্যে প্রত্যেক জাতীয় গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান কর্তব্য হলো সুযোগ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থাপন করা।

নির্দেশিকা

১. "The failure of the outbreak may also be attributed to the fact that neither the leaders nor the Sepoys and the masses were inspired by any high ideal...British were inspired by patriotic zeal for retaininge their empire and profoundly moved by the spirit of revenge against the Indians...(Indians cannot claim similar virtue · It is the painful duty of a sober historian to debunk them (the Indian leaders) from high pedestal which they have

occupied for a century." (Mazumdar : *Sepoy Mutiny*…. pp. 274-76). সাম্রাজ্যরক্ষা, অর্থাৎ বলপূর্বক অন্যদেশ জয় করা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা—এগুলি হলো উচ্চ আদর্শ। স্বদেশপ্রেম! ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় ইতিহাসজ্ঞরা সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাগুলি ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীরা কিন্তু অতি-উচ্চ আদর্শের কথাটথা বলেনি, সোজাসুজি তারা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার কথাই বলেছে। যেমন, Sir E. B. Lytton-এর কথা : "The war that has now broken-out is not like the Russian war, for the assertion of an abstract principle of justice...It is for the maintenance of the British empire. It is a struggle of life and death for our rank among the rulers of the earth." (quoted by Ball, vol. II, p. 417)

২. R. P. Dutt, *India To-day,* p 253 ভারতের একজন কমিউনিস্ট নেতা বলেছেন : "The feudal leadership of the 1857 revolt had been the main cause of its failure." (P. C. Joshi, *New Age*, 1957 August.)

৩ "The first blow dealt to the French Monarchy proceeded from the nobility, not from the peasants. The Indian revolt does not commence with the ryots, tortured, dishonoured and stripped naked by the British, but with the sepoys, clad, fed, petted, fatted and hampered by them." (Marx-Engels, *The First Indian War of Independence*, p. 91.)

৪. ড. মজুমদার বিদ্রোহের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না বলে তার পরাজয়কে অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিনিই পরে বলেছেন, বিদ্রোহীরা "threatened to destroy the whole fabric of the British Empire. Its fate hung on a thread as it were, and it was almost touch and go." (ঐ, পৃ. ২৭৭) আর এক স্থানে তিনি বলছেন : "even though the revolt did not spread over the whole country, or among all sections of the people, the localities and numbers affected by the mutinous or rebellious spirit could be reasonably deemed to be sufficiently great to ensure victory." (ঐ, পৃ ২৭১)

৫. লাহোরে ইংরেজদের সংবাদপত্র *Lahore Chronicle,* 12th August

1857, লিখেছিল : "How Patiala proved untrue, the whole of the country between the Jumna and the Sutlej would have risen *enmasse*."

৬ মার্কস অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মহাবিদ্রোহের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ তিনি লিখেছিলেন : "বলা হয়েছে যে, ভারতের এই অঞ্চলে (মধ্যভারতে) 'শান্তি স্থাপিত হয়েছে,' কিন্তু তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। বস্তুত, মহাও দখল করার ওপর নয়, দুই মারহাটা রাজা হোলকার ও সিন্ধিয়া কি পথ নেন, তার ওপরই তা নির্ভর করে। যে খবরে মহাও-তে স্টুয়ার্টের আগমনের কথা জানানো হয়েছে তাতেই বলা হয়েছে যে, হোলকার এখনো অটল থাকলেও তাঁর সৈন্যদের আর শান্ত রাখা যাচ্ছে না। আর, সিন্ধিয়ার কার্যনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। ইনি যুবক, জনপ্রিয়, তেজস্বী, সমস্ত মারাঠাজাতির স্বাভাবিক নেতা ও সমাবেশ-কেন্দ্র বলে তাঁকে গণ্য করা হয়। তাঁর নিজের ১০ হাজার সুশৃংখল সৈন্য আছে। তিনি ব্রিটিশের পক্ষ ত্যাগ করলে শুধু মধ্যভারত তাদের হাতছাড়া হবে তাই নয়, বিপ্লবী দলটা পাবে বিপুল শক্তি ও সংগতি।" (প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, পৃ. ১০১-২)। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সিন্ধিয়া ফিউডাল বলে নাক সিটকোন নি, 'ফিউডাল নেতৃত্ব' বলে তাকে বরবাদ করে দেননি। বরং তাঁর বিদ্রোহে যোগ দেবার সম্ভাবনায় আশান্বিত হয়েছিলেন – কারণ "বিপ্লবী দলটা তাতে পাবে বিপুল শক্তি।"

মধ্যভারতের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে Sir Robert Hamilton লিখেছিলেন : "What has really foiled them (rebels) is the personal fidelity of Holkar, Sindhia and the Begum of Bhopal. Had any one of them declared for the Peshwa (Nana Sahib) our difficulties would have been beyond conception, the smaller Thakoors, and the rural class would have instantly joined their landlord and their sovereign and every village would have been openly hostile." (quoted by Srivastava, p. 220)

৭. *The First Indian War of Independence*, p. 44

৮. ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ইঙ্গ-ফরাসি তুর্কি জোটের সৈন্যরা যখন সেভাস্তপোল আক্রমণ করার ব্যবস্থা করছিল, তা ব্যর্থ করার জন্যে রুশ সৈন্যরা ইঙ্কেরমান তাদের শত্রুদের পাল্টা আক্রমণ করেছিল।

৯. ঐ, ১৪৭।

১০. "Often, during the months of June and July, were the

the English prompted to thank their stars that the rebels had neither a leader nor a plan of action, but blundered almost as much as the Supreme Government; for had it been otherwise, every living (English) soul in Bengal would have perished, or been forced to abandon the country." (Mead, p. 79)

১১. "...once again sepoy valour yielded to superior leadership." (Sen, p. 207)

১২. "Many thoughtful and experienced men now in India believe that it has only been by a series of miracles that we have been saved from utter ruin. It is no exeggeration to afirm that in many instances the mutineers seemed to act as if a curse rested on their cause. Had a single leader of ability arisen among them, nay, had they followed any other course than that they did pursue in many instances, we may have been lost beyond redemption." (*Minute of John Lawrence*, 19 April, 1858)

১৩. Razvi and Bhargava, *Freedom Struggle in UP.*, pp.425-27

১৪. Ball, vol. II, p. 309. ড. সেন বলেছেন : "In every battle in which the British army engaged the insurgents the victors had the advantage of superior arms. If the Enfield caused the Mutiny, the Enfield helped to overthrow the Mutineers." p. 207

১৫. Kaye, vol.II, p. 641 পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ইংরেজরা যেসব অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা থেকেই বোঝা যায়, ইংরেজদের তুলনায় বিদ্রোহীদের কী রকম আদিম অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল : ৬৮৪টি কামান, ১,৮৬,১৭৭টি মাস্কেট বন্দুক, ৫,৬১,৩২১টি তলোয়ার, ৫০,৩১১টি বল্লম এবং ৬,৩৮,৬৮৩ ছোট অস্ত্র।

১৬. ইংরেজরা এই আক্রমণাত্মক নীতির শ্রেষ্ঠত্ব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। আকস্মিকতার আঘাত সামলে নিয়েই তারা সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে মরীয়া হয়ে দিল্লি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়। "We must be prepared for an offensive war, with all difficulties against us. A merely defensive war would be to us nearly the same as defeat." (General Gardiner, *A Military Analysis...*, p. 52)

১৭. "Sepoys proved by their heavy losses that it was not courage in which they were lacking, but as at Delhi leadership." (Forrest)

১৮. সংখ্যার (পরিমাণের) গুণগত পরিবর্তন সম্বন্ধে নেপোলিয়ানের একটি উক্তি দিয়ে এঙ্গেলস চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছিলেন : "In conclusion, we shall call one more witness for the transformation of quantity into quality, namely Napoleon. He makes the following reference to the fights between the French cavalry, who were bad riders but disciplined, and the Mamelukes, who were undoubtedly the best horsemen in their time for single combat, but lacked discipline : 'Two Mamelukes were undoubtedly more than a match for three Frenchmen ; 300 Frenchmen could generally beat 300 Mamelukes, and 1000 Frenchmen invariably defeated 1500 Mamelukes" (Engels, *Anti-Duhring*, pp. 190-91)

৭

মহাবিদ্রোহের নৃশংসতা

ইংল্যাণ্ডের মানুষ ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছু জানুক না জানুক, ভারতবাসীর নৃশংসতা ও বর্বরতাব উদাহরণস্বরূপ কলকাতার অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড ও কানপুরে কূপ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সকলেই জানে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এইসব বিষয়ে সযত্নে শেখানো হয়।

ইংল্যাণ্ডের অনেক উদারনৈতিক লেখক বলেন যে, গণ-অভ্যুত্থানের সময় উভয়পক্ষই নানা প্রকারের বর্বরোচিত কার্যকলাপ করে থাকে। আগ্নেয়গিরি যখন লাভা উদ্‌গিরণ করে, তখন যারা তার সম্মুখে থাকে তারাই তার বলি হয়। সুতরাং অতীতের এই বেদনাদায়ক কাহিনীগুলিকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। এগুলির উপর একটা পর্দা টেনে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু ড মজুমদার পর্দা টেনে দিতে কিছুতেই রাজি নন, তিনি পর্দা তুলে ফেলে দিয়ে উভয়পক্ষের নৃশংসতাগুলিকে 'নিরপেক্ষভাবে', 'বস্তুনিষ্ঠভাবে' সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিচার করতে চান। নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তিনি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ? তাঁর মতে, বিদ্রোহী সিপাহিদের চরিত্রে ও ব্যবহারে যেটা 'প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য' ছিল, সেটা হলো তাদের 'ইংরেজদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা।' "কেবলমাত্র [ইংরেজ] অফিসারদের হত্যা করাই নয়, এমনকি তাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের নির্দয়ভাবে খুন করার উদাহরণও তারা স্থাপন করেছিল। অনেক সময় তাদের পাশবিকতা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যেত যে, তারা মায়ের চোখের সামনে তাদের শিশুদের কেটে ফেলতো। যে ভারত সংগতভাবেই মানবতাবাদের জন্যে খ্যাতিলাভ করেছিল, সিপাহিরা সেই মানবতাবাদকেই খর্ব করেছে, এই অভিযোগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।[১]

সিপাহিদের নৃশংসতা, লোভ, দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি 'প্রমাণ' করার জন্যে ড. মজুমদার তাঁর সাক্ষ্যের জন্যে প্রধানত নির্ভর করেছেন ইংরেজ লেখকদের উপর, এবং আমানুল্লা, জীবনলাল, মইনউদ্দিন, চুনিলাল ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজদের আশ্রিত গোলামদের ওপর। এই শ্রেণীর লোকের কথার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তা ড. মজুমদারের মতো প্রবীণ ইতিহাসজ্ঞের অজানা থাকার কথা নয়।

ড. সেনও 'নিরপেক্ষভাবে' ও 'বস্তুনিষ্ঠভাবে' 'উভয়পক্ষের' নৃশংসতাগুলিকে বিচার করে 'স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন' যে, ইংরেজেরা তাদের স্বজাতীয় নারী ও শিশুদের প্রতি নৃশংসতার কাহিনীগুলি শুনে পাগল হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তারা যে প্রতিশোধ নেবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, তাতে আর আশ্চর্য কি ?[২]

বিদ্রোহের প্রথম দিকেই কানপুরের অবরুদ্ধ ইংরেজদের মুক্ত করার জন্যে জেনারেল নীলকে পাঠানো হয়েছিল। কলকাতা থেকে কানপুর যাবার পথে নীল বিদ্রোহী গ্রামগুলিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে করতে গিয়েছিল। যেসব পুরুষ তার হাতে পড়েছিল, তাদের সকলকেই সে ফাঁসি দিয়েছিল এবং ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে অসংখ্য নারী ও শিশুদের হত্যা করেছিল। এইরূপ ধ্বংস ও হত্যা করার জন্যে সে মেজর রেনোকেও লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিল এবং রেনো তা সোৎসাহে পালন করেছিল।[৩]

নীল ও রেনো কানপুর পৌঁছবার অনেক পূর্বেই অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি নীল ও রেনো পথে বিদ্রোহীদের 'শিক্ষা' দেবার জন্যে অত্যধিক সময় ব্যয় না করত, তাহলে হয়তো তারা কানপুরের ইংরেজদের বাঁচাতে পারত। যাই হোক, নীল ও রেনোর বর্বর হত্যাকাণ্ডগুলির কথা কানপুর ও অন্যান্য স্থানে দ্রুত প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল। অনেক ইংরেজও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, নীল ও রেনোর হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার ফলে কানপুর কূপের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

পূর্ব ফ্রণ্টে নীল, রেনো, হ্যাভলক প্রমুখরা যে জহ্লাদের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, পশ্চিম ফ্রন্ট পাঞ্জাবে ও দিল্লিতে কুপার, নিকলসন, হাডসন প্রভৃতিও সেই ভূমিকাই পালন করেছিল। কুপার তার বইতে সদম্ভে লিখেছিল – "কানপুরে একটা কূপ আছে, কিন্তু উজনালাতেও একটা কূপ আছে।[৪] কুপার পাঞ্জাবে ৫০০ জন নিরস্ত্র সিপাহি বন্দীকে কি রকম পাশবিকভাবে হত্যা করে কূপে ফেলে দিয়েছিল, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কানপুরের হত্যাকারীদের কোনো ভারতীয় নেতা সমর্থন করেছিলেন বলে আমরা জানিনা।[৫] কিন্তু কুপারের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে সমথন করে তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন জন লরেন্স রবার্ট মনটোগোমারি প্রভৃতি পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী।[৬] দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর ইংরেজরা ৮ মাস ধরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও লুঠপাট চালিয়েছিল, সেরকম নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি নেই। লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, ফরাক্কাবাদ, ঝান্সি, ফয়জাবাদ, এলাহাবাদ সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদীদের একই রকমের পৈশাচিক নৃশংসতা। এলাহাবাদে ইংরেজদের সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বাঙালি পর্যটক যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয় হয়ে

থাকবে।[৭]

দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর কিরকম নৃশংস ব্যবহার করেছিল সে সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ অফিসার লিখেছেন: "শতশত ভারতীয়দের কোর্ট-মার্শালে ফাঁসির হুকুম হলো। যখন ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হচ্ছিল, সেই সময়ের মধ্যে তাদের উপর পাশবিক ও অমানুষিক অত্যাচার করা হলো।···তাদের শরীর বেয়নেটের দ্বারা বিদ্ধ করা হচ্ছিল এবং ...গরিব ও নির্দোষ হিন্দু গ্রামবাসীদের মুখের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল"।[৮] একজন ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ খোলাখুলিভাবেই বলেছেন যে,ভারতীয়-দের আর মানুষ বলে গণ্য করা হতো না,তাদের হিংস্র জানোয়ারের মতো দেখা হতো এবং কুকুরের মতোই তাদের হত্যা করা হতো।[৯]

অনেক শিখ ও পাঠান গুণ্ডা বদমায়েস ও জেলের কয়েদিদের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ বাহিনীতে নেওয়া হয়েছিল। এইসব শিখ পাঠানদের মাতাল করে দিয়ে ইংরেজ অফিসাররা বন্দী বিদ্রোহীদের উপর লেলিয়ে দিত। *Times* এর প্রতিনিধি রাসেল তাঁর ডায়েরিতে এইসব পশুগুলির নৃশংসতার একটি উদাহরণ দিয়েছেন:

শিখরা একজন বিদ্রোহীকে ধরে আনলো। বহুবার বেয়নেট দিয়ে তার মুখে ও দেহে আঘাত করা হলো। তারপর কতকগুলি কাঠ জোগাড় করে তাতে আগুন ধরালো; বন্দীকে জোর করে সেই আগুনের উপর শুইয়ে দেওয়া হলো ও তাকে বেয়নেট দিয়ে তাতে চেপে রাখা হলো,ধীরে ধীরে বন্দী আগুনে জ্বলতে লাগলো। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একবার মরীয়া হয়ে লাফিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করলো। শিখরা তাকে আবার চিতায় শুইয়ে দিয়ে বেয়নেট দিয়ে চেপে রাখলো।[১০] ঔপনিবেশিক হিরো নিকলসন বলেছিল: "বিদ্রোহীদের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিতে হবে, কিংবা আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যে একটা আইন পাশ করতে হবে।· বর্বরগুলিকে কেবলমাত্র ফাঁসি দিয়েই ক্ষান্ত হয়, এটা ভাবতেই আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।"[১১] অবশ্য ইংরেজ বীরপুঙ্গবরা আইন পাস করবার জন্যে মোটেই অপেক্ষা করেনি।

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা 'প্রতিহিংসার' দাবি তুললো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সভ্য দাবি করলো ব্রিটিশ পতাকার উপর 'ন্যায়বিচারের' স্থানে লেখা হোক 'প্রতিহিংসা'। ৬ই অকটোবরে *Times* লিখেছিল যে ধরাপৃষ্ঠ থেকে 'এইসব ঘৃণ্য কাপুরুষ বিদ্রোহীগুলিকে' নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক, এবং রক্তপিপাসু সিপাহিগুলিকে ধ্বংস করার জন্যে ইংরেজ সৈন্যরা যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করুক না কেন, সারা ব্রিটেন তা সমর্থন করবে। ৮ই অকটোবর কলকাতার 'ইংলিশম্যান' ভারতীয়দের উপর ইংরেজ বাহিনীর নৃশংসতাগুলিকে সমর্থন করে লিখলো এখানেই শেষ নয়, আরো অনেক বেশি

রক্ত চাই, আরো অনেক হিসাব-নিকাশ নিতে হবে।

আসলে এইসব নৃশংস প্রতিহিংসার দ্বারা ভারতীয়দের মধ্যে একটা ভয়ংকর সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য। দুইজন ইংরেজ অফিসার, যারা এইসব হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের বইতে লিখেছিল যে, তাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিশোধের চাইতেও জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।[১২] ইতিহাসজ্ঞ হোমস আরো সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, ইংরেজরা যেরকম উন্মত্তের মতো ব্যবহার করেছিল, তা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ততটা নয়, 'নিকৃষ্ট জাতির' দ্বারা অপমানিত হওয়ার জন্যে তা বেশি করেছিল।[১৩] এইটাই হচ্ছে আসল কথা: 'নিকৃষ্ট জাতি,' 'নেটিভ,' 'নিগার'রা শ্রেষ্ঠতর শ্বেতজাতির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস করে, শাসক জাতিকে চ্যালেঞ্জ করার ধৃষ্টতা রাখে, এর চাইতে ইংরেজের পক্ষে অধিকতর অপমান ও বিপদ আর কি হতে পারে?

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইংরেজ জনসাধারণের, বিশেষ করে টমিদের জিঘাংসাকে উত্তেজিত করার জন্যে, এবং অন্যান্য দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার জন্যে ভারতে ইয়োরোপীয় নারী ধর্ষণ ও শিশু হত্যার কাহিনীগুলি ইংরেজ শাসকরা ব্যাপকভাবে প্রচার করার ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছিল। নারীজাতির সম্মান রক্ষার জন্যে, মানবজাতির সভ্যতা রক্ষা করার জন্যে, একটা মহৎ আদর্শের জন্যে ইংরেজেরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়ছিল—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল বর্বর সাম্রাজ্যবাদের একটা নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা।

বিশেষ করে ধর্মের ব্যবসায়ী ইংরেজ পাদরিরা নারী ধর্ষণের কাহিনীগুলি প্রচারে সব থেকে বেশি যোগ্যতা দেখিয়েছিল। তারা সমস্ত ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপ ঘুরে 'নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' থেকে নারী ধর্ষনের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করে বলতো তারা নিজের চক্ষে দেখেছে: দিল্লিতে-বিদ্রোহ শুরু হতে না হতে ইয়োরোপীয় নারীদের উলঙ্গ করে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, ইত্যাদি ইত্যাদি।[১৪] বস্তুতঃপক্ষে, এই কাহিনীগুলি যে তাদের নিজেদেরই বিকৃত যৌন-মনস্তত্ত্ব প্রসূত ছিল, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ সাংবাদিক ও লেখকরাও এ ব্যাপারে কারো থেকে পিছিয়ে ছিল না।

এই ধর্ষণের ব্যাপারে সাভারকার একটা চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন: "ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গ নারী চেয়েছিল বলে ১৮৫৭-এর বিপ্লব ঘটেনি, তা ঘটেছিল ভারত থেকে শ্বেতাঙ্গ নারীর সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে দেবার জন্যে।"[১৫]

ধর্ষণের কাহিনীগুলির পশ্চাতে কোনো সত্য আছে কিনা, তা নির্ণয় করার জন্যে বড়লাট ক্যানিং ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান অফিসার স্যার উইলিয়াম মুইরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুইর সবকিছু তদন্ত করে তাঁর

চূড়ান্ত রায়ে বলেছিলেন, যদিও ইংরেজ নারী ও শিশুদের অনেক সময় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতি ধর্ষণ বা অপমানের কোনোই প্রমাণ তিনি পাননি।[১৬]

ভারতের ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে ইংরেজরা ভারতে এসেছিল। তার পূর্বে তাদের সঙ্গে ভারতবাসীর কোনো শত্রুতা ছিল না। ক্রমশ এইসব বিদেশি দস্যুরা ছলে-বলে কৌশলে ভারতবাসীর দেশ, ধনরত্ন, মানসম্ভ্রম সবই অপহরণ করেছিল। ভারতের শাসনভার দখল করে ইংরেজদের মনোভাব একটা কঠোর ও রূঢ় জাতীয় বিদ্বেষ ও ঔদ্ধত্যে পরিণত হলো। ইংরেজরা ভারতীয়দের নিকৃষ্ট বলে মনে করতে লাগলো—ব্যক্তিগত ভাবে,জাতিগত ভাবে, সাংস্কৃতিক ভাবে, নীতিগত ভাবে, সব ব্যাপারেই নিকৃষ্ট। এক কথায়, ইংরেজের চোখে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য জাতিগুলির মতো ভারতীয়রাও হয়ে দাঁড়ালো অর্ধ-মানব (sub-human) ভারতের মানবতাকে অস্বীকার করা হলো। এবং এটাই হলো সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতার ভিত্তি।

স্বাভাবিক নিয়মেই ইংরেজের এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রতিক্রিয়া ঘটলো ভারতবাসীর মনেও। ইংরেজের শাসনব্যবস্থা আইনকানুন, অর্থনীতি সবকিছু জাগিয়ে তুললো ভারতবাসীর মনে প্রচণ্ড ক্রোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাস। ভারতীয়দের এইজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধেরই বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৮৫৭ সনে। দেশময় বিদ্রোহীদের ধ্বনি—মার ডালো ফিরিঙ্গিও কো—একশত বৎসরের সাম্রাজ্য-বাদী শোষণ, লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ভারতবাসীর এই ক্রোধ ও ঘৃণা খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত।

১৮৫৭ সনে ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদের শাসন ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদীদেরও সবংশে নিশ্চিহ্ন করে দিত।[১৭] সেইদিন অন্তত ভারতীয়রা প্রেমের দ্বারা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় জয় করবে বলে আত্ম-প্রতারণা করেনি।

ভারতীয়দের নৃশংসতা, ধর্ষণ ইত্যাদি নিয়ে যখন ইংল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলি খুব হৈ-চৈ শুরু করে দিল, মার্কস তখন তার যথোচিত জবাব দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘ভারতে জুলুমের তদন্ত’[১৮] নামে একটা পুরো প্রবন্ধই মার্কসকে লিখতে হয়েছিল। এতে ব্রিটিশ সরকারের বহু রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কস দেখিয়েছিলেন, কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করার জন্যে এবং আরো অনেক ব্যাপারে কিভাবে ভারতে ইংরেজরা জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ইংরেজদের জুলুমের অনেকগুলি নজির দিয়ে মার্কস জিজ্ঞাসা করেছেন : “এসব কাজ ইংরেজরা যদি করে থাকে স্থির মস্তিস্কে, তাহলে বিদ্রোহ ও সংঘাতের বিক্ষোভে অভ্যুত্থানী হিন্দুরা যদি তাদের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগে দোষী হয়, সে কি আশ্চর্যের !”

এর কয়েকদিন পরে মার্কস আবার লিখলেন : "ভারতের বিদ্রোহী সিপাহিরা যে অত্যাচার করেছে তা বাস্তবিকই ভয়ংকর, বীভৎস, অবর্ণনীয় – যা কেবল অভ্যুত্থানী যুদ্ধে, জাতিযুদ্ধে, বর্ণযুদ্ধে ও সর্বোপরি ধর্মযুদ্ধেই দেখার জন্য তৈরী থাকতে হয় ; এক কথায়, তেমনি অত্যাচার, ইংলণ্ডের ভদ্রলোকরা যার তারিফ করেছে যখন তা 'ভান্দিয়রা' [ফরাসী রাজতন্ত্রীরা] চালিয়েছে 'ব্লু'দের [প্রজাতন্ত্রীদের] ওপর, স্পেনীয় গেরিলারা চালিয়েছে নাস্তিক ফরাসীদের ওপর, সার্বীয়রা চালিয়েছে তাদের জার্মান ও হাঙ্গারীর প্রতিবেশীদের ওপর, ক্রোশীয়রা চালিয়েছে ভিয়েনার বিদ্রোহীদের ওপর, কাভেনিয়াকে মোবাইল গার্ড বা বোনাপার্টের ডিথোম্বরিস্টরা [সমাজবিরোধীদের নিয়ে গঠিত গুপ্ত সমিতি] চালিয়েছে ফ্রান্সের প্রলেতারীয় ছেলেমেয়েদের ওপর। সিপাহীদের আচরণ যতই নিন্দনীয় হোক তা শুধু ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়কারেরই নয়, দীর্ঘ-স্থাপিত শাসনের গত দশ বৎসরে ইংলণ্ড নিজে ভারতে যে আচরণ তারই একটা পুঞ্জিভূত প্রতিফলন। এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে ঐ শাসনের চরিত্র হল এই যে তার আর্থিক নীতির অঙ্গীয় ব্যবস্থা হল জুলুম। মানব ইতিহাসে প্রতিশোধ বলে একটা কথা আছে, এবং এই ঐতিহাসিক প্রতিশোধের নিয়মই হালা এই যে, তার অস্ত্র গড়ে দেয় পীড়িতরা নয়, পীড়ক স্বয়ং।"[১৯]

একজন সৎ ইংরেজ শ্রমিক নেতাও 'নিরপেক্ষভাবে' ও বস্তুনিষ্ঠভাবে এইসব নৃশংসতাগুলিকে বিচার করেছিলেন ; তিনি হলেন আর্নস্ট জোন্স। তিনি বলেছিলেন : "এইগুলি (কানপুর ও অন্যান্য স্থানের হত্যাকাণ্ড) হচ্ছে ব্রিটিশের এতদিনকার একই রকমের জঘন্য ও বর্বর দুষ্কর্মের ফল।...মানুষের পক্ষে তার পূর্বপুরুষদের দুষ্কর্মের কথা ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে এবং এই দুষ্কর্মের প্রতিফলনস্বরূপ যা নিঃসন্দেহে ঘটবে, তা সে নিজের আত্মগরিমার বশে উপেক্ষা করে। কিন্তু এই শঠ, এই দস্যু, এই দুর্বৃত্ত জাতির নিকট ভারতীয়রা যে বড় শিক্ষা পেয়েছে তা তারা কখনোই ভুলতে পারে না। এই জাতিই তাদের মনে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার ছাপ মেরে দিয়েছে ; এই জাতিই যে বীজ বপন করেছিল, তার রক্তাক্ত ফসল আজ ভারতে তাকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে।"[২০]

অতীতের নৃশংসতাগুলি যদি ভুলে যাওয়া যেত, এই দুঃস্বপ্নময় অতীত যদি সত্যই অতীত হয়ে যেত, তাহলে এই পৃথিবীটা হয়তো একটা সুখময় স্থানে পরিণত হতে পারত। কিন্তু অতীত কি শুধু একটা পঞ্জিকা মাত্র ? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত কি ইতিহাসের কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা সংযুক্ত নয় ? ১৮৫৭ সনের নৃশংসতা, শোষণ ও নির্যাতনের উৎস – সাম্রাজ্যবাদ অতীত হয়ে যায়নি, আরো শক্তিশালীরূপে সে আজও জীবিত। ১৮৫৭ সনের অতীত আবার জীবন্ত হয়ে উঠলো, ১৯১৯ সনের জালিয়ানওয়ালাবাগের জেনারেল নীল পুনর্জন্ম গ্রহণ করলো জেনারেল ডায়ারে।

মহাবিদ্রোহের একশত বৎসর পরেও সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।[২১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঘটলো দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিক তাণ্ডব। মালয়, সাইপ্রাস, কেনিয়ায় ইংরেজদের; ইন্দোনেশিয়াতে ডাচদের; আলজেরিয়া, ইন্দোচীনে ফরাসিদের; ফিলিপাইনস, গুয়াটেমালা, কিউবা, দক্ষিণ আমেরিকা, কোরিয়ায় আমেরিকানদের; মিশরে ইঙ্গ ফরাসিদের; আঙ্গোলায়, মোজাম্বিকে, পোর্তুগিজদের; কঙ্গোতে বেলজিয়ান ও আমেরিকানদের; দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গদের; এবং সর্বোপরি সমগ্র দুনিয়ার চোখের সামনেই ঘটে চলেছে গত ২০ বৎসর ধরে অপরাজেয় ভিয়েতনামের উপর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের পৈশাচিক বর্বরতা।

সাম্রাজ্যবাদই নৃশংসতার মূল কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নৃশংসতার উপর পর্দা টেনে দেওয়া যাচ্ছে না। যেসব ইতিহাসজ্ঞ দুই পক্ষের নৃশংসতাকেই সমানভাবে 'নিরপেক্ষভাবে' দেখেন ও দুই পক্ষকেই সমান ভাবে নিন্দা করেন, তাঁর মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসের মৌলিক নৈতিক প্রশ্নটাকেই এড়িয়ে যান।[২২] বিদেশিরা তলোয়ারের জোরে পরদেশ জয় করে ও তলোয়ারের জোরেই তাকে অধীনে রাখে। সাধারণ দস্যুদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের কোনো নৈতিক পার্থক্য নেই। আলেকজাণ্ডার তাঁর এক বন্দী দস্যুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছ কেন? দস্যু জবাব দিয়েছিল: আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়? আপনি মহান আর আমি ক্ষুদ্র।

আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক মানুষেরই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য দস্যুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এই আত্মরক্ষার কাজে দস্যুদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার নৈতিক অধিকারও তার আছে।

নি র্দে শি কা

১. *Sepoy Mutiny*..., p. 173, বিদ্রোহীরা যেসব সরকারি ও জমিদারি নথিপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিল, নীল ও আফিং-এর কারখানাগুলি ধ্বংস করেছিল ও তাদের লোহার কড়াই ইত্যাদিগুলিকে গালিয়ে বন্দুকের গুলী

তৈরি করেছিল, তাকে ড. মজুমদার বলেছেন 'ভয়ানক' (gruesome) কার্যকলাপ। তিনি সর্বত্র এই প্রকারের "licence and madness of unchecked anarchy" শুধু দেখতে পেয়েছেন—যা তাঁর মতে, কেবলমাত্র "Asiatics can reveal in these pleasures." ড. চৌধুরী জবাব দিয়েছেন : "Those who consider the melting of iron boilers for shot as 'gruesome' might have been thinking of shadow-boxing and not a real fight".(*Theories*..., p. 54)

২ "...both sides were guilty of false propaganda...The struggle may be characterised as a struggle of fanatic religionists against christians···Christians had won but not Christianity...It must be concoded that Englishmen had been driven mad by cruel stories of comraded murdered, children butchered and women dishonoured. ...No wonder that the whiteman thirsted for revenge" (Sen, pp. 413-14)

৩ *Times* পত্রিকার প্রতিনিধি Russel তাঁর Diary-তে লিখেছিলেন (pp. 221-22) *:* "An officer who was attached to Renaud's column told me that the executions of the Natives were indiscriminate....(even) a batch of 12 men were executed because their faces were "turned the wrong way" when they were met on the march....This severities could not have been justified by the Cawnpore massacre because they took place before that diabolical act."

৪. Cooper *Crisis in the Punjab*, p. 167 ; একজন ইংরেজ অফিসার উজনালা হত্যাকাণ্ডের উপর মন্তব্য করেছিলেন : "the sacrifice of 500 villanous lines for the murder of two Englishmen is a retribution that will be remembered." (Greathead, *Letters written during the Siege of Delhi*, p. 15) এর উপরে Edward Thompson মন্তব্য করেছিলেন *:* "Yes, it (Ujnala) is one of the memories of India, as Cawnpore is of England". (*Other side of the Medal*, p. 66)

৫. শুধু ড মজুমদার ও সেনই নন, সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেও দু-এক জন এই নৃশংসতাগুলি 'নিরপেক্ষভাবে' বিচার করার চেষ্টা করেছেন। Sir George Campell তাঁর *Memories of My Indian Career*-এ লিখেছেন :

"It is difficult to say anything in extenuation of the Cawnpore massacre and the terrible scene at the well, and yet it was done, not in cold blood, but in the moment of rage and despair, when Havlock had beaten the rebels and was coming in, and second, that we had much to provoke such things by the severities of which our people were guilty as they advanced. At a later time a careful investigation was made into the circumstances of the massacre, and we failed to discover that there was any premeditation or direction in the matter··· Neill did things almost more than the massacre, putting to death with deliberate torture in a way that has never been proved against the natives."

৬. কুপারকে পাঞ্জাবের গভর্নর জন লরেন্স লিখেছিলেন: "All honour for what you have done ; right well you did it,···It will be a feather in your cap as longer you live."

৭. "The marshall law was an outlandish demon, the like of which had not been drempt of in Oriental demonology. . It mattered little whom the red coats killed, the innocent and the guilty, the loyal and the disloyal, the well-wisher and the traitor, were confounded in one promiscuous vengence. To 'bag the nigger' had become a favourite phrase of the military sportmen of that day. ...they caught all on whom they could lay their hands, porter and pedlar, shop-keeper or artisan and hurring them on through a mock trial, made them dangle on the nearest tree. Nearly 6,000 beings had been thus summarily disposed of and launched into eternity. Their corpses hanging by two and three from branches and sign-posts all over the town, speedily contributed to fighten down the country into submission and tranquility. For 3 months did 8 dead-carts daily go their rounds from sunrise to sunset, to take down the corpses which hang at the crosg-road and market-places, poisoning the বায়ু

of the city, and to throw their loathsome burdens into the ganges." (Bholanath Chander, *Travells of a Hindu.*)

৮ *History of the Siege of Delhi* ; by an Officer.

৯. Montgomery Martin, vol. II, p. 449

১০. "There were Englishmen looking on, more than one officer saw it. No one offered to interfere....'And his cries, and the dreadful scene', said my friend, 'will haunt me to my dying hours." (Russell, *Diary*, 1957 ed. p. 87)

১১. কেই, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১

১২. Maude and Sherer, *Memoirs of the Mutiny*, vol. I, p. 70 ; vol. II, p. 526

১৩. Holme, vol. III

১৪. "Delicate women, mothers and daughters [in Delhi] were stripped of their clothing, violated, turned naked into the streets, beaten with canes, pelted with, and abandoned to the beastly lusts of the blood stained rabble, until death or deprived them of all consciousness of their unutterable misery." (Ball, vol. I, p. 75)

১৫. Savarkar p. 125

১৬ "The object of the Mutineers was, I believe, not so much to disgrace our names as to wipe out all trace of Europeans, and of everything connected with foreign rule....As there was no dishonour committed in principle, with the view of inflicting disgrace, so likewise, at it appears to me, there was no dishonour done from passion." "I gladly add my testimony that nothing has come to my knowledge which would in the smallest degree support any of the tales of dishonour current in our own public." (Muir, *Records of the Intelligence Dept. Mutiny of* 1857, vol. I, p. 369, p. 372)

১৭. "···an officer when trying the prisoners, asked a sepoy why they killed woman and children. The man replied, "when you kill a snake, you kill its young too." (Mrs. Coopland, *A Lady's Escape from Gwalior*, p. 234)

১৮. মার্কস-এঙ্গেলস : প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-৫৯, পৃ. ৭৩-৭৯

১৯. তদেব, পৃ, ৯৩

২০. *Earnst Jones*, p 54

২১. "It is hopeful to have to refer to this past history, but the spirit behind those events did not end with them It survived and whenever a crisis comes or nerves give way, it is in evidence again. The world knows about Amritsar and Jallianwalabag but it does not know of much that has taken place even in recent years and in our time which has embittered the present generation. Imperialism and the domination of one people over another is bad, and so is racialism. But Imperialism plus racialism can only lead to horror and ultimately to the degradating all concerned with them" (Jawaharlal Nehru, *Discovery of India*, p.386)

২২. ১৯৬৬ সনে শিকাগো শহরে Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Staughton Lynd ভিয়েতনাম যুদ্ধের 'প্রতিবাদ দিবসে' তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবেই এই গোড়ার প্রশ্নটা তুলে ধরেছিলেন : "We spend a good deal of time in the peace movement arguing about the slogan 'negotiation' as over against the slogan 'withdrawal'. I think those slogans represent a real difference in appraisals of the war. He who advocates 'negotiation' is likely fed that both sides are more or less equally guilty ; ···He who advocates 'withdrawal' is likely to feel that the U.S.A. is the aggressor and that N.L.F. (National Liberation Front of Vietnam) violence cannot be compared with the genocidal practice of America ; that the N.L F is right in feeling that much as it wants peace, peace would look substance so long as American troops and bases are in vietnam !···" (*National Guardian*, New York, 16 April 1966)

৮

মহাবিদ্রোহ কি স্বাধীনতার যুদ্ধ?

ড. মজুমদার বলেছেন, ১৮৫৭ সনের তথাকথিত প্রথম জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধটা প্রথমও ছিল না, জাতীয়ও ছিল না, স্বাধীনতার যুদ্ধও ছিল না।[১] তিনি আরো বলেছেন যে, "প্রকৃতপক্ষে ভারতে ১৮৫৭ সালে বা তার পূর্বে কোনো সময়ে একটা জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ আমরা মোটেই আশা করতে পারি না। '৫৭-এর বিদ্রোহকে জাতীয় চরিত্রের রূপ দেওয়া অথবা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে গণ্য করার অর্থই হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জনগণের ইতিহাসের অজ্ঞতা প্রকাশ করা।"[২]

ড. মজুমদার বারবার বলেছেন, '৫৭ সনে ভারতীয়দের মধ্যে 'সঠিক অর্থে' স্বাধীনতা সম্বন্ধে বা জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না এবং তাঁর মোটামোটা বইগুলিতে বহু কূটতর্কের অবতারণা করে তিনি পাঠকদের তাঁর এই তত্ত্বগুলি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ড. মজুমদার নিজে 'সঠিক অর্থে' স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝেন, তা কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি। তাই, তিনি তাঁর নিজের অসংখ্য স্ববিরোধী উক্তির জালে জড়িয়ে পড়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে '৫৭-তে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার আকাংক্ষা, ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে ভারতীয় রাজত্ব স্থাপন করার ইচ্ছা ভারতীয়দের মধ্যে ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে ড. মজুমদারের চাইতে তৎকালীন ইংরেজ শাসকদেরই বোধহয় বেশি ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব। মহাবিদ্রোহের বিশ বৎসর পূর্বে বড়লাট মেটকাফ লক্ষ্য করেছিলেন যে বহু ভারতীয় ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে এবং এমন অনেক লোকও আছে যারা সে কাজকে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।[৩] মহাবিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ করার সময় গার্ডিনারও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন যে, ভারতীয়রা বিদেশি শাসনের অধীনে থাকার গ্লানি সর্বদাই অনুভব করত।[৪] ডিসরেইলি একাধিকবার পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে, সিপাহিরা লড়ছে নিজেদের দাবিদাওয়ার জন্যে নয়, তারা লড়ছে সাধারণ জাতীয় বিক্ষোভের প্রতিনিধিরূপে।[৫] ইংরেজ শাসকদের এই রকমের আরো অসংখ্য উক্তি রয়েছে।

সেই যুগের পরিস্থিতি ও সেই সময়কার ভারতীয়দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর কিছুটা জ্ঞানগম্য ছিল, তা বোধহয় ড. মজুমদার অস্বীকার করবেন না। হরিশচন্দ্রও কি বলেন নি যে, পরাধীনতার গ্লানি সব ভারতীয়রাই অনুভব করত?[৬] তারপর, ইংরেজ গুপ্তচর মইনউদ্দিনের বহু উক্তি ড. মজুমদার বেদবাক্য বলে উদ্ধৃত করেছেন, সেই মইনউদ্দিনও কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেনি যে, "ভারতীয়রা ইংরেজদের অনধিকার প্রবেশকারী বলেই মনে করত, এবং অযোধ্যা দখলের পর এই মনোভাব আরো তীব্র হয়ে ওঠে।"[৭]

সর্বশেষে বলতে হয় যে, উনিশ শতকে ভারতে একজন ইতিহাসবিদ জন্মেছিলেন যাঁর নাম রমেশচন্দ্র দত্ত ও যাঁর অভিমতকে ভারতীয়রা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তিনি কি বলেন নি যে '৫৭ সনের বিদ্রোহ সিপাহিদের সামান্য একটা মিউটিনি নয়, এটা সমস্ত উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক অভ্যুত্থান হিসাবে?[৮]

জাস্টিন ম্যাকার্থির অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনিও বলেছিলেন, যে-মূহূর্তে বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করলো, তখন থেকেই এই বিদ্রোহ একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধে পরিণত হলো ও বিদ্রোহীর একটা পতাকা পেল, একটা জাতীয় আদর্শ পেল। মহাবিদ্রোহের আর একজন ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ বলেছেন যে, মুঘল সম্রাটের সত্যই কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু ভরেতের জনসাধারণের মন থেকে তিনি মুছে যান নি; যে মূহূর্তে তাঁকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হলো, তখন থেকেই জনসাধারণের বিদ্রোহের রূপ নিল।[৯] যে নানাসাহেব পেশোয়াশাহি পুনঃস্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনিও দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাহাদুর শাহকে ভারতের সার্বভৌম সম্রাট বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ভারত ১৮৫৭ সনে ইতিহাসের ক্রমবিকাশের যে স্তরে ছিল, জনমানসে স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের এই ছবিটাই ছিল স্বাভাবিক। এই অবস্থায় ভারতবাসীর প্রধান ঐতিহাসিক কর্তব্য ছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে ধ্বংস করে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভারতবাসীর শাসনতন্ত্র স্থাপন করা—সে শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক হবে, কি গণতান্ত্রিক হবে, কি সমাজতান্ত্রিক হবে, সেটা পরের কথা। বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে ও তাঁকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে সেই প্রথম কর্তব্যটাই পালন করেছিল। এবং তখন থেকে দুই বৎসর ধরে যে রক্তাক্ত লড়াইটা তারা করেছিল তা যদি স্বাধীনতার সংগ্রাম না হয় তাহলে জগতের ইতিহাসে কোনটা স্বাধীনতা যুদ্ধ? লক্ষণীয় বিষয় যে, ড. মজুমদার স্বাধীনতার যুদ্ধের একটা উদাহরণও দেননি, শুধু নেতিবাচক ভাবে বলে গিয়েছেন, '৫৭ সনের লড়াইটা স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়। কূট তার্কিকদের এই

স্বভাবজাত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটাই হলো এই বিষয়ে ড. মজুমদারের বৈশিষ্ট্য।

মহাবিদ্রোহ যে স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল না তা প্রমাণ করার জন্যে ড. মজুমদার যে 'যুক্তি'টি দিয়েছেন তা হলো এই—"অনেকেই মনে করেন যে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যে কোনো গোষ্ঠীর যে কোনো যুদ্ধকেই স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে মেনে নিতে হবে। এরূপ মেনে নেওয়াটা সুযুক্তিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা যেতে পারে—বৃটিশদের বিরুদ্ধে পিণ্ডারীদের ও ওয়াহাবীদের দুর্দান্ত ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াই-এর নির্দিষ্ট উদাহরণ দুইটি দিয়ে। যদিও পিণ্ডারীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে দুর্দান্তভাবে লড়েছিল এবং তাদের পেছনে শক্তিশালী সংগঠনও ছিল—যা ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে ছিল না, তা সত্ত্বেও পিণ্ডারীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল বলাটা হাস্যকর হবে।" ওয়াহাবিরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল, তারা ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়াতে চেয়েছিল ও ভারতে একটা দার-উল-ইসলাম স্থাপন করতে চেয়েছিল। ভারতে ইংরেজরা আসার পূর্বে পাঞ্জাবে তারা শিখদের বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং পাঞ্জাবকে শিখদের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল এবং যখন ইংরেজরা পাঞ্জাব জয় করলো তখন ওয়াহাবিরা তাদের শত্রুতা শিখদের পরিবর্তে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করলো। অর্থাৎ আমরা এমন একটা হাস্যকর অবস্থায় পৌঁছচ্ছি সেখানে শিখদের পাঞ্জাব থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটাই হবে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ।[১০] q.e.d.—*quod erat demonstrandum* যা প্রমাণ করার ছিল তা প্রমাণ হয়ে গেল। কি চমৎকার!

ওয়াহাবি আন্দোলন বা পিণ্ডারি যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি, তার মূল্যায়নও হয়নি। ওয়াহাবিদের আন্দোলন বহুদিনকার, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল—কোনো সময়ে ধর্মের গোঁড়ামিটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল, আবার অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকটাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। মহাবিদ্রোহের সময় ওয়াহাবিরা বহুস্থানে হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়েছিল সমগ্র ভারতকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্যে। সারা ভারতে একজন ওয়াহাবি নেতাও ধর্মের নাম করে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র পাকিস্তান দাবি করেন নি। ড. মজুমদারের উপরিউক্ত ওয়াহাবিদের ইতিহাসটা একটা সম্পূর্ণ বিকৃতি মাত্র।

পিণ্ডারিদের সঙ্গে '৫৭-এর বিদ্রোহীদের কয়েকটি সম্পর্কবিহীন ভাসা ভাসা সাদৃশ্য আবিষ্কার করে—যেমন, পিণ্ডারিরা ছিল দস্যু, সিপাহিরা ছিল Free-lance—এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের যুদ্ধকে ড. মজুমদার সমপর্যায়ে বসিয়ে দিয়েছেন!

পিণ্ডারিরা বহুদিন ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল সত্য, কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস করা বা তার স্থানে ভারতীয় রাজত্ব স্থাপন করার কোনো পরিকল্পনা

তাদের ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহীদের তা ছিল—তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি ইংরেজ শাসন ধ্বংস করে ভারতকে স্বাধীন করা, সার্বভৌম করা, একেই বলে স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং এইখানেই '৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সঙ্গে পিণ্ডারি যুদ্ধের গুণগত মৌলিক পার্থক্য। এই গুণগত পার্থক্যটাকে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ড. মজুমদার মহাবিদ্রোহের চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করতে পেরেছেন, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই বিদ্রোহ স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল না, এটা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট ভাড়াটিয়া দস্যুদের (Free lance) একটা শেষ প্রচেষ্টা মাত্র।

ড. সেন মহাবিদ্রোহের প্রায় সব প্রশ্নেই ড. মজুমদারের সঙ্গে একমত, কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। ড. সেন বলেছেন '৫৭ এর বিদ্রোহ যুদ্ধই ছিল—"যখন মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লির বাদশাহকে তাদের মাথার উপর বসাল এবং অভিজাত শ্রেণীর ও জনসাধারণের একটা অংশ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল তখন থেকে সিপাহিদের বিদ্রোহ জনসাধারণের বিদ্রোহে পরিণত হল। যেটা ধর্মের জন্য একটা লড়াই রূপে শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হল কারণ এ বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহীরা একটা বিদেশি সরকারের হাত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল এবং পুরাতন শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল যার ন্যায্য প্রতিনিধি ছিলেন দিল্লির বাদশাহ"।[১২] লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ড. সেন—"বিদ্রোহীরা বিদেশীদের হাত থেকে তাদের দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিল" ও তারা "পুরাতন শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল"—এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়কে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। বোধহয় তাঁর নিকট একটা দেশের মর্যাদা (status) ও সেই দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

ড. সেনের এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে ড. মজুমদার বলেছেন : "এই মন্তব্যটি যে ঠিক কার প্রতি প্রযোজ্য—সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি, না জনসাধারণের বিদ্রোহের প্রতি, না উভয়ের প্রতি তা সুস্পষ্ট নয়।... তা ছাড়া এটা মনে রাখতে হবে যে বেসামরিক জনসাধারণ যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল, বাহাদুর শাহ তার বহু পূর্বেই বৃটিশের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিলেন, এবং প্রতীক রূপে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।"[১৩] সঠিক যুক্তি বা দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হলে প্রাচীন ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতদেরও যে কিভাবে কাকতালীয় কূটতর্কের আশ্রয় নিতে হয়—এটি তার একটি উদাহরণ।

কাকতালীয় 'যুক্তির' আর একটি উদাহরণ : ড. সেন বলেছেন, "অযোধ্যায় বিদ্রোহ একটা জাতীয় আকার ধারণ করেছিল" এবং "অযোধ্যার দেশ প্রেমিকরা তাঁদের রাজা ও দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।" ড. মজুমদার চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন—এক বৎসর পূর্বে যখন অযোধ্যার রাজা অপমানজনক ভাবে বিতাড়িত

হয়েছিলেন, কৈ তখন তো দেশপ্রেমিকরা বিদ্রোহ করেন নি, তাহলে এটা কি রকম দেশপ্রেম ? তাছাড়া যদি অযোধ্যার দেশপ্রেমিকরা অযোধ্যার স্বাধীনতার জন্য লড়ে থাকেন, তাহলে সেটাকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ কি করে বলা যায়? "যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে 'অযোধ্যার দেশপ্রেমিকরা' শুধু তাদের রাজা ও তাদের দেশের জন্য লড়েছিলেন তাহলে অমনিতেই (automatically) তাঁরা সাধারণ স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন, আদৌ যদি অযোধ্যার বাইরে এইরকম একটা যুদ্ধ হয়ে থাকে।"[১৪]

আরো একটা কারণে ড. মজুমদাব মহাবিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে রাজী নন। সে কারণটা হলো, তাঁর মতে বিপ্লব বা স্বাধীনতার যুদ্ধের পশ্চাতে নাকি একটা ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা থাকতেই হবে।[১৫] ১৮৫৭-এর প্রাক্কালে নেতাদের কোনো ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনার 'সঠিক' প্রমাণ তিনি পাননি, এবং 'দৃঢ় ও সঠিক প্রমাণ' (strongest and positive evidence) ব্যতীত তিনি ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনার কথা মেনে নিতে রাজী নন।

ড. মজুমদারের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা অ্যানার্কিজম ছাড়া আর কিছু নয়। অ্যানার্কিস্টরাই মনে করে যে, কয়েকজন নেতা চক্রান্ত করে হঠাৎ একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে (putsch) বিপ্লব করে দিতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় বিদ্রোহ ঘটায় জনসাধারণ, নেতারা নয়। নেতাদের কাজ হলো এই গণবিদ্রোহকে সংগঠিত করা, পরিচালনা করা ও সাফল্যমণ্ডিত করা।

'৫৭ সনের বিদ্রোহী নেতারা ষড়যন্ত্র করেছিলেন কি করেন নি—এই প্রশ্নটাকে ড. মজুমদার মুখ্য বলে গণ্য করে মহাবিদ্রোহের গোটা ইতিহাসটাকেই বিকৃত করে তুলেছেন। মহাবিদ্রোহের মতো এত দীর্ঘস্থায়ী ও বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী অতবড় একটা বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের চরিত্রটাকে তিনি কয়েকজন নেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কার্যকলাপ ও দুর্বলতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে ফেলেছেন। যেন এই গণবিদ্রোহের সারসত্তা তাঁদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত আশা আকাংক্ষার উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। মহাবিদ্রোহকে এইভাবে চিত্রিত করার অর্থই হচ্ছে বাস্তব বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ও জনগণের ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা। যেসব অগণিত সাধারণ মানুষ এই-বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, দলে দলে প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরও একটা আশা আকাংক্ষা ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের শোষণ ও নির্যাতন তাদেরই সব থেকে বেশি ভোগ করতে হতো। এইসব লক্ষ লক্ষ কৃষক, কারিগর, সিপাহি, সাধারণ মানুষ একটা স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় চেতনার স্পর্শানুভূতিতে সাড়া দিয়ে ভারতের সমগ্র ইতিহাসে অন্তত একটিবারের মতো আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রামে অগ্রসর হয়ে এসেছিল। নেতাদের অপরাধ এই নয় যে তাঁরা ষড়যন্ত্র করেন নি। তাঁদের দুর্বলতা এইখানেই যে তাঁরা এই বিরাট গণ-অভ্যুত্থানকে সুসংগঠিত করতে পারেন নি, সঠিকভাবে তাকে পরিচালনা

করতে পারেন নি, এবং এত সুযোগ পেয়েও তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারেন নি।

যাই হোক, বিদ্রোহী নেতারা যে একেবারেই ষড়যন্ত্র করেন নি—একথাটা ড. মজুমদার এত কঠোর পরিশ্রম করেও 'সঠিকভাবে' প্রমাণ করতে পারেন নি। এই বই এর প্রথম দুই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ১৮৫৬-৫৭ সনে ভারতে কিভাবে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এইরকম বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে বহু আন্দোলন সভা-সমিতি, ঘরোয়া বৈঠক, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং ভারতে হয়েছিলও তাই। কেই, ম্যালিসন, বল, ডাফ, নর্টন, জাস্টিন ম্যাকার্থি প্রমুখ সকলেই '৫৭-এর বিদ্রোহকে 'সুসংগঠিত' (organised) বলেই বর্ণনা করেছেন। কথাটা অত্যুক্তি হলেও, একেবারে অসত্য নয়। ম্যালিসনের বইতে ষড়যন্ত্রকারীগণ' (conspirators) নামে একটা বিশিষ্ট অধ্যায়ও আছে। তাঁর মতে নানাসাহেব, ফৈজাবাদের মৌলভি, ঝান্সির রানী, প্রমুখ ব্যক্তিরা বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। ম্যালিসন এমন কথাও বলেছেন যে, এইসব চক্রান্তকারীরা একটা কার্যনির্বাহক কমিটিও গঠন করেছিলেন, এবং এই কমিটিই টোটার প্রশ্নের সুযোগ নিয়ে সিপাহিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করেছিল ও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চাপাটি বিতরণ করছিল, এই কমিটিই ভারতে সিপাহিদের একই দিনে বিদ্রোহ করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করেছিল কিন্তু ঐ দিনটি এই কমিটি কয়েকবার বদল করেছিল। "ভগবানের দয়ায় সেই নির্ধারিত দিনে এমন কিছু ঘটেছিল যার ফলে পরিকল্পিত বিস্ফোরণ ঘটতে পারেনি।"[১৬]

কেই-র মতে নানাসাহেবই ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান সংগঠক। ইংল্যাণ্ডে তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হবার পর থেকেই নানাসাহেব আজিমুল্লার সাহায্যে বিভিন্ন দরবারে ও সিপাহিদের ক্যাম্পে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।[১৭] বিদ্রোহ শুরু হবার ঠিক পূর্বে নানাসাহেব প্রকাশ্যেই দিল্লি, লখনৌ, কাল্পি ইত্যাদি স্থানে গিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই জনসাধারণ হাটে-বাজারে সর্বত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করত। এইসব আন্দোলনে ও চক্রান্তে যে অনেক নেতা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিপাহিদের গুপ্ত-বৈঠক বসেছিল, সে সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাসবিদরা অনেক তথ্য-প্রমাণ দিয়েছেন। এর চাইতে বেশি প্রমাণ আর কি আশা করা যেতে পারে? মুশকিল হচ্ছে যে, যাঁরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করেন তাঁরা ইতিহাসবিদ পণ্ডিতদের জন্যে চতুর্দিকে সাক্ষী-প্রমাণ ছড়িয়ে রেখে যান না, বা ঢাকঢোল পিটিয়েও সে কাজ করেন না। তার একটা মুশকিল এই যে, ড. মজুমদার 'সঠিক প্রমাণ' বলতে কি বোঝেন তা বোঝাও দুঃসাধ্য।

বিদ্রোহের পূর্বে চক্রান্ত ছাড়াও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ভারতব্যাপী একটা প্রচণ্ড আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলন করেই

ফয়জাবাদের মৌলভি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি অভিজাত ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন সত্যিকারের গণনেতা। শুধু অযোধ্যাতেই নয়, ভারতের বহুস্থানে জনসভায় তিনি অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

১০ মে-র পূর্বে একটা ব্যাপক গণ আন্দোলন হয়েছিল বলেই মিরাটে বিদ্রোহ শুরু হবার এক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে এবং দূর দুরান্ত অঞ্চলে ঝড়ের বেগে সিপাহি ও জনসাধারণের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। ১১-ই মে দিল্লি, ১৩ ফিরোজপুর, ১৫ মুজাফফর নগর, ২০ আলিগড়, ২১ নওশেরা (পেশোয়ার), ২২ হোতি মর্দান, ২৩ এতোয়া, মৈনপুরী, ২৫ রুরকি, ৩০ লখনৌ, হোদুল, মথুরা, ৩১ বেরিলি, শাহজাহানপুর, ১লা জুন মোরাদাবাদ, বাদাউন এবং ৯ জুনের মধ্যে আজমগড়, সীতাপুর, মালোন, মোহামদী, বারাণসী, কানপুর, এলাহাবাদ, ফয়জাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর।

বিদ্রোহ ঘোষণার পর সিপাহি ও জনসাধারণ প্রথম যে কাজটা করেছিল তা হলো, তারা ইংরেজ সরকারের শাসন যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল—ইংরেজের আইন-আদালত, ভূমিব্যবস্থা, রাজস্ব নীতি, তার সমস্ত দলিলপত্র সবই জনসাধারণ ধ্বংস করে দিল। পুলিশ বাহিনীগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ইংরেজ রাজত্ব যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো শেষ হয়ে গেল। প্রতিটি অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় রাজাদের অধীনে জনসাধারণের সহযোগিতায় ভারতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হলো। বিদ্রোহের সময় রানী লক্ষ্মীবাই-এর নেতৃত্ব ঝান্সিতে যে শাসনব্যবস্থা চালু হলো, সেইরকম জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা ঝান্সির জনসাধারণ পূর্বে কখনো দেখেনি। গোরখপুরের মহম্মদ হাসানের শাসনব্যবস্থাও উদাহরণ স্বরূপ হয়েছিল। ফারাক্কাবাদের নবাব যে শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা তাঁর শত্রুরাও প্রশংসা করেছিলেন।[১৮]

এগুলি বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না সত্য, কিন্তু আবার একবারে পুরানো মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাও ছিল না। এগুলি ছিল যুগ পরিবর্তনকালীন একটা অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা, এবং স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা, অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নয়। '৫৭ সনের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারত যদি স্বাধীন হতো, তাহলে ভারতের শাসনতন্ত্রের রূপ কি হতো—রাজতন্ত্র না গণতন্ত্র, না অন্য কিছু—এ প্রশ্ন তখনো ওঠেনি। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারত বিজয়ী হলে, ভারতের শ্রেণী সংগ্রাম একটা নতুন পর্যায়ে শুরু হতো এবং তখন ভারতীয় জনসাধারণকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। ১৮৫৭ সনের প্রধান প্রশ্ন ছিল বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হওয়া এবং ইংরেজ শাসন ধ্বংস করা। এই কর্তব্য সম্পন্ন হলে ভারতের শাসনতন্ত্রের রূপ নির্ধারণ করার কাজ, ইতিহাসের বিবর্তন অনুসারেই ভারতীয়দের পরবর্তী কর্তব্য

হিসাবে উপস্থিত হতো।

একটা দেশের সব শ্রেণীর মানুষেরই সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তার সার্বভৌমত্বের মর্যাদা (status) রক্ষা করা, অথবা সেই দেশ যদি পরাধীন হয় তাহলে তার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমাদের পণ্ডিতদের ও প্রগতিশীলদের প্রধান বক্তব্য হলো যে, এটা ছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যযুগের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় ফিরে যাবার একটা শেষ প্রচেষ্টা এবং সেই জন্যেই প্রগতিশীলরা তাকে সমর্থন করতে পারেন না। যদি স্বীকারই করে নেওয়া যায় যে, মহাবিদ্রোহ মধ্যযুগে ফিরে যাবারই একটা প্রচেষ্টা ছিল, তা হলেও কি এটা অস্বীকার করা যায় যে সেটা একটা স্বাধীন ভারতই হতো। মধ্যযুগেও তো স্বাধীন দেশ ছিল এবং তাদের স্বাধীন থাকার অধিকারও ছিল। আমাদের পণ্ডিতরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক বা অজ্ঞতাবশতই হোক, দুটো স্বতন্ত্র ও পৃথক বিষয়কে এক করে ফেলেছেন – একটা হলো, একটা দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা (status), অর্থাৎ একটা দেশ স্বাধীন, কি অর্ধস্বাধীন, কি পরাধীন ; আর দ্বিতীয়টা হলো, সেই দেশের সরকারের গঠনতন্ত্র (form of government), অর্থাৎ সে দেশ কি স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক; সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক, না প্রজাতান্ত্রিক ইত্যাদি ?

একটা দেশের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে পারলেই তার গঠনতন্ত্র, তার অর্থনীতি, তার সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করার দিকে কোনো দেশের মানুষ অগ্রসর হতে পারে। তখন তারা চিন্তা করতে পারে তারা মধ্যযুগে ফিরে যাবে, না বর্তমানকালের শাসন ব্যবস্থা গড়বে।[১৯] পরাধীন দেশ যদি স্বাধীনতার প্রথম ধাপে অগ্রসর না হতে পারে, তাহলে তার পক্ষে অগ্রবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়ার কথাই ওঠে না। ১৮৫৭ সনে ভারতীয়রা তাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই ভারতের প্রগতি, তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আরো একশত বৎসরের জন্যে স্তবধ হলে থাকলো।

সোভিয়েত ভারতবিদ ড. রেইসনার বলেছেন : "বস্তুমুখীভাবে ১৮৫৭-৫৯-এর অভ্যুত্থানের লক্ষ্যটা ছিল ভারতকে এক স্বাধীন ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে স্থাপন করা – যদিও বিদ্রোহের নেতারা কখনোই তাঁদের এই কর্তব্যটিকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করেননি। ১৮৫৭ সনে যাঁরা বন্দুক নিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই বিদ্রোহীদের নেতাদের বেশীর ভাগই বিশ্বাস করতেন যে ঔপনিবেশিক দাসত্বশৃংখলে বাঁধা পড়ার আগে দেশে যে সমস্ত ব্যবহার অস্তিত্ব ছিল তাকেই তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু বিদ্রোহের নেতারাও তাতে যোগদানকারীরা যাই ভেবে থাকুন না কেন, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা এক প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিরোহের সেই প্রগতিশীল সারমর্মটুকু ছিল : বৃটিশদের বিতাড়িত

করার বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস – যার ফলে দেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ সে যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তাগিদেই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে হতে পারত না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং সেই গণ অভ্যুত্থান সফল হলে, ইতিহাসের অনিবার্য দাবি অনুসারেই, তখন থেকেই শুরু হতো ভারতের ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের অধ্যায়। ভারতে তখনই দেখা দিয়েছিল ধনতান্ত্রিক (বুর্জোয়া) অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির কোনো কিছু প্রাথমিক লক্ষণ এবং সে দেশকে তখনই বিশ্বধনতান্ত্রিক বাজারের আওতার মধ্যে এনে ফেলা হয়েছিল। সুতরাং এখন তার পক্ষে সেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমাত্র ধনতন্ত্রের পথেই হতে পারত। ভারতের পক্ষে তখন অন্য কোনো পথ ছিল না, থাকতে পারতও না।"[২০]

আমাদের পণ্ডিতেরা আর একটা কারণে মহাবিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে অস্বীকার করেছেন। ড মজুমদার বহু পরিশ্রম করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেল যে, বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, ঝান্সির রানী ও কুমার সিং, এই চারজনের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করার জন্যেই মহা বিদ্রোহ ঘটেছিল ও তাঁদের ষড়যন্ত্রে জনসাধারণ জড়িত হয়ে পড়েছিল।[২১] ড. মজুমদারের কথায়: "অনেকে এই যুক্তি দেন যে, যদিও তাঁরা প্রধানত নিজেদের স্বার্থের দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন, তবুও হয়তো তাঁরা কিছুটা দেশপ্রেমের দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হলেও হতে পারেন, কিন্তু তার সমর্থনে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না।"[২২] লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে: "ভারতের কিংবা ঝান্সীর রানীর নাম সংযুক্ত করার মতো ভুল আর কিছু হতে পারে না"[২৩]

ড মজুমদারের যুক্তি অনুসরণ করলে আরো বলতে হয় যে পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, আমানুল্লা, হাইলে সেলাসি, প্রিন্স সিহানুক প্রমুখ সকলেই নিজের সিংহাসন ও ক্ষমতার জন্যেই শুধু লড়েছিলেন, এঁদের কারোরই দেশপ্রেম ছিল না! বিচার করতে হবে এঁরা কার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন; আপোষহীন ভাবে এঁরা প্রায় সকলেই বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, দেশের জনসাধারণ বা কৃষকদের বিরুদ্ধে নয়। বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, অযোধ্যার নবাব, ঝান্সির রানী রাজ্য হারিয়েছিলেন নিজের দেশের কোনো গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট নয়, জনসাধারণের কোনো বৈপ্লবিক শক্তির নিকট নয়, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীর নিকট। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে তাঁদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করাটাই হচ্ছে তাঁদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। আপশোষের বিষয় হচ্ছে এই বাহাদুর শাহ, অযোধ্যার বেগম নানাসাহেব ঝান্সির রানী এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি। ভারতের প্রগতির পথে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে তাঁরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন নি। বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করার ঘটনাটাকে মার্কস এঙ্গেলস কিন্তু সামন্ততন্ত্রের পুনঃ

প্রতিষ্ঠার 'শেষ প্রচেষ্টা' বলে দেখেন নি। এই ঘটনার বৈপ্লবিক তাৎপর্য বিদ্রোহের প্রথম দিকেই মার্কস বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রথম চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন (৩০ জুন, ১৮৫৭): "এই প্রথম সিপাহি বাহিনী হত্যা করল তাঁদের ইয়োরোপীয় অফিসারদের, মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে; হিন্দুদের মধ্যে থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে, দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।' বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এবং পরিশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ প্রাধান্যের বড় বড় এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে, বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারস্য ও চীন যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।"

যে ড. মজুমদার মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ ও জাতীয় সংগ্রাম বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন, বিদ্রোহী জনসাধারণ ও সিপাহিদের দস্যু, গুণ্ডা, বদমায়েস, স্বার্থান্বেষী, মধ্যযুগীয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন এত বড় একটা বিরাট জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে পিণ্ডারি যুদ্ধের সমপর্যায়ে বসিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের ও তাদের নেতাদের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না, ইত্যাদি, সেই ড. মজুমদারই এই মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই অভ্যুত্থান ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার অর্ধশতাব্দী পরে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাকে "অনুপ্রাণিত করেছিল, তার নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল ও তার যোদ্ধাদের মনে সাহস জুগিয়েছিল মূল্যকে অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নয়।"[২৪] প্রশ্ন হচ্ছে যদি শুধু কতকগুলি গুণ্ডা বদমায়েস, দস্যু ও স্বার্থান্বেসীদেরই একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো, যদি তার কোনো মহান আদর্শ না থাকত, যদি তা প্রকৃতই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম না হতো, তাহলে পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনকে তা অনুপ্রাণিত করলো কি করে?

প্রশ্ন হচ্ছে, মহাবিদ্রোহ এতবড় একটা চিরস্থায়ী বৈপ্লবিক ঐতিহ্য রেখে গেল কি করে, পিণ্ডারি যুদ্ধ তা পারলো না কেন? ভবিষ্যতের প্রগতিশীল সম্ভাবনাগুলি যদি এই মহাবিদ্রোহের মধ্যে অন্তর্নিহিত না থাকত, তাহলে কি এটা সম্ভব হতো? সত্য কথা হলো যে, মহাবিদ্রোহের কতকগুলি শাশ্বত, গুণগত বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৫৭ সনে ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার আকাংক্ষা, আত্মসম্মানবোধ, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার সংকল্প এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধ জেগে উঠেছিল বলেই যে স্ফুলিঙ্গ জলে উঠেছিল ভারতের এক কোণে সিপাহিদের মধ্যে একটা ধর্মের প্রশ্নকে উপলক্ষ করে, কয়েকদিনের মধ্যেই সেই স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হয়েছিল, তার সর্বগ্রাসী লেলিহান

বহ্নিশিখা বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সমস্ত আঞ্চলিক, জাতিধর্মের সাম্প্রদায়িক বাধা অতিক্রম করে একটা সর্বভারতীয় জাতীয় বৈপ্লবিক চরিত্র ধারণ করেছিল। ১৮৫৭ সনের পূর্বে বা পরে ভারতের ইতিহাসে এই রকম বৈপ্লবিক ঐতিহ্যপূর্ণ ঘটনা আর কোনো দিন ঘটেছিল কি ?

নির্দেশিকা

১. "On the whole, it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first National War of Independence of 1857 was neither first. nor National, nor a War of Independence." (*British Paramountcy* ···, p. 625)

২ *Sepoy Mutiny*···p. 238

৩. "All India at all times is looking out for our downfall. The people everywhere would rejoycc, or fancy they would rejoice, as our destraction. And members are not wanting who would promote it by all means in their power." (Lord Metcalf. Governor-General 1835-36, quoted by J. L. Morrison, *Lawrence of Lucknow*, p. 55)

৪ "Whatever the oppression of their own princes may have been, they have never driven their subjects to revolt ; while they have looked on us as for our own ends and interests, their feelings ever embittered by a conscious sense of living under the humiliation of foreign dominion." (Gardiner : *Military Analysis*···, p. 40)

৫ "[Disraeli believed] that the mutineers of the Bengal Army were not so much the avengers of professional grievances as the exponents of general discontent." (G.E. Buckle, *The Life of Benjamin Disraeli*, vol. IV, p. 88)

৬. "There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him

by the very existence of the British role in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule." (*Hindu Patriot*, 21 May, 1857)

৭. Metcalfe : *Two Native Narratives*, p. 31

৮. "If is beyond doubt that politieal reasons helped a mere Mutiny of soldiers to sptead among large classes of the people in the Northern and Central India and converted it into a political insurrection" (*India in the Victorian Age*, p. 223)

৯. Ball vol. I, p. 68, p. 644

১০. *British Paramountcy* ·· pp. 618-19

১১. " [1857 was] not the first phase of the war of independence, but the last phase of India under Free Lances that existed since the fall of the Mughal power. The miseries and bloodshed of 1857 58 were not the birth pang of a freedom movement in India but the dying groans of an obsolete aristocracy and centrifugal feudalism of the mediaeval age" (*Sepoy Mutiny*, p. 241)

১২. Sen, *Eighteen Fifty-Seven*, p. 411

১৩. *British Paramountcy*···, p. 622

১৪. *Ibid*....p. 623

১৫. A general revolt or a war of independence necessarily implies or presupposes a definite plan or organisation... Further, such an organisation implies a pre-concerted conspiracy or plot to drive out the British." (*British Paramountcy*...p. 605

১৬. Malleson, p. 33, কর্নেল স্মাইদ, যাঁর হুকুমের প্রতিবাদে মিরাটে সিপাহিরা বিদ্রোহ করলো, গর্ব করে বলেছিলেন যে, ১০ মে তারিখে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রাক্রফ্‌ট উইলসন তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন :" আমি জোর করে বলতে পারি যে সমগ্র বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহ শুরু করবার দিন স্থির করা হয়েছিল ৩১ মে ১৮৫৭ রবিবার, এবং প্রত্যেক রেজিমেন্টে বিদ্রোহ চালনা করার জন্য ৩ জন নিয়ে এক একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সাধারণ সিপাহিরা এই পরিকল্পনার কথা কিছুই জানত না।" (Kaye,

vol. II, p. 110) আবার, অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, সিপাহিরা ২২ জুন—পলাশি যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন—বিদ্রোহ শুরু করবে ঠিক করেছিল।

১৭. "By those who substantially reject native evidence, all these may be regarded as nothing but as unsubstantially surmise. But there is nothing in my mind more substantiated that the complicity of Nana Sahib in widespread intrigues before the outbreak of the Mutiny." (Kaye, vol. I, p. 579)

১৮. Probyn's Report in *Narrative of Events*, vol. I, p. 136

১৯. "The wars of liberation, if they had not been crushed by superior military power, might easily have generatad new ideas and new strength. To beat British power and to prevent reconquest new energy, western military technique, effective organisation general co-operation would have become imperative. To assert that new progress would have necessarily emerged may very well be dogmatic. To deny that possibility is even more so." (Amit Sen, "Views on 1857" in *New Age*, 1957 August)

২০ পি. শাসত্যি কো : ১৮৫৭-এর গণ অভ্যুত্থান, একটি সোভিয়েত মূল্যায়ন, 'মূল্যায়ন', ১৩৭২ পৌষ।

২১. এর জবাবে ড. চৌধুরী বলেছেন :"···it has been shown that the civil rebellion of the period originated from the rancour and interest of the four disgrantled persons. The assumption that these leaders alone counted and that the content of the revolt depended upon their aims and interests involves a total denial of the essence of history ; that the general mass of the people have also their reactions to, and grievances against, a particular system of role to ventilate, apart from obeying the orders of their superiors." (*Civil Rebellion ...*, p. 289)

২২. *Sepoy Mutiny*, p. 225

২৩. *Ibid*, p. 241

২৪. "it [1857] insprired the genuine national movement for

the freedom of India from British yoke which started half a century later. The memory of 1857-58 sustained the later movement, infused courage into the heart of its fighters, furnished a historical basis for the grim struggle, and gave it a moral stimulus, the value of which it is impossible to exaggerate. The memory of the Revolt of 1857 distorted but hallowed with sanctity perhaps did more damage to the cause of the British rule in India than the Revolt itself." (*Sepoy Mutiny*···, p. 270)

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন : "সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশে ও সমাজে এক মহোপকার সাধিত হইল ; এক নবশক্তির সূচনা হইল ; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ২১৮) "সিপাহী বিদ্রোহের আগুন শীঘ্র নিভিয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে তার একটা নূতন সার রাখিয়া গেল। এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সময় হইতে শুরু।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২য় সং, পৃ. ২৭০)

৯

মহাবিদ্রোহ কি জাতীয় বিদ্রোহ?

শুধু ড. মজুমদারই নন, আরো অনেকে বলেছেন ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না। তাঁদের মতে 'প্রকৃত অর্থে' (in the true sense) ভারতে জাতীয়তাবাদ বা স্বদেশপ্রেম '৫৭ সনে ছিল না। ড. মজুমদারের মতে পশ্চিমের প্রভাবে 'তীব্র' জাতীয়তাবাদ (intense nationalism) ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল ষষ্ঠ দশকে।[১]

জাতীয়তাবাদের কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ এই 'তীব্র' বিশেষণটি কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে 'অতীব্র' জাতীয়তাবাদ বলে একটি বস্তু আছে? এই 'অতীব্র' জাতীয়তাবাদও কি ষষ্ঠ দশকের পূর্বে ভারতে ছিল না? 'তীব্র' না হলে কি জাতীয়তাবাদকে জাতীয়তাবাদ বলে স্বীকার করা যায় না?

ড. মজুমদার আরো বলেছেন যে 'খাঁটি' জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে, ১৮৫৭ সনের পর ষষ্ঠ দশকে এবং এই জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র রাজনৈতিক মর্যাদা (Political status) বাড়াবার জন্যেই নয়, এর লক্ষ্য ছিল আরো উচ্চতর—তা হলো জাতীয়তাবাদের 'খাঁটি দর্শনের' (true conception) ভিত্তিতে ভারতীয়দের পুনর্জন্ম।[২] এই 'তীব্র' 'উচ্চতর' আন্দোলন শুরু করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর নব-ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তারপর বিবেকানন্দ বেদান্ত ও গীতার ভিত্তিতে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৩] সর্বশেষে বাংলাদেশে ১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হলো ভারতের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার আন্দোলন।[৪]

অধ্যাপক সেনও এই মতই প্রকাশ করেছেন। তিনিও বলেছেন ১৮৫৭ সনে ভারতে জাতীয়তাবোধ ছিল না।[৫]

১৮৫৭ সনের যুদ্ধ যে জাতীয় যুদ্ধ ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্যে যেসব 'যুক্তি' ড. মজুমদার দিয়েছেন, সেগুলি যুক্তিবশে তুলে ধরতে বোধ হয় তাঁর ছাত্ররাও লজ্জা বোধ করবে। তাঁর 'যুক্তি'গুলি হলো: ক. সৈয়দ আহম্মদ খান বিদ্রোহের সময় ইংরেজদেরই প্রবল সমর্থক ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি 'তর্কাতীতভাবে' সমগ্র মুসলমানদের' (?) নেতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন; খ. বহু প্রকাশ্য

সভায় অনেক ভারতীয় বিদ্রোহকে নিন্দা করেছিলেন, যেমন কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (এই সংগঠনটি যে ইংরেজ ভক্ত বাঙালি জমিদারদের ছিল তা কিন্তু ড. মজুমদার উল্লেখ করেন নি ; গ. দিল্লি ও লখনৌতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর অনেক ভারতীয় ইংরেজদের অভিনন্দন জানিয়েছিল ; ঘ. দিল্লির পতনের পর আগ্রা শহর আলোকিত করে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছিল ; ঙ ঝান্সিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সিন্ধিয়া ২১ বার কামান ছুঁড়েছিলেন। এইসব 'কারণগুলি' উল্লেখ করে ড. মজুমদার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "এইসব বিবেচনা করে, এমনকি অযোধ্যার ও পশ্চিম বিহারের বিদ্রোহকেও প্রকৃত অর্থে (in the true sense of the term) গণবিদ্রোহ বা জাতীয় বিদ্রোহ বলা কঠিন।"[৬]

মহাবিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহ ছিলনা, তা প্রমাণ করার জন্যে তিনি একটা সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সকলেই যখন এতে যোগ দেয়নি, তখন এটা জাতীয় হলো কি করে ? "ভারতের ঐতিহাসিক রাজ পরিবারগুলির (historic ruling houses) মধ্যে কেউই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, বরং তারা সকলে সক্রিয়ভাবে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন, কেবলমাত্র কয়েকজন ছোট ছোট রাজা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সংখ্যা যাঁরা যোগ দেননি, তাঁদের তুলনায় শতকরা একভাগও হবে না।"[৭] আর একস্থানে ড. মজুমদার বলেছেন যে, এই বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি সামন্ততন্ত্রের মূল ও প্রধান শক্তিগুলি বিদ্রোহের বিপক্ষেই যায়, তাহলে সে বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক হয় কি করে ? ড. মজুমদারের বইতে এরূপ অসংখ্য পরস্পরবিরোধী উক্তি রয়েছে।

ড. মজুমদারের আর একটা যুক্তি হলো যে, এই বিদ্রোহটা ছিল একটা 'সংকীর্ণ স্থানে' (narrow zone) সীমাবদ্ধ ও ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় তার সামান্য অংশই তাতে যোগ দিয়েছিল, ভারতের অনেক অংশ ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল এবং যে অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেছিল, যেমন অযোধ্যায়, সেখানেও বহুলোক বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল। সুতরাং 'সঠিক অর্থে' এটা জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না।

ড. মজুমদারের এই যুক্তি দিয়েই যদি প্রশ্নটাকে বিচার করা যায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, বিদ্রোহী অঞ্চলটা কি এতই ক্ষুদ্র ছিল ও বিদ্রোহীদের সংখ্যা কি এতই নগণ্য ছিল ? ভারতের যে অংশটা বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, তার আয়তন ছিল, খুব কম করে ১ লক্ষ বর্গমাইলের উপর, অর্থাৎ একটা গোটা ফ্রান্সের মতো অংশ এবং তার জনসংখ্যা ছিল সাড়ে-তিন কোটি। লক্ষ-লক্ষ ভারতীয় এখানে লড়াই করেছিল এবং দেড় থেকে দুই লক্ষ লোক এতে প্রাণ দিয়েছিল।[৮]

প্রকৃতপক্ষে, মহাবিদ্রোহ এত অসংখ্য লোকের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিল বলেই এবং এত বড় একটা অংশে বিস্তার লাভ করেছিল বলেই এবং এইভাবে এটা জাতীয় ও গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল বলেই, এই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। সমগ্র বোম্বে আর্মি, মাদ্রাজ আর্মি, পাঞ্জাব আর্মি দিয়েও কুলোয় নি, ইংল্যাণ্ড থেকে তার সৈন্য ও নৌবাহিনীর অর্ধেক নিয়ে আসতে হয়েছিল।

ভারত বেলজিয়াম নয়, একটা উপমহাদেশ। এই রকম একটা বিশাল দেশে, এমনকি একটা ছোট দেশেও তার সব অংশই নানা কারণে সমভাবে বিকাশ লাভ করে না। কোনো অংশ অগ্রসর হয়ে যায়, কোনো অংশ পিছিয়ে থাকে। তাই জগতে এমন কোনো দেশ দেখা যায় না—সে দেশ ছোটই হোক আর বড়ই হোক—যেখানে সে দেশের সমস্ত অংশ সমভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। ভারতের অনেক অংশ বা অনেক লোক যে বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, তা অস্বাভাবিকও নয় অসাধারণও নয়।

ড. মজুমদারের এই 'সঠিক অর্থে' '৫৭ সনের বিদ্রোহ যদি জাতীয় বিদ্রোহ না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর এই 'সঠিক অর্থ' অনুসারেই ইংল্যাণ্ডের ১৬৫৮ সনের বিপ্লব, ১৭৭৫-৮৩ সনের আমেরিকান বিপ্লব, ১৭৮৯ সনের ফরাসি বিপ্লব, ১৮৪৮ সনের ইয়োরোপের বিপ্লব, ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব এবং সর্বশেষে চীন বিপ্লব—এগুলির কোনোটাকেই জাতীয় বিপ্লব বলা যায় না—কারণ এই বিপ্লবগুলির কোনোটাতেই সব শ্রেণীর শতকরা একশো জন লোকই তাতে যোগ দেয়নি। আমেরিকান বিপ্লবের সময় বহু আমেরিকান ইংরেজের পক্ষে এবং আমেরিকান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তাছাড়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সব অংশই এই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, আর একটা ছোট অংশই তাতে যোগ দিয়েছিল। ফরাসি ও রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়—প্রচুর ফরাসি ও রুশ বিদেশি আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমি ওদেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে লড়েছিল। চীন বিপ্লবেও তাই হয়।

প্রত্যেক বিদ্রোহ-বিপ্লবের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থ এবং সেই অনুযায়ী কোনো শ্রেণী তা সমর্থন করে, আবার কোনো শ্রেণী তার বিরুদ্ধে যায়, বহু লোক নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। ইতিহাসের এই প্রাথমিক সত্যটাকে উপেক্ষা করার জন্যেই আমাদের ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতদের এই বিভ্রাট ঘটেছে।

আমাদের ইতিহাসবিদদের এই 'সঠিক অর্থ' মেনে নিলে আরো বলতে হয় যে বাংলার ও ভারতের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক আন্দোলনও জাতীয় আন্দোলন ছিল না। কারণ এই আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, কয়েকজন মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ,

বিরাট জনসাধারণ ও শ্রমিক-কৃষকরা তাতে কোনো অংশই গ্রহণ করেনি; পক্ষান্তরে বিপ্লবীদের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক ভারতীয় পুলিশ, গোয়েন্দা, রায়বাহাদুর খানবাহাদুররা ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল। এইসব বিপ্লবীরা দলে ভারি ছিলেন কিনা, অথবা মুষ্টিমেয় ছিলেন, তা দিয়ে তাঁদের বিচার করা চলে না। দেখতে হবে, তাঁরা সমগ্র জাতির স্বার্থে বা অধিকাংশের স্বার্থে বা ভারতের জন্যে লড়েছিলেন কিনা? তা যদি হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁদের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনই হয়েছিল, তাঁদের সংখ্যা যত মুষ্টিমেয় হোক না কেন?[৯]

পণ্ডিতদের 'সঠিক অর্থে' ১৯১৯ সনের কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনকেও 'জাতীয়' বলা যায় না কারণ তা মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই প্রকাশ পেয়েছিল—ভারতের অনেক বড় বড় অঞ্চলে তা বিশেষ বিস্তারলাভ করেনি; রাজা, মহারাজা, জমিদাররা তার বিরুদ্ধে; ভারতের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮০, হাজার লোক কারাবরণ করেছিল এবং তার চাইতে বেশি সংখ্যক লোক ইংরেজের পক্ষেই ছিল।[১০]

ফিচেটের মতো প্রায় সকল ইংরেজ লেখক স্বীকার করেছেন, "এটা মনে রাখতে হবে যে, সক্রিয় বিদ্রোহী জেলাগুলির আয়তন ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া—এই সব দেশগুলির সমান এবং লোকসংখ্যায় এদের চাইতে বেশী।" এডোয়ার্ড টমসনের কথায়: "এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ পূর্বে আর কোনো বিদেশি বিজেতার বিরুদ্ধে হয়নি।" তাছাড়া একথাটাও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের এই বিরাট কেন্দ্র ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পেশোয়ার পর্যন্ত এবং সিমলা থেকে হায়দ্রাবাদ ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ১৮৫৭-৫৮ সনে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ তো ঘটেছিলই সমগ্র ভারতের জনসাধারণেরও অধিকাংশের বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীর, সহানুভূতি বিদ্রোহীদের দিকেই ছিল, তা পূর্বেই অনেক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে এ বইতে দেখানো হয়েছে।

এমনকি মাদ্রাজ, যেখানে বিদ্রোহের ঢেউ গিয়ে পৌঁছতে পারেনি সেই মাদ্রাজও যে অক্ষত ছিল, তা একেবারেই বলা যায় না। কলকাতায় রওনা হওয়ার কালে মাদ্রাজ ৮ম অশ্বারোহী বাহিনী বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজের পথে কতকগুলি দাবি-দাওয়া নিয়ে বিদ্রোহ করে। তাদের দাবি মিটিয়ে দিলে তারা আবার চলতে থাকে, কিন্তু কয়েক মাইল যাওয়ার পরই তারা ঘোষণা করে: "তারা তাদের দেশবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে না।"[১১] এইরকম ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৮৫৭ সনে মাদ্রাজীরা যে ইংরেজ ভক্ত ছিল, তা মেনে নেবার কোনো কারণই নেই। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সব প্রদেশের ভারতীয়দের মধ্যেই ছিল।

অধ্যাপক সেন বলেছেন: "অযোধ্যা ও সাহাবাদের বাইরে বিদ্রোহের প্রতি

সাধারণ সমর্থনের এমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না যার দ্বারা আমরা এই সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় যুদ্ধের মর্যাদা দিতে পারি।"[১২] মহাবিদ্রোহের জাতীয় চরিত্রকে অস্বীকার করেই অ. সেন পরের লাইনেই বলেছেন (পূর্বের অধ্যায়ে উদ্ধৃত), যে-মুহূর্তে মিরাটের সিপাহিরা বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলো ও দিল্লির জনসাধারণ ও অভিজাতরা তাদের সঙ্গে যোগ দিল, সেই মুহূর্ত থেকে 'এটা স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হল।' তাহলে কি বুঝতে হবে যে 'স্বাধীনতার' যুদ্ধটা 'জাতীয়' যুদ্ধ নয় ?

অযোধ্যার ব্যাপারেও অধ্যাপক সেন খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যাতে করে একুল-ওকুল দুকুলই রাখা যায়। তিনি বলেছেন : "অবশ্য অযোধ্যায় বিদ্রোহ জাতীয় আকার ধারণ করেছিল, যদিও এই কথাটা একটা সীমিত অর্থে ব্যবহার করতে হবে, কারণ তখনও ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা ভ্রূণাবস্থাতেই ছিল।"[১৩] অ. সেনের মতে, অযোধ্যার জনসাধারণ তাদের রাজা ও তাদের দেশের জন্যেই লড়েছিল ; তবে এটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজভক্তি (feudal loyalty), যা এক সময়ে স্বদেশপ্রেম বলেই গণ্য হতো। অর্থাৎ অযোধ্যার জনসাধারণও সমগ্র ভারতের জন্যে লড়েনি, তারা শুধু অযোধ্যার জন্যেই লড়েছিল,তারা নিশ্চয়ই দেশ-ভক্ত ছিল, কিন্তু সে দেশভক্তি ছিল আঞ্চলিক, সারা ভারতের দেশভক্তি নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতীয়দের মধ্যে কোনো ঐক্যবোধ ছিল না, সমগ্র ভারত সম্বন্ধে চিন্তা করতে তারা ছিল অক্ষম, ইত্যাদি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক এই কথাগুলিই আমাদের বারবার শুনিয়েছে।

কিন্তু আঞ্চলিক দেশপ্রেম ও সারা ভারতীয় দেশপ্রেম কি পরস্পর বিরোধী ? একটা অপরটার পরিপূরক হতে পারে না ? লক্ষ্মীবাঈ বলেছিলেন, 'মেরী ঝান্সী নেহী দেউঙ্গী'। তার অর্থ কি এই যে তিনি ঝান্সি ছাড়া আর কিছুই কেয়ার করতেন না। কিংবা সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না ? ঝান্সিকে রক্ষা করাই ছিল লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রধান দায়িত্ব, তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি সেই দায়িত্বই পালন করেছিলেন। ঝান্সি হারাবার পর তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিংহ, রাওসাহেব, বান্দার নবাব প্রমুখের সহযোগিতায় আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি ; গোয়লিয়ারে তাঁকে কেউ পরদেশি বলে মনে করেনি ; বরং সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে ভারতের একজন যোদ্ধা-নেতা রূপেই অভিনন্দিত করেছিল। সর্বভারতীয় চেতনা জনসাধারণের মধ্যে ও নেতাদের মধ্যে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। নানাসাহেব, কুমার সিং, তাঁতিয়া তোপী, ফয়জাবাদের মৌলভি, ফিরোজ শাহ, খানবাহাদুর খান, হজরত বেগম, ঝান্সির রানী, রাওসাহেব, বেনীমাধো, প্রমুখ নিজেদের এলাকার বাইরে শত-শত মাইল দূরে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে লড়েছেন।[১৪] এঁরা কেউই কেবলমাত্র স্থানীয় নেতা ছিলেন না, লড়াই-এর

মধ্য দিয়ে সকলেই সর্বভারতীয় নেতা রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এইসব নেতারা ভালোভাবেই জানতেন যে, সারা ভারতকে স্বাধীন করতে পারলেই তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলগুলিও বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। বিদ্রোহী নেতারা সারা ভারতের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাধিকার সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। এটাই স্বাভাবিক কারণ ভারতবর্ষ একটি ছোট্ট দেশ নয়, বহু ভাষাভাষী বহুজাতি নিয়েই এই মহাদেশ। সিপাহি ও জনসাধারণের জাতীয় চেতনাও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সিপাহিরা যেখানেই বিদ্রোহ করুক না কেন—মিরাট, পেশোয়ার, ঝান্সি; কানপুর, বেরিলি, সর্বত্রই তাদের আওয়াজ ছিল: 'দিল্লি চলো, দিল্লি চলো।' দিল্লি ছিল বহুদিন ধরে স্বাধীন ভারতের রাজধানী, স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্র, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতীক, সারা ভারতের হিন্দু, মুসলমান জনসাধারণের সংহতির প্রতীক। সিপাহিরা বেশির ভাগই ছিল অযোধ্যার লোক। তারা অযোধ্যার স্বাধীনতার আওয়াজ তোলেনি। তারা যেখানেই বিদ্রোহ করুক না কেন, সবখানেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল দিল্লির বাদশাহর নামে এবং তারই পতাকা তুলে। ঝান্সিতে সিপাহিরা বিদ্রোহ করার পর আওয়াজ তুলেছিল—'অম্মল খুদাতাল্লাহকা, মুল্লুক বাহাদুর শাহকা, ঝান্সী লক্ষ্মীবাঈকা, ফিরিঙ্গীয়োঁকো-মার ডালো'।

যখন অযোধ্যার বেগম হজরত মহাল, ঝাঁন্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ, রোহিলা-খণ্ডের খানবাহাদুর খান এবং নানাসাহেব বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে অস্বীকার করে তাঁদের হৃত রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, তা তাঁরা করেছিলেন দিল্লির বাদশাহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেই। আঞ্চলিক স্বাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্রোহী নেতারা একটা ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড স্বাধীন ভারতের কথাই চিন্তা করেছিলেন। আমাদের ইতিহাসবিদদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বিদ্রোহী নেতারা 'আঞ্চলিক দেশপ্রেমিকই' হন অথবা সামন্ত-তান্ত্রিকই হন, তাঁরা অন্তত ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ও ভারতের জাতীয় সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা চিন্তা করেন নি। এই প্রসঙ্গে সর্দার পানিক্কার ঠিকই বলেছিলেন: ১৮৫৭ সনের নেতারা যদি নিজ নিজ অঞ্চলের স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করে থাকতেন, তাহলেও তাঁরা যে স্বাধীনতার জন্যেই লড়েছিলেন ও জাতীয় সংগ্রামই করেছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে 'জাতীয়', 'জাতীয়তাবাদ'—এইসব কথাগুলির কোনো একটা সঠিক অর্থ নেই। এটা হলো একটা ঝোঁক একটা প্রবণতা, একটা বিকাশমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য।

এই কথাগুলি অনেক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাই অনেক পণ্ডিত তাঁদের কুতর্কের (sophistry) দ্বারা তার অপপ্রয়োগ ও অপব্যাখ্যা করার সুযোগ পান এবং অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন।

'জাতি', 'জাতীয়' কথাগুলি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার কতকগুলি হচ্ছে, এইরূপ : ক. জাতিগত (ethnic) অর্থে—বাঙালি জাতি, সাঁওতাল জাতি, জার্মান জাতি, ইত্যাদি ; খ. ভাষা ও সাংস্কৃতিক অর্থে—রুশভাষা, ফরাসি সাহিত্য, জার্মান জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি ; গ ভৌগোলিক অর্থে—আমেরিকান জাতি, ভারতীয় জাতি, যদিও এইসব দেশগুলিতে বহুজাতির বাস ; ঘ. প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতার বিপরীত অর্থে ; ঙ. বিদেশি আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা দেশের মুক্তি আন্দোলনের অর্থে। এই শেষোক্ত অর্থেই মহাবিদ্রোহের প্রসঙ্গে জাতীয় সংগ্রাম কথাটি প্রযোজ্য—একদিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, আর একদিকে ভারতবাসীর, জাতি, ধর্ম, প্রদেশ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী।

অনেক সময় রাষ্ট্র, দেশ, জাতিকে এক করে দেখা হয় এবং তার ফলেও অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একটা রাষ্ট্র একটা মাত্র জাতি নিয়ে গঠিত হতে পারে যেমন ফরাসি রাষ্ট্র, জার্মান রাষ্ট্র, ইটালিয়ান রাষ্ট্র ইত্যাদি ; আবার অনেকগুলি জাতি নিয়েও একটা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে,—সোভিয়েত রাষ্ট্র রুশ, ইউক্রানীয়, উজবেক, তাজিক, তাতার ইত্যাদি জাতি নিয়ে গঠিত ; ভারত রাষ্ট্র ও মারাঠি বিহারি, বাঙালি, তামিল তেলেগু, নাগা, সাঁওতাল ইত্যাদি বহু জাতি নিয়ে গঠিত।

অনেক আবার রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটাকে রাষ্ট্রীর গঠন, শাসন, আর্দশের সঙ্গে (সামন্ততান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি) জড়িয়ে ফেলে নানারকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন—যা করেছেন ড. মজুমদার, অ সেন ও আরো অনেকে।[১৬]

মহাবিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ ছিল কিনা, তা বিচার করতে হলে দেখতে হবে এটা বিদেশি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হয়েছিল কিনা, বিদেশি শাসন ধ্বংস করে ভারতবাসীর শাসনব্যবস্থা স্থাপন করার জন্যে হয়েছিল কিনা ? এটাই হলো প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা কিনা—এই কষ্টিপাথর দিয়েই তাকে বিচার করতে হবে—এটাই হলো তার প্রধান মানদণ্ড।

জাতীয়তাবাদ একটা বিশ্লিষ্ট বা বিমূর্ত বস্তু নয়। জাতীয়তাবোধ বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের স্বৈরাচার ও অনৈক্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করার জন্যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে বর্তমান যুগে জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় চেতনা বিকাশ লাভ করতে থাকে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঐতিহাসিক বির্বতন অনুসারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবোধ বিকাশলাভ করে—পশ্চিম ইয়োরোপে এক রকম ভাবে, পূর্বইয়োরোপে অন্যভাবে, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে আর একরকম

ভাবে। জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করে—যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বাধীনতা, ধর্ম ; জমির প্রশ্ন ; বোহেমিয়াতে ভাষার প্রশ্ন ; অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় আইনসভা, সরকারি উচ্চ চাকুরি, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল পশ্চিম ইয়োরোপে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ সনের ফরাসি বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছিল ১৮৭১ সনে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র স্থাপনের মাধ্যমে। এই যুগেই স্থাপিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি। পাশ্চাত্যের এই জাতীয়তাবাদ রূপান্তরিত হলো উগ্র সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা-বাদে।

পূর্ব ইয়োরোপে (অস্ট্রিয়া, রাশিয়া) ধনতন্ত্রের বিকাশ অনেক বিলম্বে ঘটেছিল এবং সামন্তবাদও অনেককাল ধরে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তায় কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে এক একটি জাতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি রাষ্ট্র ; কিন্তু পূর্ব ইয়োরোপে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল বহু জাতি নিয়ে। পশ্চিম ইয়োরোপে জাতীয় নির্যাতন প্রায় অজ্ঞাত, কিন্তু পূর্ব ইয়োরোপে বহুজাতির রাষ্ট্রে একটি জাতি প্রাধান্য পায় এবং সে জাতি অন্যান্য জাতিগুলিকে শোষণ ও নির্যাতন করে। এই কারণে পূর্ব ইয়োরোপে জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভত হয়। পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে তখন থেকেই ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়।

ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করলো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সর্বশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ভারতে তখনো ধনতন্ত্র বিকাশলাভ করেনি, অথচ দুনিয়ার বাজারের সঙ্গে সে জড়িত হয়ে পড়েছে। '৫৭ সনের ভারতে সামন্ত-শ্রেণীর স্বাধীন ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যায়নি, তাই তার একটা অংশ মহাবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। (মহাবিদ্রোহের পর এই শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভরূপে এবং জাতীয় দাসত্ব ও শোষণে বিদেশির প্রধান সহায়করূপে জাতীয় শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।) ভারতের এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল সব শ্রেণীর মানুষের, বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমজীবীদের ব্যাপকভাবে তাতে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে।

এই ছিল সেদিনকার ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য-গুলি আমাদের অধ্যাপকদের দৃষ্টিগোচরে আসেনি, কারণ তাঁরা পাশ্চাত্য জাতীয় আন্দোলনকেই একমাত্র প্যাটার্ন বলে ধরে নিয়েছেন। ভারতের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের

মাপকাঠি দিয়ে মহাবিদ্রোহকে বিচার করতে গিয়ে তাঁরা উগ্র সাম্রাজ্যবাদীদের মতামতগুলি যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।[১৭] কোনো নতুন সত্য আবিষ্কার করেন নি।

বিদ্রোহের প্রাথমিক ও আশু কারণগুলি নির্ণয় করার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনারকে নিযুক্ত করেছিল। গার্ডিনার তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন—"ভারতের এই বিদ্রোহের দুটি চরিত্র দেখা যায়; প্রথমটির রূপ হলো জনসাধারণের একটা বিদ্রোহ। দ্বিতীয়টির রূপ হলো সিপাহিদের একটা সামরিক বিদ্রোহ।· এই দুটি বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটা সামাজিক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। সামরিক কারণের জন্যে এ বিদ্রোহ ঘটেনি; ভারত থেকে ইংরেজ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যই শক্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের প্ররোচনার ফলেই এ বিদ্রোহ ঘটেছে।" গার্ডিনার আরো বলেছেন: "ভারতের জনসাধারণের ইংরেজের প্রতি অন্তর্নিহিত ঘৃণা যে স্বভাবতই সিপাহিদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, তা পরিষ্কার হয়ে গেল বিদ্রোহের এরূপ আকস্মিক বিস্ফোরণ ও তার ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা পরায়ণ আক্রোশের দ্বারা।··সারা ভারতে নিপীড়িত পরাধীনতার সর্বব্যাপী একটা অনুভূতি জেগে ওঠার ফলে সাধারণভাবে সকলেই আমাদের উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এবং অন্ধ আক্রোশের বশবর্তী হয়ে প্রচণ্ডভাবে এই সম্মিলিত সামাজিক ও সামরিক বিদ্রোহ বজ্রাঘাতের মতো আমাদের উপর পতিত হলো।"[১৮]

লণ্ডনের ওয়াকিবহাল *Times* পত্রিকা বিদ্রোহের প্রথম দিকে বলেছিল, এ বিদ্রোহ একটা মিউটিনি মাত্র, কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাকে মত বদলাতে হলো—এবং লিখলো যদিও এই বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তা একটা জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হলো এবং বিদ্রোহীরা তাদের আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতা দূর করে একটা সামগ্রিক ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।[১৯]

যেসব ইংরেজরা বিশাল 'মিউটিনি সাহিত্য' রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উল্লেখ করেছেন ও আলোচনা করেছেন যে, সব শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল এবং এই অসন্তোষ ক্রমশ ঘৃণায় পরিণত হচ্ছিল।[২০] ড. মজুমদারও স্বীকার করেছেন, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের ঘৃণা ছিল প্রকৃত ও গভীর।[২১]

সেই সময়কার ভারতের জাতীয়তাবাদের আর একটা দিক সৈয়দ আহম্মদ খান বেশ জোরের সঙ্গেই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বে প্রশাসনিক ও আইনসভায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার না থাকাটাই ছিল মহাবিদ্রোহের মুখ্য কারণ; অন্য কারণগুলি ছিল গৌণ এবং ঐ প্রধান কারণ

থেকেই সেগুলি উদ্ভুত।[২২] এই উক্তিটি ড. মজুমদার তাঁর বইতে দু'বার উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটা যে তখনকার ভারতের একটা বাস্তব ঘটনা তাও বারবার বলেছেন। তাহলে ড মজুমদারকে আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, ভারতের এইরূপ বাস্তব অবস্থা কি ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের অভাবের পরিচয়? মোদ্দা কথা হচ্ছে, '৫৭ সনের বিদ্রোহীরা, ভারতীয় শাসনের তুলনায় ব্রিটিশ শাসন ভালো ছিল কি মন্দ ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতি তর্ক করেনি, তারা শুধু চেয়েছিল তাদের নিজেদের দেশ তারা নিজেরাই শাসন করবে।

ম্যালিসন লিখেছিলেন, অযোধ্যাবাসীরা ইংরেজ সরকারকে চায়নি, তারা চেয়েছিল নিজেদের সরকার – তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক।[২৩] হোম্‌স উল্টো করে ঠিক এই একই কথা বলেছেন – ভারতীয়রা ছিল বড়ই অকৃতজ্ঞ, ইংরেজের শাসন ভারতে যে কত সদিচ্ছাপূর্ণ তা তাদের বুঝবার ক্ষমতা ছিল না।[২৪]

এইসব বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য তথ্য প্রমাণ থেকে কি '৫৭ সনে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাবটাই প্রমাণ হয়, না তার অস্তিত্বটাই প্রমাণ হয়?

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন – এগুলিকে জাতীয় আন্দোলন বলতে ইতিহাসজ্ঞদের বাধে না, কিন্তু তাঁদেরই মধ্যে অনেকে মহাবিদ্রোহের মতো এত বড় একটা গণবিদ্রোহ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সব থেকে বড় বিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন নয়, স্বাধীনতার আন্দোলন নয় বলতে এত আগ্রহ কেন? ইতিহাস বিচারে কেন তাঁদের এই দু'মুখো নীতি (double standard)? ভারতের সমগ্র ইতিহাসে এই প্রথম দেশের জনসাধারণ বর্ণ, ধর্ম অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বন্দুক হাতে করে তাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন সার্বভৌম করার জন্যে লড়েছিল। ইংরেজি শিক্ষিতরা – যারা জনসাধারণকে 'ধর্মান্ধ', কুসংস্কারাচ্ছন্ন', 'ছোটলোক' বলে চিরকাল গণ্য করে এসেছে - তারা এ গণবিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়নি, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা বা সাহস বা দৃষ্টিভঙ্গি কিছুই তাদের ছিল না। যখন এই শিক্ষিতরা ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল, সেই সময়ে এইসব 'অশিক্ষিতরাই ইংরেজ শাসনকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে অস্ত্রধারণ করেছিল। মহাবিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে আপত্তির কারণ জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিতদের মজ্জাগত অনীহা, ঘৃণা ও অবিশ্বাস প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুশোভন সরকার ঠিকই বলেছেন: "আমাদের ঐতিহাসিকেরা ভারতের সাবেকি ঐক্যে বিশ্বাসী, রাজপুতদের বীরত্বে, আকবরের শাসননীতিতে, মারহাঠা অভ্যুত্থানের মধ্যে জাতীয়তাভাব আবিষ্কার করতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। অথচ যখন ভারতের অনেকখানি জুড়ে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহের তোলপাড়ের কথা আসে তখন তাঁরা হঠাৎ অন্য সুরে কথা বলেন, এ-ও কম

কম বিচিত্র নয়।...এখানে স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয়তাবোধকে সুগঠিত আধুনিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখবার অভ্যাসটাই বাধার কারণ মনে হয়।"২৫

নির্দেশিকা

১. " [Western influence] manifested itself in the growth of an influence of nationalism during the third quarter of the nineteenth century (*British Paramountcy...*, p. 465)

২. "It is in Bengal, which was least affected by the incidents of 1857-58, that we find the distinct growth of a truly nationalist movement during the sixties, i.e. almost immediately after the suppression of the outbreak of 1857-58. It was not directed towards the advancement of political status or the achievement or administrative reforms, but it had a higher aim, namely, regeneration of Indians, the basis of a true conception of nationalism." (*Ibid*, p. 495)

৩. "Swami Vivekananda gave a spiritual basis to Indian nationalism, the lessons of Vedanta and the Bhagabad Gita permitted the lives and actiyties of many a nationalist." (*Ibid*, p. 495)

৪. "1905 marks the beginning of the national struggle." (*Ibid*, xxi). " ..the grim struggle for independence... began with the partition of Bengal in 1905 and continued till the achievement of independence in 1947." (*Ibid*, xxxiii)

৫. "In Oudh, however, the revolt assumed a national dimension though the term must be sued in a limited sense, for the conception of Indian nationality was yet in

embrio." (*Eighteen Fifty-seven*, p. 411)

৬. *British Paramountcy...*, p. 226

৭. *Sepoy Mutiny...*, p. 225

৮. "দুই বৎসরে (১৮৫৭-৫৮) অস্ত্রাঘাত, দুঃখ-কষ্ট, পরিশ্রম ও বিচারালয়ের প্রাণদণ্ড ইত্যাদির ফলে লক্ষাধিক সিপাহী প্রাণ হারিয়েছিল। এই দুই বৎসরে অন্য যে সকল বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল, তাদের সংখ্যা গণনা করলে নিঃসন্দেহে নিহতদের সংখ্যা অনেক বেশী।" (Trotter, *India Under Queen Victoria*, vol. II, p. 189). হোমস এর মতে : The number of armed men, who succumbed in Oudh, was about 150,000 of whom at least 35,000 were sepoys." (p. 523)

৯. অধ্যাপক সেন নিজেই বলেছিলেন ; "In estimating the popularity of the movement of 1857, we must not forget that only a determined minority takes an active part in a revolt or revolution while the overwhelming majority remains passive, and an interested section might openly align itself with the existing order. Nowhere did a revolt command universal support." (p. 411)

১০. ড. মজুমদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই কিনা জানি না, একজন বেনামী লেখক একটি ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্তমান বিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহ নয়, তা 'প্রমাণ' করবার চেষ্টা করেছেন। "আলজেরিয়ার তথাকথিত জাতীয় আন্দোলন হচ্ছে অধিকসংখ্যক মুসলমানদের আনুগত্য জোর করে আদায় করবার জন্য কতকগুলি হত্যাকারী গুণ্ডাদলের আন্দোলন।" – ('একটি জাতির বিবেক' দ্র. *Eastern Economist*, 5 April 1957)

১১. Montgomery Martin, *Indian Empire*, vol. 3, p. 72

১২. *Eighteen Fifty-Seven*, p. 411 ; কিন্তু কয়েক লাইন পরে আবার অঃ সেন উল্টো কথা বলেছেন : "Even in the undisturbed provinces, like Bengal and Madras there was a feeling ot impotent disatraction that delighted in every news of British reverse." (p. 411)

১৩. *Ibid*, p. 411

১৪. "There are many instances to show that leaders of the rebellion looked beyond their own immediate circle, and showed a combination of wide vision and patriotic

solidarity. Though, they were mostly engaged in local rebellion, they frequently united their forces against the English is many sectors of the war to deliver the country as a whole, and not simply parts of it, from the yoke of the British rule. This combination is all the more remarkable as it cuts across all berriers of caste and creed, of regions and provinces and united the Hindus and Mahommedans" (S. B. Chaudhury *Civil Resistance During the Mutiny*, pp 280-81)

১৫. "That the independence the leaders of 1857 visualised was a return to the old conditions of divisions and anarchy does not alter the fact that it was a movement for independence and in that sense was a nationalist struggle." (Panikkar *On 1857*)

১৬. অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে তার [জাতীয়তাবাদের] কতটুকু ছিল ? এক সর্বভারতীয় মনোভাব, এমনকি বৃটিশ বিরোধী মনোভাব কি বৃটিশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের ফল ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতির ফল নয়, ১৮৫৭ সালের আগে তার কতটুকু সম্পন্ন হয়েছিল ?" ('সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে', অনুষ্ক, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)। পৃথিবীতে এমনও অনেক দেশ আছে যেখানে ধনতন্ত্র সামান্যই প্রবেশ রেছে, মূলত প্রাক্-ধনতন্ত্রের যুগে তারা বাস করে। তাদের কি জাতীয় স্বাধীনতার অধিকার নেই ?

১৭. একজন ঝানু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ছদ্মনামে তার *Lost Dominion* বইতে লিখেছিল – "All that is necessary is to remark that the Mutiny was in no sense a national revolt except in Oudh." (p. 47) এর সঙ্গে অঃ সেনের কি চমৎকার মিল ! সাম্রাজ্যবাদীদের এই কথাগুলি প্রচার করার উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, সাধারণত ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয়রা সুখেই ছিল, কিছু কুচক্রী দু-একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছিল মাত্র।

১৮. General Sir Robert Gardiner. *Military Analysis of the Indian Rebellion*, *1858*. pp. 16-17, ড. মজুমদার এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটির কথা কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি, ব্যবহার করা তো দূরের কথা। অঃ সেন তাঁর গ্রন্থপঞ্জিতে তার উল্লেখ করেছেন মাত্র, কিন্তু তা দেখেন নি।

১৯. "We have seen that the tide of war rolling from Nepal to the borders of Gujarat, from the deserts of Rajputana to the frontiers of Nizam's territories, the same men over running the whole land of India and giving to their resistance, as it were, a national character." (*Times*, 20 May, 1858)

২০. ভারতীয়দের মনে এই ঘৃণা যে কত তীব্র হয়ে উঠেছিল, তা প্রকাশ পেয়েছিল একজন বিদ্রোহীর মুখে। কামানের মুখে তাকে উড়িয়ে দেবার পূর্বে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তোমরা ইংরেজ শিশুগুলিকে কেন হত্যা করেছ, তখন সে জবাব দিয়েছিল "শুধু সাপটাকেই নয়, সাপের বাচ্চাগুলিকেও মারতে হয়।"

২১. "That it (discontent) was genuine and profound is proved by a deep-seated hatred against British among nearly all classes of people." (*Sepoy Mutiny...*, p. 260) এই সাধারণ বিক্ষোভ ও ঘৃণা কি জাতীয় চেতনার লক্ষণ নয় ?

২২. *Causes*···, p. 10

২৩. Malleson, *History of Indian Mutiny*, vol. 1, p. 344

২৪. Holmes, p. 611

২৫. পরিচয়, ১৩৬৪ শ্রাবণ

১০

মহাবিদ্রোহ কি সামন্ততান্ত্রিক ছিল ?
বিদ্রোহীরা জিতলে ভারত কি মধ্যযুগে ফিরে যেত ?
১৮৫৭ সনের ভারতের প্রধান শত্রু কে ছিল ?

মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল মোটামুটি ভাবে সামন্তশ্রেণীর হাতেই। এই ঘটনাটা ভারতের বুদ্ধিজীবী ও বিশেষ করে প্রগতিশীলদের মধ্যে যে কত বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এই কারণে ড. মজুমদার, সেন প্রমুখ পণ্ডিতরা এই বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বরবাদ করে দিয়েছেন।[১] রায়, দত্ত ও তাঁদের অনুগামীরা শুধু এতেই সন্তুষ্ট না থেকে এই বিদ্রোহকে বললেন, এটা ছিল প্রতিবিপ্লবী। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এতই প্রগতিশীল যে 'ফিউডাল' কথাটা শোনা মাত্রই তাঁদের নাসিকা কুঞ্চন শুরু হয়ে যায়, যদিও তাঁদের অনেকেরই হিন্দু পুনরুত্থানবাদে উৎসাহের অভাব নেই এবং তাঁদের ধ্যান-ধারনায় ও সামাজিক আচরণে সামন্ততান্ত্রিকতা বর্জনের খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। তাঁরা তৎকালীন বাস্তবে অবস্থাটাকে উপেক্ষা করেন বলেই এবং তাকে ধার করা রঙিন চশমা দিয়ে দেখেন বলেই তাঁদের এই বিভ্রান্তি। আরো লক্ষণীয় যে, এইসব বুদ্ধিজীবীরা এই বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক বলে নিন্দা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেই বেমালুম একাত্ম হয়ে যান।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে একটা ঔপনিবেশিক দেশের বিদ্রোহে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্ব ও তার নেতৃত্ব পূর্ব-শর্তরূপে থাকা একান্ত আবশ্যক কিনা এবং তা যদি না থাকে ও বিদ্রোহ যদি সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়, তাকে প্রগতিশীল বলে গণ্য করা যেতে পারে কিনা ? অথবা প্রগতিশীলদের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে কিনা ?

কোনো সন্দেহ নেই যে, মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, বেগম হজরত মহল, রাণী লক্ষীবাঈ, কুমার সিং ফিরোজ শাহ, এবং স্থানীয় রাজা, জমিদার ও তালুকদাররা এবং এরা ছিলেন সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি।[২] কিন্তু ১৮৫৭ সনের ভারতের পরিস্থিতিতে এটাই তো ছিল স্বাভাবিক, কারণ তখনো সেখানে বর্তমান যুগের প্রধান শক্তিরূপে বুর্জোয়া শ্রেণী

বা শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়নি। তখনো ভারতের সামন্তশ্রেণীই ছিল সমাজের 'স্বাভাবিক নেতা'—এমনকি যে বাংলাদেশ ছিল ভারতে তখন সব থেকে বেশি 'অগ্রসর' সেখানেও সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন জমিদাররা, আর তাঁদেরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বুদ্ধিজীবীরা।

কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, '৫৭ সনের ভারত মুঘল-পেশোয়া ভারতও ছিল না। ভারত তখন একটা যুগ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তার বহু যুগের বিচ্ছিন্নতা শেষ হয়ে গিয়েছে ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বাজারের আওতায় এসে গিয়েছে, সেই অবস্থা থেকে তার আর ফিরে যাবার পথ ছিল না। যাঁরা বলেন, মহাবিদ্রোহ সফল হলে ভারত মধ্যযুগে ফিরে যেত, তাঁরা ইতিহাসের নিয়মকে অগ্রাহ্য করেই এইসব মনগড়া কথা বলেন। তখনকার ভারতের ও দুনিয়ার পরিস্থিতিতে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া একেবারেই সম্ভব হতো না। (গান্ধী ও আরো অনেক কংগ্রেস নেতা চেয়েছিলেন ফিউডাল যুগে ফিরে যেতে—রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে—বিজ্ঞান, কলেজ, রেল, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল সব বর্জন করে চরকা ও গোরুর গাড়ির যুগে ফিরে যেতে। কংগ্রেসী শাসন স্থাপিত হওয়ার পর তা হতে পারেনি, তা সম্ভব নয় বলেই হতে পারেনি।)

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ছিল তখনকার দুনিয়াব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটা অংশ। তাই, মার্কস এই বিদ্রোহকে ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র বলেছিলেন। এবং নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, ১৮৫৬ সনে ভারত স্বাধীন (ally) হলে ভারতের পরবর্তী বিকাশ ঔপনিবেশিক দেশের মতো হতো না। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত, বাংলাদেশ বিভক্ত হতো না, তার দাসসুলভ মনোভাব ঘুচে যেত, আত্মসম্মানবোধ জাগত, মূলধন ভারতেই সঞ্চিত হতে পারত, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে হতো না।

এই প্রসঙ্গে আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ তখনো মিটে যায়নি। ভারতীয় রাজাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েই ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্য বাড়াচ্ছিল। ডালহাউসির আগ্রাসী নীতির ফলে রাজাদের মধ্যে যে আতংক ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। তাই '৫৭ সনের বিদ্রোহে তাদের অনেকেরই যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাটা যথেষ্ট ছিল।

সেই সময়ে ভারতে সামন্তশ্রেণীর চরিত্রও সর্বত্র একই প্রকারের ছিল না। অযোধ্যার তালুকদারদের সঙ্গে বাংলার জমিদারদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বাংলায় পুরুষানুক্রমিক প্রাচীন জমিদারশ্রেণীর অনেকেই ইংরেজ রাজত্বে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৩ সনের কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে পূর্বে ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা ও দালালি করে যে ধনী কম্প্রাডর শ্রেণী তৈরি হয়েছিল,

তারাই জমিদার হয়ে বসলো এবং জমির মালিকানা লাভ করলো—যে অধিকার ভারতের ইতিহাসে পূর্বে তারা কোনোদিন পায়নি। স্বভাবতই ইংরেজের সৃষ্ট বাংলার এই নব্য সামন্তশ্রেণী ছিল ইংরেজদের একান্ত অনুগত ও তাদের ক্রীতদাস। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে ইংরেজ শাসন ঈশ্বরের আশীর্বাদ—এটা ছিল তাদেরই কথা।

অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রোহিলখণ্ডে তালুকদাররা ইংরেজ শাসনের নতুন আইন-আদালতের ফলে কিভাবে বানিয়া মহাজনদের নিকট বঞ্চিত হচ্ছিলেন, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ জমাট বেঁধে উঠেছিল। অযোধ্যার তালুকদারদের নিকট ইংরেজ শাসনটা ছিল খুবই সাম্প্রতিক; পরাধীনতায় তখনো তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন নি ও স্বাধীনতার স্বাদটা একেবারে ভুলে যাননি।

অযোধ্যার বড় তালুকদারদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বেশ কয়েকজন বড় রাজা প্রথম থেকেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন ও শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন এবং অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণও দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁদের ব্রিটিশ রাজত্বে কোনো ক্ষতি হয়নি—যেমন চুর্দা, ভিঙ্গা, গোণ্ডা, নানাপাড়ার রাজারা। এটা বলা যেতে পারে যে, এরা 'ব্যক্তিগত কারণে' বা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে বিদ্রোহে যোগ দেননি—একথা বেশ জোর দিয়েই ক্যানিং সাহেব আউটরামকে লিখেছিলেন।[২] খ. অনেক রাজাই নিষ্ক্রিয় হয়ে দেখেছিলেন যুদ্ধের হাওয়া কোন দিকে বয়; ক্যানিং যখন ঘোষণা করেছিলেন তালুকদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে, তখনই এঁরা বিদ্রোহে যোগ দেন। গ. এদের একটা অংশ ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। মাঝারি ও ছোট তালুকদারদের বেশির ভাগই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

অযোধ্যার সামন্তশ্রেণী যে প্রধানত তার শ্রেণীস্বার্থের জন্যেই বিদ্রোহ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এইক্ষেত্রে তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থের জন্যে কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়েনি, লড়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে—যারা তাদের স্বার্থে আঘাত করেছিল। (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেও তো বুর্জোয়া শ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থের জন্যেই বিপ্লব করেছিল।) বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ-লক্ষ লোককে সমবেত করে বিদ্রোহী সামং নেতারা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাকে অস্বীকার করতে পারে। এমনকি, এই শ্রেণীর সঙ্গে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কৃষকরাও এঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। (অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ও তো শ্রমিক শ্রেণী বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল।) জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে যে প্রচণ্ড জাতীয় সংহতি এই বিদ্রোহী সামন্ত নেতাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল, তার নজির ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে

আম কটা পাওয়া যায় ?[৩]

মহাবিদ্রোহে সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রসঙ্গে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে কয়েকটা উদাহরণ স্মরণ রাখলে দেখা যাবে যে, আমাদের ইতিহাসজ্ঞরা যেসব 'যুক্তি' দিয়েছেন, সেগুলি কত অযৌক্তিক। ১৮৫৭ সনের ভারতের মতো দুনিয়ার আরো অনেক দেশে সামন্তশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

এই সময় থেকেই জাপান একেবারে একটা বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় সামন্ততান্ত্রিকদের একটা অংশের নেতৃত্বেই মাইজী-বিপ্লব ঘটিয়েছিল (তখন জাপানে বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে) এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাপানিরা নিজেদের দেশের স্বাধীনতা তো রক্ষা করেই ছিল, উপরন্তু আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও শিল্পায়নের দ্বারা তাদের দেশকে একটা শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল এবং ৫০ বছরের মধ্যে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদীদের সমকক্ষ হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক বিসমার্কের নেতৃত্বেই বিচ্ছিন্ন জার্মান রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং ২৫-৩০ বছরের মধ্যেই জার্মানি শিল্পে বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ভারতও যদি নিজের শক্তির জোরে বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেকে ১৮৫৭ সনে মুক্ত করতে পারত, তা সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বে হলেও, সেই শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের জোরেই সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারত; তার অগ্রগতির প্রধান বাধাগুলি দূর হতে পারত, এবং তার ভবিষ্যৎ বিকাশ যে প্রচুর সম্ভাবনা পূর্ণ হতো, তা ইতিহাসের কার্যকারণে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাই মেনে নেবেন। নিজের শক্তির জোরে স্বাধীনতা লাভ করলে, সেই শক্তিই তাকে এগিয়ে নিয়ে যেত। জনসাধারণ আত্মশক্তিতে ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যমে নতুন প্রেরণায় অগ্রসর হতো। এবং তারা শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনেই আর সন্তুষ্ট থাকত না, সামাজিক পরিবর্তনও দাবি করত।

মহাবিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল জনসাধারণ, এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তারা তাতে যোগ দিয়েছিল। সেই অবস্থায় সামন্ত নেতাদের পক্ষে তাঁদের সেই পুরনো স্বৈরাচারী ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো, এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে হবে কোন ? – যে মুহূর্তে জনসাধারণ কোনো আন্দোলনে যোগ দেয় তখন থেকেই সেই আন্দোলনের চরিত্র বদলাতে বাধ্য। মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব সামন্তশ্রেণীর হাতে থাকলেও জনসাধারণ তাতে যোগ দেবার ফলে তার চরিত্রও বদলে গিয়েছিল। (গান্ধী কয়েকবার তাঁর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনে জনসাধারণকে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাতে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীর আন্দোলনের চরিত্র বদলে যেত, 'অহিংস' আর থাকত না এবং সেইজন্যেই গান্ধী বারবার তাঁর আন্দোলন বন্ধ

করে দিয়েছেন।)

মহাবিদ্রোহের সামন্ত নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আরো একটি কথা। সিপাহি ও জনসাধারণ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সব সময় যে সামন্তদের নেতৃত্ব মেনে নেয়নি, সে বিষয়ে এই বইতে বহু তথ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। দিল্লির যুদ্ধ আলোচনার সময় আমরা দেখেছি কিভাবে সিপাহিদের 'মিলিটারি কোর্ট' গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন কমিটির মারফৎ বাদশাহি দরবারের সামন্ত-তান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাদের নিজেদের ক্ষমতা স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল এবং কিভাবে দিনের পর দিন সেই অভিজাত দরবারের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধছিল এবং সর্বশেষে আমরা এও দেখেছি, কিভাবে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহিদেরই জয় হয়েছিল। কৃষকদের জমির মালিক করার কথাও যে এই সিপাহি কোর্ট চিন্তা করেছিল তাও আমরা দেখেছি। সিপাহিদের আরো একটা গণতান্ত্রিক কাজ হয়েছিল এই যে, দিল্লি ও অন্যান্য স্থানে সিপাহি ও অফিসারদের মধ্যে বেতনের পার্থক্য অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দিল্লিতে সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশ ঘটছিল এবং তদনুসারে বিদ্রোহের কার্যকলাপও পরিচালিত হচ্ছিল[8] অন্যান্য বিদ্রোহী কেন্দ্রগুলিতেও তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। দিল্লির মতো লখনৌ, কানপুরেও সিপাহিদের অনুরূপ মিলিটারি কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল। সিপাহিরা ঝান্সি ছেড়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল, তাই সেখানে মিলিটারি-কোর্ট ছিল না, কিন্তু সেখানেও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

বিদ্রোহী গ্রামাঞ্চলগুলিতেও কৃষকরা যে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং তা যে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল, তার অসংখ্য প্রমাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। কৃষকদের সাহায্যেই পুরনো তালুকদাররা নতুন জমিদার মহাজনদের তাড়িয়ে তাদের তালুকদারি পুনর্দখল করেছিল।[5] অনেক স্থানে কৃষকরা বলপূর্বক জমি দখল করেছিল এবং স্বভাবতই তালুকদাররা এটা পছন্দ করেনি। অনেক স্থানে বিদ্রোহী কৃষকদের সমিতি গড়ে উঠেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তালুকদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধছিল। কয়েকজন প্রতিপত্তি-শালী তালুকদার যেমন প্রথম থেকেই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়েছিল, আবার অনেক তালুকদার তাদের তালুকদারি পুনরুদ্ধার করার পর লড়াইতে আর বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখায় নি। এইরকম অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরাই তালুকদারদের যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেছিল। বলা বাহুল্য, কৃষক বিপ্লবের এই সংগ্রামী মূর্তি দেখে সাধারণত তালুকদাররা খুব খুশি হয়নি।[6] তাই অনেক তালুকদার প্রথম সুযোগেই ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

মোট কথা হচ্ছে, যদি মহাবিদ্রোহে ভারতীয়রা জয়যুক্ত হতো, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মধ্যযুগে ফিরে যাবার পরিবর্তে সিপাহি কৃষক ও

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ঝোঁকগুলির শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

সুতরাং '৫৭ সনের বিদ্রোহ ছিল একটা সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ মাত্র, তা জয়যুক্ত হলে, মুঘল-পেশোয়া শাসন কায়েম হতো, ভারত মধ্যযুগে ফিরে যেত, ভারতের ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরে যেত—এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের গতিবিজ্ঞানকে (dynamics) সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন বলেই এইসব ইতিহাস বিরোধী কথা বলেন : তাঁরা নিজেরাই সাবেকি সামন্ত-তান্ত্রিক নিশ্চল (static) চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন বলেই এইসব কথা বলেন। গণবিরোধী ইতিহাসজ্ঞরা যে একথা বলবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু যখন কোনো কোনো মার্কসবাদী এমন কথা বলেন, তখন মার্কসবাদের সারমর্মকেই তাঁরা অস্বীকার করেন। জনসাধারণ যত অনগ্রসর অবস্থাতেই থাকুক না কেন, একটা গণবিদ্রোহ কখনো সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদমুখী হয় না। প্রকৃতিতেও যেমন, ইতিহাসেও তেমনই—সম্পূর্ণ পশ্চাদ্‌গমন হয় না।[৭] লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের এতবড় একটা বিরাট অভ্যুত্থানে সেই যুগের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার কোনো ছাপ পড়বে না, এমন হতে পারে না।

বস্তুত মহাবিদ্রোহে, অঙ্কুরে হলেও অনেক গণতান্ত্রিক ভাবধারা ভালো ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়ে গণবিদ্রোহ আঁকাবাঁকা পথে চলে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত গতিশীলতার বলে তাকে এগিয়েই চলতে হয়। টোটার প্রশ্নটাই এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা চমৎকার উদাহরণ। যে টোটা ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ধর্ম গেল, জাত গেল, মান সম্মান গেল বলে এত উত্তেজনা, এত আন্দোলন ; যে টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, সেই টোটাই শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সেই একই 'গোঁড়া' 'ধর্মান্ধ' 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' সিপাহিরা একটুকু ইতস্তত করেনি, ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবার কথা ভাবেনি।[৮] বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণচেতনা যে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়, এইসব উদাহরণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, দিল্লিতে সিপাহি ও জনসাধারণ ক্রমশ এক প্রকারের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (constitutional monarchy) দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৫৭ সনে যদিও মুঘল বাদশাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবু সিপাহি ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রধান প্রস্তাব (chief promise) ছিল এই যে, সমস্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতার উৎস হলো সিপাহি ও জনসাধারণ। এরূপ অভূতপূর্ব ঘটনা ভারতের ইতিহাসে আর কখনো দেখা গিয়েছিল কি ? সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড হলো 'ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা' (divine right of Kings)।[৯] এটাই ছিল সর্বত্র—ইয়োরোপ, এশিয়া ও মুঘলদের ও স্বৈরাচারের ভিত্তি। ১৮৫৭ সনে স্বৈরাচারের এই ভিত্তি আর রইল না—বাদশাহ

হলেন জনসাধারণের অনুগত এবং জনসাধারণের দ্বারা বিশেষ এক বৈপ্লবিক পরিবেশে নির্বাচিত বা সমর্থিত। সুতরাং তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা। নির্বাসিত ওয়াজেদ আলির নাবালক পুত্র বিরাজিস কাদেরকেও এইভাবেই অযোধ্যার নবাব নির্বাচিত করা হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবীদের মতো মার্ক, মিল, লক, মেকলে না কণ্ঠস্থ করেও যে সিপাহি ও জনসাধারণ নিজেদের বুদ্ধি ও চেতনার বলে এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল, এটা কম প্রসংশনীয় কথা নয়। তৎকালীন ভারতের যে সামাজিক অবস্থা ছিল, তাতে এর বেশি অগ্রসর হওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা যেটুকু অগ্রসর হতে পেয়েছিল তার মূল্য কম নয়। কোনো বাস্তববাদী সত্যানুগ ইতিহাসজ্ঞই তা উপেক্ষা করতে পারেন না।

প্রাক ধনতান্ত্রিক অবস্থায় শুধু এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেই নয়, পূর্ব ইয়োরোপেও অনেক দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অথবা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল সামন্তশ্রেণীই। নেপোলিয়ানের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেন দেশের কৃষকরা লড়েছিল তাদের সামন্তদের নেতৃত্বে এবং এই যুদ্ধকে স্পেনের জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই বলেই সকলে স্বীকার করেন। ১৮১২ সনে যখন নেপোলিয়ান রুশদেশ আক্রমণ করেছিলেন তখন রুশ জনসাধারণ তাদের সামন্ততান্ত্রিক জারের নেতৃত্বেই বিদেশি আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিল। যদিও নেপোলিয়ান রুশীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাইতে একটা অনেক বেশি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি ছিলেন রুশরা তাঁকে স্বাগত জানায় নি, তারা তাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যেই লড়েছিল। এই লড়াইগুলি সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী নেতৃত্বে হলেও লেনিন এগুলিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেই গণ্য করতেন।[১০]

পোল্যাণ্ড ছিল জার সম্রাটের অধীন। পোল্যাণ্ডে ধনতন্ত্র তখনো বিকাশ লাভ করেনি। সামন্তদের নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডে যে মুক্তি সংগ্রামগুলি হতো, তা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন সব দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়করূপে গণ্য করতেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করতেন। পোল্যাণ্ডের এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তাঁরা বিচার করতেন বাহ্যিক গণতন্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে নয়, তার প্রধান আন্তর্জাতিক ফলাফলগুলি দিয়ে।[১১] এই মুক্তি সংগ্রাম সামন্তদের নেতৃত্বে হয়েছিল বলে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বরবাদ করে দেননি।

মহাবিদ্রোহের চরিত্র বোঝার জন্যে সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটার জবাব দিতে হবে—'৫৭ সনের ভারতে প্রধান বিরোধ (principal contradiction) কি ছিল—অর্থাৎ ভারতের ও জনসাধারণের প্রধান শত্রু কে ছিল? ভারতের

সামন্ততন্ত্র না বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ?

১৭৫৭ সন পর্যন্ত ভারতের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল একদিকে জনসাধারণ ও অন্যদিকে রাজা মহারাজা ও নবাব প্রভৃতির সামন্ততন্ত্রের মধ্যে। ১৭৫৭ সনের পর যখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে পরাধীন করতে শুরু করলো, তখন স্বভাবতই ভারতের প্রধান বিরোধের রূপান্তর ঘটলো - ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই হয়ে দাঁড়ালো ভারতের প্রধান শত্রু, ভারতের মুখ্য দ্বন্দ্ব ; সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের যে দ্বন্দ্ব ছিল তা হয়ে গেল গৌণ। এখন থেকে ভারতের প্রধান বিরোধ হলো সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকদের সঙ্গে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর বিরোধ এমনকি সামন্ততান্ত্রিকদেরও।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ছিল বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, সমাজ বিপ্লবের জন্যে শ্রেণী-সংগ্রাম নয়। মহাবিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে ভারতকে মুক্ত করা। তাই রাজা-মহারাজা-জমিদার থেকে শুরু করে শহরের মধ্যবিত্ত, কারিগর, শ্রমিক এবং গ্রামের কৃষক পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই এই সংগ্রামে যোগ দেওয়া ঐতিহাসিক কর্তব্য। সুতরাং বাহাদুর শাহ, বেগম হজরত মহাল রাণী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, কুমার সিং প্রমুখ যেসব রাজা ও জমিদাররা এই যুদ্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তাঁরাই ছিলেন দেশপ্রেমিক আর সিন্ধিয়া, হোলকার, নিজাম, পতিয়ালা, নাভা, ভূপালের রাজারা - যারা ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাই ছিলেন দেশদ্রোহী।

এই যুগে ইয়োরোপে মূল দ্বন্দ্ব ছিল সামন্ততান্ত্রিকদের স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার লড়াই। সেখানে এই শ্রেণী-সংগ্রাম, এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান। ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল অন্যরূপ। ঔপনিবেশিক ভারতের মূলদ্বন্দ্ব ছিল বহির্দ্বন্দ্ব, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সব জাতি, সব ধর্ম, সর্ব শ্রেণীর সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। '৫৭ সনে ভারতীয়দের নিকট সামন্ততন্ত্রের স্থানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন ছিল পরাধীন ভারতের স্থানে স্বাধীন সার্বভৌমিক ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অন্যান্য শ্রেণীগুলির পাশে সামন্ততান্ত্রিকদেরও একটা স্থান ছিল। '৫৭ সনের ভারতের এই মূল দ্বন্দ্বের প্রশ্নটাকে বুঝতে না পারার ফলেই ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রগতিশীলদের মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে বিভ্রান্তির কারণ। এঁরা যান্ত্রিক ভাবে ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে মহাবিদ্রোহের প্রশ্নটাকে বিচার করেছেন। বিশেষ করে রায় ও দত্ত মার্কসিস্ট হওয়া সত্ত্বেও এই মহাবিদ্রোহকে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক নিয়মের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেন নি, ঔপনিবেশিক ভারতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ

করেন নি ; তাঁরা এটাকে বিচার করেছেন ইয়োরোপের বাহ্যিক গণতন্ত্রের (formal democracy) মাপকাঠি দিয়ে। এই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে যেখানে আসল প্রশ্ন ছিল—এটা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল কিনা, সেখানে এঁরা এটা সামন্ততন্ত্র বিরোধী ছিল কিনা—এই প্রশ্নটাকেই তুলে ধরলেন।

যদি মহাবিদ্রোহের উদ্দেশ্য ভারতে বিদেশি শাসন ধ্বংস করাই প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহলেই তা বিপ্লবী, প্রগতিশীল ও সমর্থনযোগ্য, তার নেতৃত্ব যার হাতেই থাকুক না কেন ; যদি কোনো আন্দোলন তা না করে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস না চায়, (যেমন পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন, আপোষ-পন্থীদের 'স্বরাজ্য' অথবা 'স্বাধীনতার' আন্দোলন, লিবারালদের গণতন্ত্রের আন্দোলন)—যেসব আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে ও তাকে জীইয়ে রাখতে চায়—তা হলো চূড়ান্ত বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল, মুখে তারা যত গণতন্ত্র ও প্রগতির কথাই বলুক না কেন।[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্র নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশে সামন্ত শ্রেণীর ভূমিকা তখনো শেষ হয়ে যায়নি, তাছাড়া ভারতের বুর্জোয়া-শ্রেণী তখনো জন্মগ্রহণ করেনি। ইংরেজরা ভারত জয় করেছিল এই সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৮৫৭ সনেও সে বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়নি। ভারতের ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে তার স্বাধীনতার সংগ্রামে তখনো তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।[১৩] তখনো ভারতের এইসব রাজা নবাব ও জমিদাররাই ছিল জাতি-ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্যের কেন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে, সেই সময় ভারতের প্রধান দ্বন্দ্ব বিদেশি শাসকদের সঙ্গে হলেও, ভারতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বটা, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের দ্বন্দ্বটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্যভারত এইসব বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে পুরনো সামন্ততন্ত্রের স্থানে ইংরেজ-সৃষ্ট নয়া সামন্ততন্ত্র তখন কৃষকদের প্রত্যক্ষ শত্রু ও শোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই ইংরেজদের এই দালালরা কৃষক-বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। কৃষকরা ইংরেজ শাসন ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে নয়া জমিদার, বানিয়া মহাজনদেরও ধ্বংস করেছিল।

বিদ্রোহের পরাজয়ের পর কমিশনার উইলিয়ামস মিরাট ডিভিসনের কৃষক বিদ্রোহের ব্যাপকতা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন যে, ১০ মে সকালবেলা সর্বত্র শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু

অপরাহ্নে সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু হতে না হতেই, বিদ্রোহ গ্রামাঞ্চলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, সর্বত্র কৃষকরা নতুন জমিদার, বানিয়া মহাজনদের বাড়ি-ঘর আক্রমণ করলো এবং হিসেবের খাতা ও দলিলপত্র সব জ্বালিয়ে ফেললো।[১৪]

অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, সাগর—সর্বত্র ভারতের অভ্যন্তর থেকে গ্রামে গ্রামে এই একই কৃষক বিপ্লব, সর্বত্র তার একই লক্ষ্য—ইংরেজ সরকার, তার আইন-আদালত, পুলিশ, নতুন জমিদার, বানিয়া মহাজন, সব নিশ্চিহ্ন করে দাও।[১৫] এক কথায় ইংরেজরা বহু পরিশ্রম করে যেসব আইন, সম্পত্তি-সম্বন্ধ ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল ও যাকে তারা আদর্শ বলে মনে করত, তাকে কৃষকরা ও পুরনো জমিদাররা মিলিতভাবে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিল এবং ভূমি-সম্পত্তির একটা প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটিয়ে দিল।[১৬]

সত্য বটে যে, অনেক ক্ষেত্রে পুরনো জমিদারদের নেতৃত্বেই কৃষকরা এই ভূমি-বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এই ঘটনার তাৎপর্য কি এই যে, কৃষকরা মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রে ফিরে যেতে চেয়েছিল, এই প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় খুব সঠিকভাবেই বলেছেন: "গ্রামাঞ্চলের সংগ্রাম পদ্ধতি ছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসংগ্রাম সমগ্র জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত না হইয়া জমিদার শ্রেণীর একটি অংশের বিরুদ্ধে, যে জমিদারগণ ইংরেজ শাসনের নূতন-ভূমি আইনের সৃষ্টি হইয়া ইংরেজ শাসকগণের রাজনৈতিক সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহা সাময়িক ভাবে হইলেও, দৃঢ় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল।"[১৭]

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই কৃষক বিদ্রোহ পুরনো সামন্তদের নেতৃত্বে হলেও মহাবিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল কৃষকরা; ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং তার মিত্র ইংরেজ-সৃষ্ট নতুন ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকরাই ছিল প্রধান উদ্যোগী।

বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষকরা একটা প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।[১৮] এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তারা শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং কালক্রমে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হতো না। বিদ্রোহের গতিশীলতাই কৃষকদের সুনিশ্চিতভাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।[১৯]

জনসাধারণ আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই চালিত হয়, পরে আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা যৌক্তিক জ্ঞান লাভ করে। আসল কথা হচ্ছে, ইতিহাসের কার্যকারণে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা জনসাধারণের শক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাসী, তারাই বলতে পারে যে মহাবিদ্রোহ

সফল হলে ভারত মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে ফিরে যেত। প্রশ্ন হচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি সদ্য জাগ্রত কৃষক ও সাধারণ মানুষ যারা অস্ত্রধারণ করে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাদের প্রাথমিক বিজয়ের পরেই কি তাদের ইতিহাসের যাত্রা থেমে যেত, না তারা প্রধান শত্রুকে ধ্বংস করে ও প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে আরো ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হতো ?

নি র্দে শি কা

১. ড. মজুমদার বলেছেন, বিদ্রোহী তালুকদারদের এই বিদ্রোহটা ছিল 'নোংরা খেলা' (sordid game), তাদের কোনো 'উচ্চ আদর্শ' ছিল না (they had no high ideals) ; তারা লড়েছিল "তাদের ধনসম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাগুলি রক্ষা করার জন্য—যেগুলি বেআইনীভাবে দখল করেছিল—সমগ্র দেশের বা তার একটা অংশের স্বাধীনতা লাভের জন্য নয়।" (*Paramountcy etc.* p. 54) ড. সেন বলেছেন, অযোধ্যার রাজারা ও তালুকদাররা "তাদের রাজা [অর্থাৎ অযোধ্যার নবাব] ও ধর্মের জন্য লড়েছিল। ১৮৫৭ এর যুদ্ধে কোনো নৈতিক প্রশ্ন ছিল না, "no moral issues were involved in the War of 1857" (p. 412) রাজার জন্য বা ধর্মের জন্য লড়াই করাটার মধ্যেও কি একটা নীতি নেই ? হতে পারে সেটা একটা সামন্ততান্ত্রিক নীতি, তাহলেও একটা নীতি তো বটে।

২ ক্যানিং জেনারেল আউটরামকে লিখেছিলেন : "আপনি মনে করছেন, অযোধ্যার রাজা ও জমিদারদের বিদ্রোহ করার কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা আমাদের রাজস্বনীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরো চিন্তা করার প্রয়োজন। চান্দা, ভিঙ্গা ও গোণ্ডার রাজারা আমাদের প্রতি যতটা ঘৃণা দেখিয়েছিলেন এতটা আর কেউ দেখায় নি। চান্দার রাজার কোন গ্রাম তো কেড়ে নেওয়া হয়নি, বরং দেয় কর কমিয়েই দেওয়া হয়েছিল। ভিঙ্গার রাজাকেও আমরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিলাম। গোণ্ডার রাজার ৪০০ গ্রামের মধ্যে আমরা মাত্র ৩টি নিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর কর ১০ হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য পরিবর্তন হওয়ার ফলে নওপারার নাবালক রাজার চাইতে

আর কেউ বেশি লাভবান হয়নি। ইংরেজ শাসন প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দাবিদারদের উপেক্ষা করে, ইংরেজ সরকার তাঁকে ১ হাজার গ্রাম দিয়েছিল এবং তাঁর মাতাকে অভিভাবক নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু এই মহিলার সৈন্যরা প্রথম থেকেই লখনৌতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ধুরার রাজাও রাজ্য পরিবর্তনের সময় প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লোকেরাই ক্যাপ্টেন হার্সিকে আক্রমণ করেছিল, তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করে লখনৌর কারাগারে পাঠিয়েছিল। এইসব উদাহরণগুলি এবং এরূপ উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যেতে পারে—তা প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্যেই রাজা ও তালুকদাররা বিদ্রোহ করেননি।" লখনৌর যুদ্ধের পর রাজা বেণীমাধবকে লর্ড ক্লাইভ আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়ে খুব ভালো শর্তই দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি; শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের এরূপ উদাহরণ আরো অনেক আছে। Savarkar, *The Indian War of Independence*, pp. 401-2।

৩. "Thus both in the pre-mutiny and mutiny periods it was the class of the landed chiefs who led the struggle against the British. The feudal frameworks of these movements indeed cannot be doubt though they were not of the reactionary type directed mainly for the preservation of the rights and privileges of an obselate aristocracy. The distinction between baronial and popular risings against the ruling power, the one for the *status quo ante*, and the other for a future had no special import in the Indian situation as the factor of foreign rule impinged an all alike and this blurred the edges of purely feudal motives. Moreover, nearly all classes and communities thronged round these landed chiefs, they being regarded as the natural leaders of their respective localities which lent these movements a representative character.···Along with changes which a huge revolt ushers in, the feudal spirit of these anti-British movements was likely to have faded before long. So basically, the rebellions of the mutiny period were not without their social and political content and their

anticipations of progress" (Chaudhury, *Civil Rebellion*···, pp. xvii-xviii)

৪. সম্প্রতি একজন ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ লিখেছেন: "He [Bahadur Shah] bowed to destiny or the force of circumstances and thenceforward the pattern of the new regime rapidly took shape. ··· The striking fact about these arrangements was that they followed almost entirely the existing model, no attempt seems to have been made to revert to the old imperial system. The titles were Persian but the system was British. Time of course was brief, and the British system itself contained Mughal elements, but the fact remains that there was no conscious reversion to the past" (Spear, *Twilight of the Mughals*, pp 204-6)

৫. "[In ejecting] The moneyed classes who had supplanted them, the old proprietors were assisted by their former tenants." (Dutt, *Indian Rebellion*, p. 189); হামিরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রীলিং তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "I need scarcely say that the great feature in the rebellion here has been the universal ousting of all bankers banyas, Marwaris etc." (Chaudhury, *Civil Rebellion*, p. 209) হেনরি সেণ্ট জর্জ টাকার অযোধ্যার পরিস্থিতি সম্বন্ধে বড়লাটকে লিখেছিলেন—"All the large land-holders and auction-pur-chasers are paralysed and disposed, and their agents frequently murdered and their property destroyed." (Kaye, vol. II, pp 2:3-34)

৬. সাভারকার তাঁর বইতে লিখেছেন (p. 435) – "when the Sepoys were determined to burn down all government papers written in English it was Kunwar Singh who stopped them from doing so, as otherwise, after the English would be no proof of the eountry, there would be no proof of the rights of the people and no evidence to determined the amount due from one party to the other."

৭. উদাহরণস্বরূপ, ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ১৮১৫ সনে

ভিয়েনা কংগ্রেসে রুশ সম্রাট, অস্ট্রিয়ান সম্রাট ও প্রাশিয়ার রাজাদের Holy Alliance এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সামন্ততন্ত্রী স্বৈরাচারী প্রবল শক্তিশালী রাজারা শতচেষ্টা করেও ঘড়ির কাঁটা সম্পূর্ণরূপে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন নি। পক্ষান্তরে ১৮৪৮ সনের বিপ্লবের ফলে ঐ Holy Alliance-ই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৮. [The greased cartridges were used by the Mutiners] without hesitation or thought of defilement against the English." (Edmund Cox, *A Short History of the Bombay Presidency*, p. 348) ; জুলাই মাসে দীনাপুরে সিপাহিরা যখন বিদ্রোহ করলো তখন "The rebels hung the dead bodies of the Europeans to trees, took their Enfield Rifles, Guns and cartridges and all, which many of them used." (*The Overland Bombay Times*, 31 Aug. 1857, quoted, Chaudhury, *Civil Rebellion*, p. 1 5)

৯. ১৮৪৮ সনে জার্মান বিপ্লবের সময় ফ্রাঙ্কফোর্টের গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট প্রাশিয়ার রাজাকে সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা এই প্রস্তাবের গণতান্ত্রিক তাৎপর্য বুঝতে পেরে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে সেই মুকুট গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

১০. "... after Nepolean had created the French Empire by subjugating a number of larger, vital, long established national states of Europe, the French nrtional wars became imperialist wars, which in their turn engendered wars of national liberation against Napoleon's imperialism." (Lenin, *Junius Pamphlet*, works, vol. II, p 309)

১১ "So long as the masses of the people in Russia and in most of the Slavic countries were still dormant so long *as there were no* independent, mass, democratic movements in these countries, the *aristocratic* liberation movemant in Poland assumed immense, paramount importance from the point of view, not only of Russian, not only of Slavic, but of European democracy as a whole " (Lenin, *Right of Nations to Self determination*, works, vol. I, p. 1946, p. 593)

১২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঈজিপ্ট ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে —তার নেতৃত্ব সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াদের হাতে থাকা সত্ত্বেও এবং এগুলি সমাজতন্ত্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও—সব দেশের কমিউনিস্টরা ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল; কেননা এগুলি ছিল 'objectively a revolutionary struggle' এবং সেই সঙ্গে তারা 'সমাজতান্ত্রিক' ব্রিটিশ লেবার পার্টিকে তীব্র নিন্দা করেছিল, যেহেতু তা এইসব ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনগুলিকে দমন করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করছিল। স্ট্যালিন এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "যেসব জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে বা ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করে না, সেগুলিকে সমর্থন করতে হবে।… সাম্রাজ্যবাদের পীড়নের অবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্র শ্রমিক শ্রেণী অথবা প্রজাতান্ত্রিক কর্মসূচী, অথবা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। আফগানিস্তানের আমির তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করছেন তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক (স্ট্যালিনের জোর) সংগ্রাম; যদিও আমীর ও তাঁর অনুগামীরা রাজতান্ত্রিক মতবাদ পোষণ করেন, তা সত্ত্বেও এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে ও তার পতনকে সাহায্য করে।" ভারত ও চীন সম্বন্ধে স্ট্যালিন বললেন: "স্বাধীনতার পথে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, তা যদি আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও যায়, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত (steam-hammer blow) এবং নিঃসন্দেহে একটা বৈপ্লবিক (স্ট্যালিনের জোর) পদক্ষেপ।" স্ট্যালিন আরো বললেন, পক্ষান্তরে ম্যাকডোনাল্ড, হেণ্ডারসন, সাইডেমান, কেরেনস্কী প্রমুখের মতো সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক 'বিপ্লবী'দের আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদকেই শক্তিশালী করে। (*Problems of Leninism*, pp. 62-63)

১৩. "ফরাসী রাজতন্ত্রের উপর প্রথম আঘাত এসেছিল চাষীদের কাছ থেকে নয়, অভিজাতদের কাছ থেকে।" (কার্ল মার্কস: প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ, পৃ. ৯৪)

১৪ *Narrative of Events*, 1858, vol I, pp. 255-61; এই গ্রন্থে বহু ইংরেজ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট রয়েছে; তা থেকে কৃষক বিদ্রোহ, তাদের শ্রেণী সংগ্রাম, তাদের গণযুদ্ধ সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে, সুপ্রকাশ রায়: ভারতে কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং S. B. Chaudhury, *Civil Rebellion in India*, বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

১৫. কেই লিখেছেন, উত্তর ও মধ্য ভারতে সর্বত্র "a great movement

from within was beginning to make itself felt upon the surface of the rural society, and all the traces of the British rule were rapidly disappearing from the face of the land." (vol. II, pp. 2:4)

১৬. ,*Ibid* vol II, pp. 234, 412.

১৭. "ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ. ৩৪৬

১৮. লেনিন প্যারিস কমিউন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জনসাধারণ "স্বর্গও বিধ্বস্ত করতে পারে" এবং সেই স্বর্গের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। "১৮৫৭-৫৮ সনে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বর্গস্বরূপ ভারতের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এই স্বর্গের উপর, সাময়িকভাবে হইলেও, আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" (সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ··, পৃ. ৩৬৭)

১৯. কৃষকদের দুর্বলতার প্রধান কারণ ছিল : ক) তাদের নিজস্ব শ্রেণী-সংগঠনের অভাব ; খ) তাদের বিদ্রোহের স্বতঃস্ফূর্ততা ও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ; গ) কৃষকদের মধ্যে নিম্নস্তরের রাজনৈতিক চেতনা। সাধারণভাবে বলা যায়, এগুলিই হলো সমস্ত বিদ্রোহের দুর্বলতা। ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহী কৃষকরা তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। এই কর্তব্যটা পালন করার দায়িত্ব ছিল বুদ্ধিজীবীদের, কিন্তু তারাও ছিল এই কর্তব্য পালনে অক্ষম।

১১

মহাবিদ্রোহ কি 'ধর্মযুদ্ধ' ছিল ?

অনেক ইংরেজ লেখক মহাবিদ্রোহকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিত ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও বলেছেন, এটা ছিল ধর্মান্ধদের একটা ধর্মযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়। এঁরা বলেন যে, টোটার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয় সিপাহিই তাদের ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠেছিল ও বিদ্রোহ করেছিল। 'ধর্ম বাঁচাও'—এই ছিল বিদ্রোহীদের আওয়াজ। প্রমাণস্বরূপ এঁরা বলেন যে, দিল্লি লখনৌ, কানপুর, বেরিলি ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহী নেতারা যেসব ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন, তাতে তাঁরা হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে শুধু তাদের ধর্মরক্ষা করার জন্যেই আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১]

সত্য বটে যে, বিদ্রোহীরা যেসব ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল তার মূলকথা ছিল—ধর্ম বাঁচাও। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজাধীন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম উভয়ই ছিল পরাধীন জাতির ধর্ম। এই অবস্থায় হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের উপর আঘাত কেবল ধর্মের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা রাজনীতিতেও পরিণত হয়। টোটার ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটেছিল।[২]

শুধু ভারতেই নয়, অন্য দেশেও ধর্মের প্রশ্ন মানুষের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ করে যুদ্ধও অনেক হয়েছে। মধ্যযুগে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বহুদিন ধরে ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) হয়েছিল। ধর্মের নামেই সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডের কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। রোমান ক্যাথলিকদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধেই মার্টিন লুথার প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম স্থাপন করেছিলেন এবং সেই সময়েই ধর্মের নামেই জার্মান কৃষকরা টমাস মুন্টসারের নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিল।[৩] আনা বাপটিস্ট, হুসাইট, লেভেলার, ডিগার, লুডাইট বিদ্রোহগুলিও ধর্মের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল।[৪]

এই ধরনের ধর্মীয় আন্দোলনগুলি শাসক শ্রেণীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধেই লড়েনি, তারা সমাজ পরিবর্তনও ঘটাতে চেয়েছিল। (এই সব আন্দোলনের সঙ্গে বর্তমান ভারতের আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন,

কেশব সেনের আন্দোলন, অরবিন্দ আশ্রম আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, কারণ এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে, মান্ধাতা আমলের সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণাকে বাঁচিয়ে রাখা। ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই এই আন্দোলনগুলির প্রধান সমর্থক।)

বর্তমান কালেও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধ ইংরেজ প্রোটেস্টান্টদের বিরুদ্ধে আইরিশদের ক্যাথলিক ধর্ম বাঁচাবার যুদ্ধও বটে, এবং ১৯৭২ সনেও তার অবসান ঘটেনি। (অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের পণ্ডিতদের ও 'প্রগতিশীলদের' আইরিশদের যুদ্ধকে অভিনন্দন জানাতে বাধে না, মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রেই তাঁদের যত আপত্তি।) আমাদের বিচার করতে হবে, ১৮৫৭ সনে ভারতের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'ধর্ম বাঁচাও' আওয়াজটা কি এতই প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল ?

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইংরেজরা সামরিকভাবে ও রাজনৈতিক ভাবে ভারত জয় করে এবং তাকে অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ভারত সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করার জন্যে ভারতকে সাংস্কৃতিকভাবে জয় করার জন্যেও সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের এই সাংস্কৃতিক অভিযানে পাদরিদের খ্রীস্টধর্ম প্রচার ছিল অন্যতম প্রধান অস্ত্র। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয়দের বিজাতীয়করণই ছিল ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য। পাদরিরা তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের চাইতে ভারতীয়দের ধর্ম ও সংস্কৃতির নিন্দাটাই করত অনেক বেশি এবং তা করত খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবে ও অপমানজনক ভাষায়। পাদরিদের এই অভিযানে ইংরেজ শাসকদের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল ও বহু অর্থ দিয়ে তারা তাতে সাহায্যও করত। এই অভিযানের মূলকথা ছিল—ইংরেজরা শ্রেষ্ঠতর জাতি, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি সবই শ্রেষ্ঠতর আর ভারতীয়দের, তারা হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক,—তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি সবই নিকৃষ্ট। বিদেশির জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের মধ্যে যে আক্রোশ জমাট বেঁধে উঠেছিল, তারই বিস্ফোরণ ঘটলো মহাবিদ্রোহে।

বিদেশি শত্রু ভারতবাসীর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের ধনদৌলত লুণ্ঠন করেছে, তাদের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি ধ্বংস করেছে। এখন তাদের শেষ অবলম্বন ধর্ম, যে ধর্মকে তারা যুগ যুগ ধরে নিজের জীবনের থেকেও উঁচুতে স্থান দিয়ে এসেছে, সেই ধর্মেরই মূলে তাদের বিদেশি শত্রু আজ শেষ আঘাত হানতে চলেছে। তাদের যুগ-যুগান্তরের নিজস্ব সভ্যতা, কৃষ্টি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করে তাদের বিজাতীয় করতে চলেছে। এইভাবেই ভারতের সাধারণ মানুষ তখনকার অবস্থাটাকে বিচার করেছিল। তাই, তাদের কাছে চর্বিযুক্ত টোটা হলো ইংরেজের শেষ শয়তানি অস্ত্র, বিদেশি শত্রুর চ্যালেঞ্জ।

তাদের সব কিছু বিক্ষোভ টোটাতেই এসে কেন্দ্রীভূত হলো। কিন্তু যে প্রেরণা তাদের নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুললো, তা ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, তাদের সোজা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিয়ে গেল। এইভাবে হলো সিপাহি ও সাধারণ ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বর্তমান যুগের জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ।[৫]

কোনো সন্দেহ নেই যে, মহাবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল শুয়োর-গোরুর চর্বি মিশ্রিত টোটার প্রতিবাদে, ধর্ম বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হতে না-হতেই ধর্মের প্রশ্নটা গৌণ হয়ে গেল, এবং রাজনৈতিক প্রশ্নটা, স্বাধীনতার প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। বিদেশির পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্যে রাজনৈতিক বিদ্রোহে পরিণত হলো। বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।[৬] বিদ্রোহীরা প্রথম যে কাজটা করলো তা হলো, বাহাদুর শাহকে তারা স্বাধীন ভারতের সার্বভৌম সম্রাট বলে ঘোষণা করলো, যার তাৎপর্য হলো, ধর্ম বাঁচানো নয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।

জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচুর কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা ছিল (এবং এখনো আছে) সেকথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—তার জন্যে দায়ী কে? সব দেশের শাসক ও শোষক শ্রেণীই নয় কি? ভারতে সেই বৈদিক কাল থেকেই যুগ যুগ ধরে ধর্ম শিক্ষা, নীতি শিক্ষার নামে হাজার রকম উপায়ে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাই তো জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার ইত্যাদি প্রচার করে আসছে, তাকে জীইয়ে রাখার জন্যে সব রকমের উপায় অবলম্বন করছে, জনসাধারণকে শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে ('স্বাধীন' ভারতের ২৫ বৎসর পরও শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর!) এবং আজও এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে জাঁকিয়ে তুলেছে (হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে এত সরকারি ছুটি আর কোনো দেশে আছে? আকাশবাণী থেকে এত অত্যধিক ধর্মীয় সংগীত কোন দেশে হয়!) ধর্মের আফিং দিয়ে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের চেতনাকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীরা কতটুকু সংগ্রাম করেছেন?

মহাবিদ্রোহ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধদের একটা হট্টগোল মাত্র—বস্তুত পক্ষে এই ধরনের কথাগুলি হলো 'ছোটলোকদের' প্রতি 'ভদ্রলোকদের' যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত ঘৃণা মাত্র, এবং তাদের নিজেদেরই দাস মনোভাবের পরিচয় মাত্র।[৭] তাঁরা বিদেশির দাসত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আপোষহীন ভাবে কোনোদিনই দাঁড়াতে পারেন নি। 'ধর্মান্ধ' ও 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছিল; এইভাবে তারা যুগ-যুগান্তরের অদৃষ্টবাদী পরাজিত মনোভাব

বর্জন করে মেরুদণ্ড সোজা করে মানুষের মতো দাঁড়িয়েছিল এবং এইভাবেই তারা কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা বর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

টোটার বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাৎপর্য আমাদের দেশের 'আলোকপ্রাপ্ত' পণ্ডিত ও 'প্রগতিশীলরা' না বুঝতে পারলেও তখনকার ইংরেজ শাসকদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি।[৮] বাহাদুর শাহর বিচারের সময় সরকারি প্রসিকিউটার এ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

"ধর্মে, বর্ণে, আচার-ব্যবহারে, চিন্তায় ও সর্বপ্রকারে যারা বিদেশি, সেই বিদেশিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের দ্বারা ক্ষমতা ও আসন দখল করবার এই যে আন্দোলন, যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বলেই প্রমাণ হচ্ছে, তাকে শুধু ধর্মের আন্দোলন বললে ভুল হবে।...মিরাটে ও দিল্লিতে কোনো মুসলমান অথবা হিন্দুর টোটা ব্যবহার করতে সত্যিকারের কোনো আপত্তি ছিল না, তা খুব ভালোভাবেই প্রমাণ হয় যখন দেখা যায়, কী আগ্রহের সঙ্গে তারাই ওগুলি ব্যবহার করেছিল ইয়োরোপীয় অফিসারদের খুন করার জন্যে, অথবা বন্দীর (বাহাদুর শাহর) পতাকাতলে সমবেত হয়ে দিনের পর দিন ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্যে।...অনেক স্থলে যেখানে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে সেখানে টোটা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই হয়নি।... আমি জোর করেই বলব যে, এই চর্বিযুক্ত টোটার চাইতে আরো অনেক গভীর ও শক্তিশালী কিছু এই বিদ্রোহে ছিল।...এতবড় একটা ভয়াবহ কাণ্ড এই রকমভাবে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কি সম্ভব হতো, যদি টোটার প্রশ্ন উঠবার পূর্বে সিপাহিরা সন্তুষ্ট ও সুস্থ মনে থাকত?...ঘটনাবলীর স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে তুলনা করলে এটা কি সংগত মনে হয় যে, এই একটামাত্র উত্তেজনার ফলেই এতবড় ভয়ংকর হিংসাত্মক কাণ্ডের শুরু হয়ে যেতে পারে? অথবা মিরাটের মাত্র তিনটি বাহিনীর পক্ষে, কেবলমাত্র দিল্লির বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে ধ্বংস করে দেওয়ার কল্পনা করার মতো এতবড় একটা দুঃসাহসিক কাজ কি সম্ভব হতো? এটা বলা যেতে পারে—এই টোটার ব্যাপারটা যার উপর ১০ মে তারিখের পূর্ব পর্যন্ত এত জোর দেওয়া হয়েছিল, আস্তে আস্তে একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেল।...দিল্লিতে বিদ্রোহীদের প্রথম যুদ্ধের আওয়াজ জুগিয়েই তার উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেল; তারপর তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হলো—তার স্বাভাবিক মৃত্যু হলো এবং তার স্থানে দেখা গেল উদ্দেশ্যের একটা বাস্তবতা ও দৃঢ় সংকল্প।"[৯]

ইংরেজদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের অভিযানে আর একটা অস্ত্র ছিল ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক অফিস ও রেল-বন্দর চালাবার জন্যে কেরানিবাবু তৈরি করা ও শিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ বর্জিত দাসসুলভ আত্মসম্মান

বোধহীন মনোভাব সৃষ্টি করা। এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবক মেকলে সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, এই শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এমন এক শ্রেণীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি করবেন যারা হবে "রক্তে এবং বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতে, নীতিতে ও চিন্তায় ইংরেজ।"

সাম্রাজ্যবাদীদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের অভিযানের অংশরূপে মেকলের এই শিক্ষানীতি যে কতখানি সফল হয়েছিল, তা ১৮৫৭ সনে ইংরেজি শিক্ষিতদের কাপুরুষতা ও তার পরবর্তী একশো বছরের আপোষপন্থী ভূমিকাই তার প্রমাণ।[১০]

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা যে কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল এবং এমনকি অনেক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গিও কতখানি বিকৃত করে দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই লেখাতে:

একটা প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার চিন্তাই এটাকে ['৫৭ সনের বিদ্রোহকে] উত্তেজিত করেছিল। এ বিদ্রোহ ঠিক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না; যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই সরকার বহন করত, তারই বিরুদ্ধে ছিল এই বিদ্রোহ—সে চিন্তাধারাকে ভারতের মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা অভিনন্দিত করেছিল, কারণ এই বুদ্ধিজীবীরা বাস্তবপক্ষে তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং বিদেশী বিজেতারা যদি তা এদেশে নাও আনত, তাহলে তা তারা নিজেরাই বিকশিত করত।..."অনিচ্ছাকৃত ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা এমন একটা প্রচণ্ড গতিশীল সামাজিক শক্তি (dynamic social force) উন্মুক্ত করে দিল যা ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃটিশদের পক্ষে মারাত্মক [?] হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের জন্যে তাকে জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির শত্রুরূপে পরিণত হতে হয়েছিল - যে শক্তিগুলি জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করার নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আধুনিক চিন্তায় ও প্রগতিশীলতায় উদ্বুদ্ধ একটা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জন্মগ্রহণ করলো। তখন তারা শৈশব অবস্থায় থাকলেও এইসব প্রগতিশীলরা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে বলিষ্ঠতার প্রমাণ দিচ্ছিল। ..১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সামাজিক তাৎপর্য হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বাহকরূপে তা সেই বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধেই ঘটেছিল।[১১] সাম্রাজ্যবাদের civilising mission-এর এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সাম্রাজ্যবাদীরাও করতে পারেনি। রায় ও তাঁর অনুগামীরা ইয়োরোপে ও ইংল্যাণ্ডের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদকে এক করে ফেলেছেন। এটা ঘটেছে এই কারণে যে রায় নিজের এইসব কূটকচাল যুক্তি অনুসরণ করেই আরো বলতে পারতেন, ইংল্যাণ্ডের

রাজা প্রথম চার্লস, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই ও রাশিয়ার নিকোলাস যেসব 'গতিশীল সামাজিক শক্তি' সৃষ্টি করেছিলেন, তারই ফলে ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব ও বলশেভিক বিপ্লব ঘটেছিল।[১২] রায়ের কথার সারমর্ম হলো এই যে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'গতিশীল সামাজিক শক্তি' সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ক্রমবর্ধমান আপোষহীন সংগ্রামের ফলে নয়, ইংরেজি শিক্ষা, ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে, এককথায় সাম্র্যজ্যবাদীদের civilising mission-এর ফলে।[১৩] মহাবিদ্রোহের পুর্বে ইংরেজরা মনে করত যে, ভারতে সিপাহিরাই তাদের একমাত্র বন্ধু; এই ধর্মান্ধ সিপাহিরা যখন অকস্মাৎ বিদ্রোহ করে বসলো তখন তারা আশাতীত ভাবে বুদ্ধিজীবীদের বন্ধুরূপে পেল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই মেকলের শিক্ষানীতির এমন চমৎকার ফল তারা আশা করতে পারেনি।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহী হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ—তারা যত 'ধর্মান্ধই' হোক না কেন ধর্মের ভিত্তিতে কেউই ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা চিন্তা করেনি; হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে তারা অখণ্ড ভারতের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করার কথাই চিন্তা করেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই ঐক্য-বোধই ছিল তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ভিত্তি। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাই হলো প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক কাজ এবং এইরূপ কাজই হলো ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ার প্রকৃত পথ, তাকে জয় করার প্রথম সোপান। জনসাধারণ যত 'ধর্মান্ধ' ও কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক না কেন, তাদের কৃতিত্ব এই যে, তারাই ভারতের প্রধান শত্রু বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে চিনতে পেরেছিল (শিক্ষিতদেরর মতো তারা কোনোদিনই ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মেনে নেয়নি)। তারাই তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্রধারণ করেছিল, হাজারে হাজারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল, আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের চাইতে অনেক বেশি আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়েছিল।

তারা গরিব ও নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজের পুরস্কারের লোভে বা তাদের নির্যাতনের ভয়ে বিদ্রোহীদের শত্রুর হাতে সমর্পণ করেনি। ইংরেজ শাসনকে শুধু মনে মনে ঘৃণা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাকে ধ্বংস করার জন্যে জীবন-মরণ পণ করেছিল, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল শত্রুর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালাবার মতো মনোবল তাদের ছিল। শিক্ষিতদের মতো তারা সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট দয়াভিক্ষা করেনি বা তাদের উদারতার উপর নির্ভর করেনি, তারা তাদের হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার জন্যে নির্ভর করেছিল নিজেদের শক্তির উপর, নিজেদের বন্দুকের উপর—তাদের বন্দুকের নল দিয়েই সেদিন বেরিয়ে এসেছিল ভারতের জনগণের প্রকৃত রাজনীতি, জনগনের দেশপ্রেমের অন্তর্বস্তু।

নির্দেশিকা

১. R. C. Mazumdar, *Sepoy Mutiny and the Revolt of the People* pp 129-30. ড. মজুমদার আরো বলেছেন– "The utmost that can be said is that they (the sepoys were inspired by the intrigues of christions to pollute them, and not that of regaining the freedom of their country." p. 233) সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন, জনসাধারণের ধর্মের গোঁড়ামিটাই ছিল প্রধান কারণ, তাদের ধর্মনাশের ভয়টাই নাকি ছিল–"the most important of all the causes of the Rebellion." এই 'প্রমাণের' উপর নির্ভর করেই ড. মজুমদার তাঁর থিওরি দাঁড় করিয়েছেন। 'প্রগতিশীল' বিনয় ঘোষও সৈয়দ আহমদ ও ড. মজুমদারকে অনুসরণ করে বলেছেন : "একটার পর একটা রাজ্য জয় করে ইংরেজরা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং দেশে লোকের দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে তাদের ধর্মান্তরিত করার মতলব করেছে, এই রকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ··ধর্মের জিগির তুলে সাধারণ লোককে যারা বিভ্রান্ত করেছে, সেইসব মোল্লা-মৌলবীদের তিনি (আহমদ) 'imposter' বলতেও কুণ্ঠিত হননি। . বিদ্রোহীদের ধর্মনাশের আতঙ্কের মধ্যে অথবা নতুন শিক্ষাপদ্ধতি ও সমাজসংস্কারের বিরোধিতার মধ্যে, সুন্দর ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনা ফুটে ওঠেনি।" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

২. বাহাদুর শাহের ২৫ আগস্টের ঘোষণাপত্রকে সেই সময়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন এটা হচ্ছে – "An Asiatic State Paper","its merits are of a high order," "the nation has roused and thoroughly prepared for a revolution." ইত্যাদি। ড. সেনের মতে : "What began as a fight for religion ended as a war of independence for there is not the slightest doubt that the rebels wanted to get rid of the alien governmena." (p. 411)

৩. Engels-এর *Peasant War in Germany*, দ্রষ্টব্য।

৪. চীনের সমসাময়িক তাইপিং বিদ্রোহে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এই তাইপিং বিদ্রোহ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস সেই সময়ে যা লিখেছিলেন, তা ভারতের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে

প্রযোজ্য। এঙ্গেলস ১৮৪০ সনের প্রথম আফিং যুদ্ধের সঙ্গে তাইপিং বিদ্রোহের গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করে লিখেছিলেন : "Then the people were quiet ; they left the Emperor's soldiers to fight the invaders...But now, at least in the southern provinces, to which the contest has so far been confined ; the mass of the people take an active, may a, fanatical part in the struggle against the foreigners.···This is a war *pro aris et focis* [for religion and country], a popular war for the maintenance of Chinese nationality, with all its overbearing prejudice, stupidity, learned ignorance and pedantic barbarism if you like, but yet a popular war." (*New York Daily Tribune*, 5 June 1857 ; Marx-Engels, *On Colonialism*, pp 114-14)

৫. এই প্রসঙ্গে গোরখপুরের বিদ্রোহী নেতা মৌলভি সরফরাজ আলির বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। (Quoted : S. B. Chaudhury, *Civil Rebellion etc*, pp. 25-26) "The main trends of the Revolt may also serve to show that the patriotic feelings were roused by two factors in the first place, in the absence of territorial patriotism religion became the most potent force in moulding the patriotic feelings of the people for the country.·· Secondly, during the period of Rebellion, loyalty to the feudal chiefs served as a plank on which larger loyalties of the people could grow and develop." (S. B. Chaudhury, *Theories*, p. 175)

৬. 'ধর্মান্ধ' জনসাধারণের অমর বীরত্ব ও আত্মসম্মান বোধের প্রতীক রূপে পাটনার পীর আলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৪ জুলাই ১৮৫৭, পীর আলি ও আরো ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয় ও পীর আলি সমেত ১৬ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বন্দী অবস্থায় পীর আলির উপর সব রকমের পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি দেবার পূর্বে পাটনার চিফ কমিশনার উইলিয়াম টাইলর প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর নিকট থেকে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে খবর বার করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন (টাইলারের কথায়) —he answered with supreme coolness and some contempt : there were some cases in which it is good to save life ; others in which it is better to lose it.' He

then taunted me with the appression. I have excercised and concluded by saying : 'you may hang me or such as me everyday but thousands will rise in my place.' (W. Tayler *The Patna Crisis*, pp. 45-46)

৭. রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন : "মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোট।.. ওরা ছোটলোক আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানা প্রকার 'মুভমেণ্ট'-এর পূর্বাপর ইতিহাস এ'রা পড়েছেন – আমাদের জনসাধারণের মধ্যেও নানা 'মুভমেণ্ট' চলে আসছে, সে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্য কোনো ঔৎসুক্য নেই।' (পল্লীসেবা, ১৩৩৭) এই 'ছোটলোক' ও 'ভদ্রলোক'দের রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যটাও অনেকে লক্ষ্য করেছেন। "It is significant that while these popular disturbances continued at a halting space all through the nineteenth century, the interest of the upper and new middle class were hardly ever identified with these rebellions. The latter not only kept aloof but when one reads contemporary news papers, they seem to have been rather disturbed by these uprisings which interfered with peace and progress as they saw from their own point of view These two seemed to be more important than the question as to who controlled the political destiny of the land." (Prof. Nirmalkumar Bose, *Modern Bengal*, p. 67)

৮. লণ্ডন *Times* লিখেছিল (31 March 1858) অযোধ্যার যুদ্ধ ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও "there it is love of freedom the dislike of foreign rule that actuates the people."

৯. *Two Historic Trials in Red Fort*, pp. 392-93

১০. এই গোলামি শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাম্রাজ্যবাদীরা যে, good conduct certificate' দিয়েছিল তা স্মরণীয় : "Those who have imbibed the greatest share of English ideas and knowledge have taken least part in recent troubles and atrocities...

I Know scarcely one authentica'ed instance of a really educated native, I will not say joining, but even sympathising with the rebels." (Halliday, *Lt. Governor of Bengal.*) । সেই সময় Norton লিখেছিলেন : "We must also acknowledge with thankfulness the debt we owe to the educated natives." (*Topics* .., p 56) । এই ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আত্মসম্মানবোধ, মনুষ্যত্ববোধ, স্বাধীন চিন্তাশক্তি যে ধ্বংস করে দিচ্ছিল, তা অনেক ইংরেজও লক্ষ্য করেছিলেন । ১৮১৭ সনে স্যার টমাস মুনরো বলেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সুবিধাগুলি যাই হোক না কেন "[they] are purchased by the sacrifice of independence, of national character, and of whatever renders a people respectable." John Capper তাঁর *Three Presidency* (185) বইতে লিখেছিলেন, ভারতীয়রা মহান চিন্তা এবং উচ্চ আকাংক্ষার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—"Anarchy and despotism [of the previous regimes] may be scourges in their way, but political and social annihilation are far worse. Man may struggle against the former, but sunks before the latter."

১১. M. N. Roy, *India in Transition*, pp. 162-62 ; মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকীর সময় ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন সেন ও বিনয় ঘোষের মতো কয়েকজন 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবী রায়ের এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন (অবশ্য স্বীকৃতি না দিয়ে ।) ড সেন বলেছেন, "The English Government had imperceptibly effected a social revolution They had removed some of the disabilities of women, they had tried to establish the equality of men in the eyes of law, they had attempted to improve the lot of the peasant and the serf." (p. 412) ভারতে ইংরেজরা তাদের শাসনব্যবস্থার তাগিদেই দু-একটা ছোটখাট সংস্কার করেছিল । ড. সেনের নিকট সেটাই 'সমাজ বিপ্লব' । ড. সেনের মতে বিপ্লব কথাটার কোনো বিশিষ্ট অর্থ আছে বলে মনে হয় না । বিনয় ঘোষ বলেছেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ১৮৫৬-৫৭ সনে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন 'বেলোর্মি চূড়ায়' উঠেছিল, "সমাজের গোঁড়ামীর দুর্গ লক্ষ্য করে তখন কামান দাগা হচ্ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না ।" ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দোলনের জন্যেই কেঁপে

উঠলো 'বেঙ্গল আর্মির সিপাহিরা,' সনাতন ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দু ধর্মের মূর্তিমান প্রতীকের দল।' শিক্ষিতরা বুঝেছিল যে "পুরাতন সামন্ততন্ত্র ও তালুকদারী রামরাজ্যে প্রত্যাবর্তন না করে, সম্মুখের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়াই ভালো। ...তার জন্য ইংরেজ শাসকদের কাছে শিক্ষানবীশী প্রয়োজন।" বিদ্রোহীদের 'ধর্মান্ধতা' ও 'কুসংস্কারাচ্ছন্নতাব' জন্য বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিপথে এক ঘোর অন্ধকারযুগের বিকট মূর্তি ভেসে উঠেছে। তাঁদের কষ্টার্জিত লাভটুকু যক্ষের ধনের মতন আঁকড়ে ধরে তাই তাঁরা প্রাণপণে বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন।" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)। বিনয় ঘোষ আরো বলেছেন বুদ্ধিজীবীরা "stood by the British rulers because they had won their battles against the immense resources of reaction mainly with British support." (*Rebellion : 1857*, New Delhi 1957, p. 112) ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা কোন যুদ্ধগুলি জিতেছিল, তার একটা উদাহরণও বিনয় ঘোষ দেন নি !

১২ "The Japanese invaders in China could no doubt claim, if they wished to do so, that by their invasion and aggression. They were helping to forge the national unity of the people of China. And this claim would be obejectively correct. ...The theory of imperialism as a beneficial civilising system for helping forward and training backward peoples into national cosciousness and eventual self-government (what has been termed the theory of 'decolonisation') was originally put forward by a school of socialism savegardes and servants of imperialism like Macdonald..." (R. P. Dutt, *India Today* 1947, pp 249)

১৩. ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের, এমনকি তথাকথিত "প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীদের ও এই আপোষপ্রবণ সুবিধাবাদী চরিত্রটা যে কত ভালোভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল তা দেখা যায়, ১৯১৮ সনে Montegu Chelmsford Report-এ—The politically minded portion of the people of India...are intellectually our children. They have imbibed ideas which we ourselves have set before them...The present intellectual and moral stir in India is no reproach, but rather a tribute to our work." (p. 115)

১২

মহাবিদ্রোহ কি সিপাহি-যুদ্ধ ছিল, না গণবিদ্রোহ ছিল?

অনেক ইংরেজ লেখক মহাবিদ্রোহকে সিপাহি বিদ্রোহ বলেন। তাঁদের মতে সিপাহিরাই ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান শক্তি, তারাই এই বিদ্রোহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং তারাই এটা পরিচালনা করেছিল। ঐ লেখকেরা এটাও প্রমাণ করতে চান যে, ভারত ইংরেজ শাসনে সুখীই ছিল, তাদের এমন কোনো বিক্ষোভ ছিল না—শুধুমাত্র ধর্মান্ধ সিপাহিরা টোটার ব্যাপারে তাদের ধর্মনাশ হবার আশংকায় খেপে গিয়েছিল। ভারতের ইতিহাসজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও অনেকে তাই মনে করেন।[১]

কোনো সন্দেহ নেই যে মিরাটে, দিল্লিতে ও আরো অনেক স্থানে সিপাহিরাই বিদ্রোহ শুরু করেছিল। দিল্লিতেই বেশির ভাগ শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী বিদ্রোহী সিপাহি বাহিনীগুলি সমবেত হয়েছিল এবং ১০ মে থেকে ২০ সেপ্টেম্বরে দিল্লির পতন পর্যন্ত সিপাহিরাই গোটা যুদ্ধটা পরিচালনা করেছিল। যদিও তারা বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল, তারা কোনোদিনই বেসামরিকদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি। সেখানে জনসাধারণ সিপাহিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং সিপাহিদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। এটাই ছিল তখনকার ভারতে স্বাভাবিক, কারণ জনসাধারণের কোনো সংগঠনই ছিল না। সিপাহিরাই ছিল একমাত্র সংগঠিত শক্তি।[২] (দুঃখের বিষয়, সিপাহিরা নিজেদের মধ্য থেকে কোনো হায়দার আলি সৃষ্টি করতে পারেনি।) প্রকৃতপক্ষে, দিল্লির যুদ্ধ সিপাহি যুদ্ধই ছিল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রেও সিপাহিরা নিজেদের দাবি-দাওয়ার জন্যে লড়েনি, তারা লড়েছিল সমগ্র জাতির স্বার্থে, সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করার জন্যে।

বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সিপাহিদের বিক্ষোভ ও দাবিগুলি এবং জনসাধারণের বিক্ষোভ ও দাবিগুলি এক হয়ে গিয়েছিল। সিপাহিরা ছিল জনসাধারণেরই একটা অংশ এবং সিপাহিদের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। অবশ্য সিপাহিদের নিজস্ব কতকগুলি পেশাগত বিক্ষোভও ছিল। ইংরেজ বাহিনীতে সিপাহিদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার অন্ত ছিল না।

সারাজীবন বাহিনীতে কাজ করে ও যোগ্যতা দেখালেও তাদের উন্নতির কোনো আশা ছিল না। একটা নিম্নতম ইংরেজ সৈন্যও তাদের উপর হুকুম চালাতে পারত। তাদের বেতনও ছিল অনেক কম।[৩] এইসব কারণে তারা ১৭৬৪ থেকে ১৮৪৪ সনের মধ্যে ১২ বার বিদ্রোহ করেছিল। ন্যায়সংগত কারণে বিদ্রোহ করার একটা ঐতিহ্য সিপাহিদের মধ্যে সব সময়ই ছিল।[৪]

মহাবিদ্রোহের প্রথম দিকে সিপাহিরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, সিপাহিরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল নিজেদের সংকীর্ণ পেশাগত স্বার্থের জন্যে নয়, তারা বিদ্রোহ করেছিল একটা উচ্চ আদর্শের জন্যেই—তাদের মাতৃভূমিকে বিদেশি শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে। এই মহৎ কাজের জন্যে তারা দলে দলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।[৫] এবং এই সত্যটা বিদ্রোহী সিপাহি ও জনসাধারণের পরম শত্রু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাও বারবার স্বীকার করেছে।

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সিপাহি, জনসাধারণ ও তাদের নেতাদের উপর ড. মজুমদারের ভীষণ আক্রোশ। তাঁর মতে, বিদ্রোহী সিপাহি ও অন্যান্যরা স্বাধীনতার যোদ্ধা মোটেই ছিল না, কোনো প্রকার 'উচ্চ আদর্শে' অনুপ্রাণিত হয়ে তারা বিদ্রোহ করেনি, ('উচ্চ আদর্শের' প্রতি কী অনুরাগ!), লুঠপাট, নিজেদের স্বার্থ, খুন-খারাবিই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এটা প্রমাণ করার জন্যে এই সত্যসন্ধানী ইতিহাসবিদের এতই উৎসাহ যে, তিনি তার উপরে তাঁর গ্রন্থে একটা সম্পূর্ণ অধ্যায়ই লিখে ফেলেছেন। আমাদের একশত বৎসরের ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকে মুক্ত করার জন্যে কি কঠোর পরিশ্রমই না তিনি করেছেন!

ড. মজুমদার একদিকে যেমন আদর্শ বিহীন ভারতীয়দের গুণ্ডামি, ডাকাতি ও নিষ্ঠুরতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি তেমনই ইংরেজদের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিশোধ নেবার কাজের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের আদর্শ দেখতে পেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিকট সাম্রাজ্য-প্রেম আর স্বদেশ প্রেম, একই কথা - উভয়ই 'উচ্চ আদর্শ'।[৬]

যাই হোক, সেই সময়কার ভারতে জনগণের একমাত্র সংগঠিত শক্তিরূপে বিদ্রোহে সিপাহিদের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করা ছিল স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন করা ও শৃংখলা স্থাপন করাই ছিল প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সে নেতৃত্ব গঠন করার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল না। তাই সে কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল।[৭]

দিল্লির যুদ্ধে সিপাহিদের প্রধান অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। যারা এই যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল, তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অন্যান্য বিদ্রোহী এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। লখনৌ, কানপুর, ঝান্সি, বেরেলি প্রভৃতি বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলিতে প্রথম

থেকেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল বেসামরিক নেতাদের হাতে। লখনৌর যুদ্ধে সিপাহিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছিল, তবে জনসাধারণের ভূমিকাও সেখানে কোনো অংশে কম ছিল না।[৮] লখনৌর পতনের পর আরো বহুকাল ধরে অযোধ্যায় যে লড়াই চলেছিল, তা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই ছিল জনযুদ্ধ। যেসব সিপাহি অবশিষ্ট ছিল, তারা গণফৌজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কানপুরের যুদ্ধে জনগণের অংশটাই ছিল প্রধান। ঝান্সিতেও তাই বিদ্রোহ করেই সিপাহিরা ঝান্সি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ঝান্সির লড়াই ছিল সম্পূর্ণ রূপে জনসাধারণের লড়াই।

মহাবিদ্রোহের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রথম থেকেই তার দুটি ধারা —সিপাহিদের বিদ্রোহ ও জনসাধারণের বিদ্রোহ—এক সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।[৯] অনেক ক্ষেত্রে সিপাহিরা আগে বিদ্রোহ করলো, না জনসাধারণ আগে বিদ্রোহ করলো, তা নির্ণয় করা কঠিন। মিরাটে কিভাবে জনসাধারণ সিপাহিদের বিদ্রোহ করতে উত্তেজিত করেছিল এবং সিপাহিদের বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের জনসাধারণ ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে কিভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লিতেও আমরা দেখেছি, সিপাহি ও জনসাধারণ একই সময়ে বিদ্রোহ করেছে। বহুস্থানে এই রকমই ঘটেছিল। কোনো স্থানে সিপাহিরা আগে বিদ্রোহ করেছিল ও জনসাধারণ পরে তাতে যোগ দিয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে, যেমন মুজাফর নগর, সাহারানপুর, বান্দা, করনাল, ফরাক্কাবাদ, বেরিলি, এটোয়া, সাহাবাদ, হামিরপুর, ফতেপুর, সাগর, বাদাউন ইত্যাদি এলাকায় জনসাধারণই প্রথম বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিল এবং জনসাধারণই তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সিপাহিদের বাধ্য করেছিল।

সরকারি রিপোর্ট এবং কেই, ম্যালিসন ফরেস্ট, বল্ প্রমুখ ইতিহাসজ্ঞদের বইতে মহাবিদ্রোহের এই গণ-চরিত্রটাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ সম্বন্ধে সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে: "মিরাট ও বেরিলি ডিভিশনের কতকগুলি জেলাতে সিপাহিদের বিদ্রোহের ভয় থেকে জনসাধারণের বিদ্রোহের ভয়ই ছিল কর্তৃপক্ষের নিকট বেশি। প্রথম বিপদ এসেছিল বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়গুলি থেকে; সিপাহিরা তখনো বিশ্বস্তই ছিল।···সাহারানপুর, মুজাফর নগর, মোরাদাবাদ ও বাদায়ুনে তা বিশেষভাবে ঘটেছিল।···বেসামরিক শ্রেণীদের দ্বারা বিদ্রোহের এই উদাহরণ স্থাপিত হওয়ার পর সিপাহিরা তাতে যোগ দিয়েছিল।···সিপাহিরা যখন অন্তত বাহ্যত শান্ত ছিল, তখন জনসাধারণের উত্তেজনা চারদিকে ফেটে পড়ছিল—এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সবল দুর্বলের বিরুদ্ধে, পরাজিত প্রতিবাদীর এবং বিজেতাবাদীর বিরুদ্ধে। তাদের সর্বাধিক আনন্দের বিষয় ছিল, ইংরেজ বিচারালয়ের রায়গুলিকে বদ্ধমুষ্টি দেখিয়ে উল্টিয়ে দেওয়া। জমিদারদের

নীচশ্রেণীর সঙ্গে সমান করে দেওয়া হয়েছিল।[১০]

অযোধ্যা দোয়াব, এলাহাবাদ, বারাণসী, মিরাট, মথুরা এবং আরো অনেক জেলাতে জনগণের বিদ্রোহ এমন অকস্মাৎ ও দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ইংরেজরা কোনোদিন তা কল্পনাও করতে পারেনি এবং এমন অদ্ভুত ঘটনা কি করে সম্ভব হলো, তাও তারা বুঝতে পারেনি। একমাত্র বানিয়া ও মহাজন ছাড়া, সব শ্রেণীর লোকই সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানালো। মথুরার ম্যাজিস্ট্রেট মর্নাইল বলেছেন, ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়ে যাবার ফলে জনসাধারণ খুব সন্তুষ্টই হয়েছিল, স্বাধীনতার উত্তেজনা তারা বেশ উপভোগ করছিল, জীবন তাদের আশান্বিত হয়ে উঠেছিল।[১১]

বাদাউনে সমগ্র জনসাধারণ একসঙ্গে বিদ্রোহ করেছিল এবং সিপাহিরা বিদ্রোহ করে চলে যাবার পরই সমস্ত ক্ষমতা কৃষকদের হাতে চলে গিয়েছিল।[১২] মথুরাতে সিপাহিদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেলাটাই বিদ্রোহ করলো।[১৩] গাজিপুরে জনসাধারণ হাজারে হাজারে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের নিকট থেকে ইংরেজ সরকার সব থেকে বেশি বাধা পেয়েছিল। ফতেপুরে ম্যাজিস্ট্রেট শেরার ফতেপুর ত্যাগ করার পর যখন গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় খুঁজছিলেন, সেখানে তখন ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের মতো অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন।[১৪] সাহাবাদ জেলায় সমগ্র জনসাধারণ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল ও তারা সব থেকে বেশি দৃঢ়তা দেখিয়েছিল, এবং সব থেকে বেশি দিন যাবত লড়েছিল। বান্দাতে জনসাধারণই প্রথম বিদ্রোহ করেছিল ও নবাবকে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। বান্দায় ইংরেজ-প্রতিনিধি মেইন বলেছিলেন, আর কোনো বিপ্লব বোধ হয় এর চাইতে এত দ্রুত ও এত সম্পূর্ণ ভাবে ঘটেনি। অনেক ক্ষেত্রে প্রলোভন দেখিয়ে নীচ জাতির লোকদের ইংরেজরা হাত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারাও ইংরেজদের প্রতি ভীষণ শত্রুতা দেখিয়েছিল।

কৃষকরা অস্ত্রেশস্ত্রে তাদের শত্রুদের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট হলেও তারা সেই কারণে একেবারেই নিরুৎসাহ হয়নি; হাতের কাছে তারা যা পেয়েছিল তাই নিয়েই তারা শত্রুকে আক্রমণ করেছিল। "বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে তলোয়ার ও ম্যাচলক বন্দুকের অভাব হয়ে পড়েছিল। সুতরাং কৃষকরা বল্লম ও কাস্তে অস্ত্র রূপে গ্রহণ করলো। তারা লোহা-বাঁধানো লাঠি ও লাঠির সঙ্গে কসাইয়ের ছুরি বেঁধে অস্ত্র তৈরি করে নিয়েছিল। তারা নিজেদের একজন রাজা নির্বাচন করে সব সরকারি আদেশ ও সরকারি কর্মচারিদের অগ্রাহ্য করেছিল। আর কোনো বিপ্লব এত দ্রুত বিস্তার বা এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করেনি।"[১৫]

বিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরেজরা ধরে নিয়েছিল যে এটা কেবলমাত্র সিপাহিদের একটা বিদ্রোহ। জুলাই মাসে লণ্ডন-টাইম্‌স লিখেছিল যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের "তিন কোটি চার লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা মনে করি না যে

৫০, হাজারের বেশি লোক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে।"[১৬]

এর দুই মাস পরে এই প্রসঙ্গেই রবার্টস্ (যিনি পরে ফিল্ড-মার্শাল লর্ড রবার্টস্ হয়েছিলেন) যখন একটা বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন বুলন্দসর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন—"বিদ্রোহ কেবল মাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ—টাইম্স এইসব কি বাজে কথা লিখছে—'what nonsense The Times talks!' এই জেলাতে কোনো সেনা বাহিনীই ছিল না—মাত্র ৬০ জন সিপাহি একটা ক্যাম্পে ছিল, তথাপি এই জেলা অন্যান্য জেলাগুলির মতোই খারাপ ব্যবহার করেছে। প্রায় সমস্ত পুলিশ ও বেসামরিক কর্মচারিই বিদ্রোহের একেবারে প্রথম দিকেই তাতে যোগ দিয়েছে এবং অনেক রাজাও আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পতাকা তুলে ধরেছে।[১৭]

ম্যালিসন বলেছেন, ভারতের চারটা বৃহৎ প্রদেশে—অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড এবং সাগর ও নর্মদা অঞ্চলে জনসাধারণের বেশির ভাগই বিদ্রোহ করেছিল। পশ্চিম বিহারে, পাটনা, আগ্রা, মিরাটে ডিভিসন গুলিতে জনসাধারণ সর্বত্র একই সময়ে বিদ্রোহ করেছিল।[১৮]

ফরেস্ট লিখেছেন, ৪ঠা থেকে ১৪ জুন এই ১০ দিনের মধ্যে ইংরেজ শাসন অযোধ্যা থেকে একটা স্বপ্নের মতো বিলীন হয়ে গেল, কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকলো না; সিপাহি ও জনসাধারণ একই সঙ্গে তাদের পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে ফেলে দিল।[১৯] বেই বলেছেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমস্ত গ্রামবাসী আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।[২০] ক্যানিং বলেছিলেন, আমি মনে করি মধ্যভারত আমাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, তাকে আবার জয় করতে হবে।[২১]

রেভারেণ্ড কেভ ব্রাউন লিখেছিলেন, ১ হাজার মাইল দৈর্ঘ্যে ও ৫০০ মাইল প্রস্থে মাত্র কয়েক সহস্র সিপাহি ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটাতে পারত না এবং তিনিও এই গণযুদ্ধের দিকটাই বারবার তুলে ধরেছেন।[২২] রেভারেণ্ড ডাফ্ টাইমসকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন, এটা একটা সিপাহিদের বিদ্রোহ মাত্র বলে যাঁরা দূর থেকে ভাবছেন, তাঁরা মারাত্মক ভুল করছেন, তাঁরা কতকগুলি স্বকল্পিত ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা চালিত হচ্ছেন। বর্তমান সংকট যে কত গভীর, তা তাঁদের ধারণার বাইরে; তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে এটা সমস্ত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের একটা সশস্ত্র গণবিদ্রোহ ও সিপাহিদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জিতলেই এ বিদ্রোহ শেষ হবে না।[২৩]

যখন বসিরহাটের যুদ্ধের পর লেফটানেন্ট কর্নেল টাইলার তাঁর বাহিনী নিয়ে লখনৌর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তিনি লিখেছিলেন, প্রত্যেকটি গ্রামে তাঁকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। কৃষকরা জমিদারদের নেতৃত্বে লড়েছিল। তাঁকে এই কৃষকদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করতে হচ্ছে। প্রায়

৫০০-৬০০ লোকের এই বাহিনীগুলি সর্বদাই তাঁকে ঘিরে রাখে।[২৩]

পশ্চিম বিহার এবং ছোটনাগপুরের জনসাধারণই প্রথম থেকেই বিদ্রোহের অগ্রভাগে ছিল ও প্রায় দু'বছর ধরে তারা লড়েছিল। মির্জাপুর থেকে শুরু করে গয়া, গাজিপুর, সাহাবাদ, সাঁওতাল পরগনা, সম্বলপুর, সিংভূম, সেরাই-কেল্লা খারসাভান, পালামৌ পর্যন্ত এই বিস্তৃত এলাকায় গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য স্থানের মতো এসব অঞ্চলেও বিদ্রোহী জনসাধারণ বিদেশি শাসন যন্ত্রটা যেমন ভেঙ্গে দিয়েছিল, তেমনি ঔপনিবেশিক শোষণের সংস্থা-গুলিকেও (নীল ও আফিমের ফ্যাক্টরি ও গুদামগুলিকে) ধ্বংস করে দিয়েছিল।[২৫] এইসব ক্ষেত্রেই ভারতে ইংরেজদের মূলধন প্রথম নিয়োজিত হয়েছিল। নীলকুঠি স্থাপন করে ইংরেজরা ভারতীয় কৃষকদের নির্মম ভাবে শোষণ করত ও তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাত।[২৬] কুমার সিং বিদ্রোহ করার পরই কৃষকদের হুকুম দিয়েছিলেন—এইসব কুঠি ও গুদামগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

অযোধ্যা ও অন্যান্য স্থানের গণবিদ্রোহগুলিকে বিশ্লেষণ করে কেই বলেছিলেন, বাইরের কারো প্ররোচনার ফলে জনসাধারণের বিদ্রোহ ঘটেনি, "গ্রামের অভ্যন্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তাই গ্রাম্য-সমাজের উপর চলতে শুরু করেছিল এবং তার ফলে এক মুহূর্তে এই বিস্তৃত অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছিল।"[২৭] যদি প্ল্যান করে এই বিদ্রোহ ঘটানো হতো, তাহলে বোধ হয় বিদ্রোহের প্রকৃতি এত শক্তিশালী ও ভয়ংকর হতো না।[২৮] ঠিক এই কারণেই ডিসরেলি এই বিদ্রোহকে বলেছিলেন 'একটি মহান ও প্রচণ্ড বিদ্রোহ'।[২৯]

মধ্যভারতে জেনারেল রোজ যখন তাঁর অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে খাদ্যদ্রব্য যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হচ্ছিল। সর্বত্র জনসাধারণ ইংরেজদের প্রতি 'বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন' ছিল ও তাদের থেকে অনেক দূরে থাকত। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্যে রোজকে নির্ভর করতে হতো ভূপালের বেগম ও বোম্বাই সরকারের উপর। ঝান্সির যুদ্ধের সময় ঐ রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণ তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। তাঁতিয়া টোপির গেরিলা অভিযানের সময়ও তাঁকে খাদ্য, খবরাখবর, সৈন্য ইত্যাদি দিয়ে সর্বতো ভাবে জনসাধারণই সাহায্য করেছিল। কুমার সিং-ও পশ্চিম বিহারের জনসাধারণের নিকট থেকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এইরূপ সহযোগিতাই পেয়েছিলেন।

অযোধ্যার গণবিদ্রোহ যেসব থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কেবলমাত্র লখনৌর যুদ্ধের সময় বিদ্রোহী পক্ষে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। তার মধ্যে বিদ্রোহী সিপাহিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার; আর ৮৫ হাজার ছিল তালুকদারদের লোকজন ও ভলান্টিয়ারের দল। অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ, বিশেষ করে

কৃষকরা, সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ব্যাপক গণ-বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর নিম্নলিখিত বিখ্যাত বর্ণনাটি, দুঃখের বিষয় ড. মজুমদারের চোখে পড়েনি। বর্ণনাটি হলো এই :

"যখনই শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, তখনই তাদের পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে ও তাদের কামানগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও তারা আবার জমায়েত হচ্ছে ও পুনরায় যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে। একটা শহর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা শহরে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ··একটা জেলার ইংরেজ সৈন্যরা যেই এসে শান্তি স্থাপন করছে, তখনই আর একটা জেলায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমনাগমনের জন্যে একটা বড় রাস্তা মুক্ত করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এক বৎসরের জন্যে তাতে গমনাগমন বন্ধ থাকছে একটা অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের উৎখাত করা মাত্রই দ্বিগুণ, তিনগুণ শক্তি নিয়ে তারা আর একটা অঞ্চলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। যে মুহূর্তে একটি দ্রুতগামী বাহিনী শত্রুদের ভেদ করে চলে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে তারা পশ্চাৎভাগ দখল করে বসছে শত্রুবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের ক্ষতি মুহূর্তের মধ্যে পূরণ হয়ে যাচ্ছে।"[৩০]

বিদ্রোহী অঞ্চলগুলি ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলেও জনসাধারণ বিদ্রোহে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল। আমরা দেখেছি গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপালে জনসাধারণ কিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং কিভাবে সেখানকার ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণী ইংরেজদের সাহায্যে সেই বিদ্রোহগুলিকে দমন করেছিল। হায়দ্রাবাদেও জনগণের বিস্ফোরণ হওয়ার মতো অবস্থা তৈরি ছিল। ইংরেজ শাসকরা ভালো ভাবেই জানত যে, হায়দ্রাবাদ একটি আগ্নেয়গিরিতে পরিণত এবং অনেকবার সে লাভা উদগীরণ করতে উদ্যত হয়েছিল।[৩১]

১৮৫৭ সনের গণবিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্যটা বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে অসুবিধা হলেও, তখনকার সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদভোগী রাজা-মহারাজা-জমিদার ও মহাজনরা তাদের শ্রেণী স্বার্থের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা (class instinct) সহজেই বুঝতে পেরেছিল। 'হিন্দু' নামধারী সমসাময়িক বাঙালি লেখকটি তাঁর বইতে বহু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, এই গণ-বিদ্রোহের ফলে জমিদাররা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল এবং তাঁরা আতংকিত হয়ে উঠেছিল যে, বিদ্রোহীরা তাদের ধনদৌলত সবকিছু ধ্বংস করে দেবে এবং সব গণবিদ্রোহে যা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাই ঘটবে—ধনী-দরিদ্র, ভদ্রলোক-ছোটলোকদের মধ্যে বৈষম্য ঘুচে যাবে; ইয়োরোপীয়দের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহটাকে জনসাধারণ জমিদারদের সম্পত্তি ও ধনদৌলতের বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধে পরিণত করছে।

"যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তি জমিদারদের প্রতি দৃঢ়ভাবে এ পর্যন্ত বিমুখ ছিলেন, তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন যে, এরূপ বিষম বিপদের (১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ)

বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিসের অতি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও রাষ্ট্রনৈতিক দক্ষতাপূর্ণ চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথার ব্যাপক প্রসারণ।/ সকল উচ্চপদ ও ঐশ্বর্যকে সমতল করে দেওয়া দেওয়া যদি বিপ্লবের চরিত্র হয় তাহলে সিপাহি বিদ্রোহে এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। .. ইয়োরোপীয় ও খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে সিপাহিদের এই যুদ্ধকে ও জমিদারদের ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপাহীদের যুদ্ধে পরিণত করা হয়েছিল।/ যদিও দেশীয় রাজাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদাতিক ব্যবহার খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না,...তথাপি এই সমস্ত রাজা তাদের সত্যকারের প্রবৃত্তি (true instinct) ও বিশ্বাসের বশে, এমনকি, যখন ইংরেজদের ভাগ্যবিশেষ সুপ্রসন্ন ছিল না, তখনো সেই ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেছিল।'[৩১]

ফরেস্টও এই কথাই বলেছিলেন: "দেশীয় রাজারা খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন যে,...তাঁদের ক্ষমতা ও স্বার্থগুলি সংরক্ষণ করা, ব্রিটিশ শাসন রক্ষা করার সঙ্গে অভিন্ন।"[৩২]

নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখবার জন্যেই দেশীয় রাজারা, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকলেও এবং তাদের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হলেও, নিজেদের দেশের লোকের বিরুদ্ধে বিদেশি শাসকদের পাশেই এসে দাঁড়ালেন। নিজামের কাছ থেকে অন্যায় করে ইংরেজরা কিছুদিন পূর্বে বেরার প্রদেশ কেড়ে নিয়েছিল। সিন্ধিয়াকেও এইভাবে তাঁর রাজ্যের কতক অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের মতো ভারতের এই দুটি সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যেও জনসাধারণ বিদ্রোহের পক্ষেই ছিল। এমনকি, এসব রাজ্যের দরবারের একটা প্রতি-পত্তিশালী অংশও বিদ্রোহের অনুকূলে ছিল। আবার এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দুটি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, হায়দ্রাবাদের সালারজঙ্গ ও গোয়ালিয়ারের দিনকর রাও, দু'জনেই ছিলেন ইংরেজ সরকার কর্তৃক মনোনীত। প্রভুভক্তিতে এঁরা ছিলেন অদ্বিতীয় এবং নিজাম ও সিন্ধিয়ার দরবারে কড়া নজর রেখে ইংরেজের প্রতি যে বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলেন, তার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। অথচ এই দু জন রাজার মধ্যে যদি একজনও বিদ্রোহে যোগ দিতেন, তাহলে ইংরেজ সরকারের জিতবার খুব কমই আশা ছিল। লর্ড ক্যানিং এর ঠিক সেই আশঙ্কা ছিল বলেই তিনি বলে-ছিলেন: "যদি সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দেন, তাহলে কালকেই আমাকে তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।"

তাছাড়া, ভারতীয় রাজাদের অনেককে ইংরেজরাই গদিতে বসিয়েছিল; ইংরেজ রাজত্বের অস্তিত্বের সঙ্গেই তাদেরও ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রজাদের দিক থেকেও যেমন তাঁদের ভয় ছিল, আবার বিদ্রোহ সফল

হলে তাঁদের এই আশঙ্কাটাও ভিত্তিহীন ছিল না।

ইংরেজ শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে, সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের শত্রু নয়। বিদ্রোহের সময় তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, কিভাবে রাজা-জমিদাররা (ক্যানিং-এর কথায়) "প্লাবনের বিরুদ্ধে একটা মজবুত বাঁধের মতো আমাদের রক্ষা করেছিল, এবং এই বাঁধ না থাকলে এক ঢেউতে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।" বিদ্রোহের পর ইংরেজরা তাদের রাজস্বের অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের রক্ষাকবচ হিসেবে এই বাঁধটাকে আরো মজবুত করে গড়ে তুলেছিল। শুধু রাজাদেরই নয়, জমিদারদেরও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও অযোধ্যার তালুকদারদের দুই-তৃতীয়াংশের তালুকদারি তো ফিরিয়ে দেওয়া হলোই, উপরন্তু তাঁদের ১৮৫৬ সনের চাইতে অনেক ভালো, শর্তও দেওয়া হলো। তাছাড়া জমিদারি প্রথা, সমগ্র ভারতে চালু করা হবে কিনা, এই প্রশ্ন "১৮৫৮ সন থেকে ১৮৬৬ সন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে খুবই আলোচিত হয়েছিল।"[৩৩] সম্বলপুরে ও মধ্যভারতে, বিশেষ করে বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে মালগুজারি প্রথা প্রবর্তিত হলো। এমনকি পাঞ্জাবের অনেক স্থানেও যেসব কৃষক ছিল জমির স্বত্বাধিকারী, কলমের এক খোঁচায় তারা হয়ে গেল উঠবন্দী প্রজা।

১৮৫৭-৫৯ সনের মহাবিদ্রোহ কী বিরাট আকার ধারণ করেছিল। সে সম্পর্কে ড. মজুমদারই এক স্থানে বলে ফেলেছেন: "সব রকমের গলদ থাকা সত্ত্বেও সিপাহীরা ও ভারতীয় বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যার জোরে ও অনুকূল অবস্থার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য একটা সুতোয় ঝুলছিল এবং তার প্রায় যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। যদি অদৃষ্ট ভারতীয়দের প্রতি সামান্য একটুও অনুকূল হত, তাহলে ফলাফল হয়ত অন্যরকম হত।"[৩৪] এটা যদি কেবলমাত্র সিপাহিদের ও সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহই হতো, যদি একটা বিরাট জাতীয় গণবিদ্রোহ না হতো, তাহলে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যে এরূপ দুরবস্থা হতো না, সহজেই তা অনুমেয়।

মহাবিদ্রোহের গণপ্রকৃতি খুবই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যখন বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যাগুলি পরীক্ষা করা যায়। অবশ্য এটা ঠিক যে, হতাহতদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া খুবই কঠিন। তাহলে, মোটামুটি একটা হিসাব করা সম্ভব। ১৮৫৭ সনে ভারতে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৪ হাজার, তার মধ্যে বেঙ্গল-আর্মির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার। মাদ্রাজ-আর্মি ও বম্বে আর্মি একেবারেই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, মোটামুটি এক লক্ষ বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহী সিপাহিদের মধ্যে আবার সকলেই লড়াই করেনি; তাদের

মধ্যে অনেকে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। বলা যেতে পারে যে মোটমাট ৬০ থেকে ৭০ হাজার বিদ্রোহী সিপাহি যুদ্ধে লড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে লড়েছিল কয়েক লক্ষ লোক, সুতরাং যোদ্ধাদের মধ্যে সিপাহিদের চাইতে জনসাধারণের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি।

ইতিহাসবিদ হোমসের মতে, অযোধ্যায় দেড় লক্ষ বিদ্রোহী প্রাণ দিয়েছিল, তার মধ্যে সিপাহির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। মহাবিদ্রোহের যুদ্ধগুলির তীব্রতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, হোমস হতাহতের সংখ্যা কম করেই ধরেছেন। রুশ দেশে যেখানে সেবাস্তোপোল অবরোধের জন্যে মিত্র শক্তিগুলিকে নিয়োগ করতে হয়েছিল ২৬ হাজার সৈন্য, সেখানে লখনৌ অবরোধের জন্যে ইংরেজরা নিয়োগ করেছিল ৩৬ হাজার সৈন্য। যেখানে পলাশির যুদ্ধে ভারতীয় পক্ষে নিহত হয়েছিল ১ হাজার, বকসার যুদ্ধে ২ হাজার, আসইর যুদ্ধে ১২ হাজার, ফিরোজসার যুদ্ধে ৭ হাজার, সোব্রাওয়নের যুদ্ধে ৭ হাজার, চিলিয়ান ওয়ালার যুদ্ধে ৫ হাজার, গুজরাটের যুদ্ধে ৫ হাজার,—সেখানে মহাবিদ্রোহের যুদ্ধগুলিতে ভারতীয় নিহত হয়েছিল কারো মতে ২ লক্ষ, কারো মতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার; আবার কারো মতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। ইংরেজ পক্ষের হতাহতের সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন। কিন্তু তাদেরও যে ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাবিদ্রোহের গণচরিত্র ও তার বৈপ্লবিক প্রকৃতি ইংরেজি শিক্ষায় ও শাসক শ্রেণীর ভাবধারায় লালিত পালিত ইতিহাসজ্ঞ ও ও 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীদের চোখে না পড়লেও, অন্তত একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ মহাবিদ্রোহের এই তাৎপর্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ড. শশীভূষণ চৌধুরী।

ড. চৌধুরী তাঁর দুটি মূল্যবান গ্রন্থে (*Civil Resistance During the Mutiny* এবং *Theories of the Mutiny*) বহু স্থানীয় সরকারি নথিপত্র ও রিপোর্টগুলি অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন (যা পূর্বে বড় একটা কেউ করেন নি) যে, মহাবিদ্রোহ মূলত একটা ব্যাপক গণবিদ্রোহ ছিল। তিনি আরো দেখিয়েছেন, কিভাবে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের দেশকে বিদেশি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্যে নির্ভীকভাবে বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইতে নেমেছিল এবং দিল্লি, লখনৌ, কানপুর, ঝান্সির পতনের পরও বহুদিন ধরে তারা কী বীরত্বের সঙ্গে নিকৃষ্ট অস্ত্র নিয়েই আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়েছিল।[৩৫]

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে নিজেদের উদ্যোগে জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করাটাই হয়েছিল সব থেকে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা। তাদের শ্রেণী-চেতনা যে স্তরেই থাকুক না কেন, এমনকি তা সামন্ত যুগের হলেও, তারা মহাবিদ্রোহ

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত তো করেইছিল, উপরন্তু ভারতের মরণোন্মুখ সামন্ততন্ত্রকেও শঙ্কিত করে তুলেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, মহাবিদ্রোহের মতো এতবড় একটা গণযুদ্ধ সারা ভারতের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি, পূর্বেও নয়, পরেও নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-দের এর চেয়ে বড় বিরাট গণযুদ্ধের সম্মুখীন আর কোনো কালে হতে হয়নি। ভারতই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভ ; এই স্তম্ভ ধ্বংস হয়ে গেলে দুনিয়ার ইতিহাস অন্য রকমের হতে পারত।

মহাবিদ্রোহের সর্বপ্রধান তাৎপর্য হলো এই যে, ভারতের জনসাধারণ, গ্রামের সাধারণ কৃষক ও শহরের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে এই বিরাট স্বাধীনতার যজ্ঞে নিঃশঙ্কচিত্তে বিনা দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। ইতিহাসের এরকম বৈপ্লবিক মুহূর্তগুলিকে লক্ষ্য করেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

"আজি লক্ষ পরানে
শঙ্কা না মানে,—
না রাখে কাহারও ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

লেনিনের কথায় বলতে হয়, যেখানে জনসাধারণ আছে শতে শতে নয়, হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে, সেখানেই আছে প্রকৃত রাজনীতি। আর মাও-সে-তুঙ' এর কথায়—বন্দুকের নল থেকেই বেরিয়ে আসে প্রকৃত রাজনীতি। ভারতের জনসাধারণ তাদের ইতিহাসে সামগ্রিক ভাবে এই একটি বারই প্রকৃত রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

নি র্দে শি কা

১. ড. রমেশ মজুমদার কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন—"The people's revolt was the effect, and not the cause of the mutiny." নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের কাকতালীয় কূটতর্কের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়—তাল পড়ে ধুপ করলো, না ধুপ করে তাল পড়লো। বাংলার আধুনিক 'প্রগতিশীল'

বুদ্ধিজীবী বিনয় ঘোষ বলেছেন : "একটার পর একটা রাজ্য জয় করে ইংরেজরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছে এবং দেশে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার মতলব করছে, এই রকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে সিপাহিরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

২. মার্কস মহাবিদ্রোহের উপর তাঁর প্রথম চিঠিতেই লিখেছিলেন : "প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় জনগণের আনুগত্য নির্ভর করছে এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীর বিশ্বস্ততার উপর, যে বাহিনী গড়ে তুলে বৃটিশরাজ ভারতীয় জনগণের জন্য এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে বসল।" (প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, পৃ ৪১)

৩. "Though he might give the signs of the military genius of a Hydar, he knew that he could never attain the pay of an English sub-altern, and the rank to which he might attain, after some thirty years of faithful service, would not protect him from the insolent dictation of an ensign from England." (Holmes, p. 49)

৪. "English writers must acknowledge with humiliation that if mutiny is ever justifiable, no stronger justification could be given than that of the sepoy troops." (Lecky, *The Map of Life*, p. 98)

৫. জুলাই মাসে ('৫৭) পার্লামেন্টে আলোচনার সময় ডিসরেলি বলেছিলেন : "The sepoys were not so much the avengers of professional grievances as the exponents of general discontent."

৬. "Indeed the greed of the sepoys carried them to such an excess that many of them descended to the level of gangsters....Greed was the besetting sin of the mutineers. The lofty sentiments of patriotism and nationalism with which they were credited, do not appear to have any basis in fact. As a matter of fact, such ideas were not yet familiar, to Indian minds. ...On the other hand, the British were inspired by the patriotic zeal for retaining their empire against the Indians. ...It is the painful duty of a sober historian to debunk them [the sepoys, the rebels and their leaders] from the high pedestal which they have occupied for a century." (Mazumdar, *The*

Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 pp. 275-76)

৭. এক মাসের মধ্যেও যখন সিপাহিরা নেতৃত্ব গঠন করতে পারলো না, তখন মার্কস হতাশ হয়ে লিখেছিলেন, "বিদ্রোহী সৈন্যদের যে একটা এলোমেলো দঙ্গল স্বীয় অফিসারদের খুন করে শৃঙ্খলার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সেনাপত্য অর্পণ করার মতো কাউকে খুঁজে পায়নি, তারা নিশ্চয়ই এমন একটা দল, যাদের কাছ থেকে গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আশা সবচেয়ে কম।" (ঐ, পৃ. ৪৫)

৮. '৫৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে লখনৌ ও কানপুরের মধ্যবর্তী মিয়াগঞ্জে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ৮ হাজার বিদ্রোহী যোদ্ধাদের মধ্যে সিপাহিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজার, আর বাকি ৭ হাজার ছিল গ্রামের কৃষক। প্রায় একই সময়ে সুলতানপুরে যে যুদ্ধ হলো, তাতে বিদ্রোহী পক্ষের প্রায় ২৫ হাজার পদাতিক ও ১,০০ অশ্বারোহীর মধ্যে সিপাহিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ হাজার, অন্যরা সকলেই কৃষক (Malleson, vol. II, p. .31)। "সমস্ত অঞ্চল হতে অগণিত সংখ্যায় কৃষকরা লখনৌ শহরের দিকে ধাবিত হয়েছিল এবং ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মৃত্যুপণ যুদ্ধে সকলেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।" (Ball, vol. II, p. 2.1

৯. '৫৭ সনের বিদ্রোহ যে মূলত কৃষক বিদ্রোহ ছিল, এই সোদা কথাটা ভারতীয় পণ্ডিতদের বুঝতে অসুবিধা হলেও, তখনকার ভারতের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা বড়লাট ক্যানিং বিদ্রোহের প্রথমদিকে তা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন – "[The mutiny which] was little more than a military revolt, was fast growing into a wide-spread and implacable feud between the agricultural classes and their rulers." (S. B Chaudhuri, *Theories of the Indian Mutiny*, p. 1.)

১০ *Narrative of Events Attending the outbreak of Disturbances and the Restoration of Authority in all the Districts of North-West Provinces in 1857 58.* তথ্যানুরাগী ড. মজুমদার এই রিপোর্ট অথবা *Further Papers of the Parliaments*-এর কোনো উল্লেখই করেন নি! "...if the Mutiny had not extinguished the local authority, the civil population would not have dared to revolt." (*British Paramountcy* etc, p. 501)—ড. মজুমদার যখন এই ধরনের ইতিহাস লিখছিলেন, তখন তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন যে '৫৭ সনের পূর্বে সিপাহি বিদ্রোহ ছাড়াই জনসাধারণ ৫০ বারেরও বেশি বিদ্রোহ করেছিল।

১১. Thornhill, *Personal Adventures* etc., pp. 114-16

১২. Kaye, vol. III, p. 280

১৩ *Narrative of Events*, vol. I, p. 93

১৪ Mando and Sherer, vol I, p. 130

১৫. *Narrative of Events* etc, no. 405 of 1858 by F. D. Mayne, dated 4-9-1858.

১৬ টাইমস্-এর এই কথাটাকে শেষ কথা বলে ধরে নিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে ড. মজুমদার বলেছেন—এই দেখো, একে কি করে জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায়? (*Sepoy Mutiny* etc, p. 22)। একমাত্র বেরিলি শহরেই যে ৫০ হাজারের বেশি সাধারণ লোক যুদ্ধ করেছিল—এই ধরনের অসংখ্য প্রাথমিক তথ্যগুলিও ড. মজুমদার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। বিদ্রোহের জাতীয় চরিত্র ও গণচরিত্রকে অস্বীকার করার পর মুহূর্তেই ড. মজুমদার বলেছেন: "গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের বিদ্রোহে যোগ দেবার ফলে অধিকাংশ বিদ্রোহীদের বেছে বেছে বার করতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটরা সব গ্রামাঞ্চলগুলিকে আগুণ দিয়ে ভস্মীভূত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, গ্রামাঞ্চলের সকল মানুষই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল।" (ঐ পৃ ২১৭)

১৭. Roberts, *Letters* etc p. 75, *Friends of India* (17 Sept. 1857) টাইমসের উক্তির প্রতিবাদে লিখেছিল—"The assertion by the *Times* is not borne out by facts. ...the present rebellion is evidently of the people."

১৮ "In four great provinces of our Empire in Oudh, in Rohilkhand, in Bundelkhand, and in Sagar and Narbada—the great bulk of the people rose against British rule. In western Bihar, in many districts of the Patna Division, in Agra division, in parts of Meerut division the rising of the people were almost simultaneous in point of time." (Malleson, vol. III, p. 487)

১৯. "In 10 days (4th to 14th June) English administration in Oudh vanished like a dream, leaving not a wreck behind. The troops mutinied and the people thread off the allegiance; but there was no ravage and no cruelty." (Forrest, *History* etc, vol. I, p. 217)

২০. "Not only in the districts beyond the Ganges but in

there lying in between the two rivers, the rural population had risen···and soon, there was scarcely a man of either faith who was not arrayed against us." (Kaye, vol. II, p. 195)

২১. "I look upon upon central India as gave, ànd to be reconquered." (Lord Canning)

২২. Cave-Brown, pp. 116, 141-42

২৩. Duff, *Letters on India*, no. XV, Nov. 20, 1857; "and it is the fact it is not a mere 'military revolt' but a *rebellion*—a revolution—which alone can account for the little progress hither to made in extinguishing it, and on the same time precludes any reasonable hope of its early complete suppression." (*Ibid*, no. XVI Dec. 10. 1857)

২৪. Ball, vol. II, p. 21

২৫. ড. মজুমদার আদিবাসীদের এই যুদ্ধগুলিকে গণযুদ্ধ বলতে রাজী নন। অন্যান্য বিদ্রোহী অঞ্চলে জনযুদ্ধের স্থানে তিনি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তা না দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, এগুলি হচ্ছে পাহাড়ি জাতিগুলির চিরাচরিত কতকগুলি দাঙ্গাহাঙ্গামা মাত্র, তাকে রাজনৈতিক আখ্যা দেওয়া 'অতিশয়োক্তি': "The Rebellion in these hilly regions was no doubt of a 'popular character' but there was nothing new in it. They had similarly rebelled many times before, and in several cases, as in Sambalpur, the outbreak in 1857 were mere legacies of the past. To describe it as 'a popular war' fought with the passions roused up by deeply stirred 'political sentiment' can only be regarded as hyperbole." (*British Paramountcy etc*, p. 554)। ড. সেন বলেছেন, এগুলি ছিল 'অসভ্য জাতিগুলির' (Primitive tribes) মাত্র একটা ছোট ও বিক্ষুব্ধ অংশের বিদ্রোহ। (*Eighteen Fifty-Seven*, p. 409) মুখে তারা যতই মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, উচ্চ আদর্শের কথা বলুন না কেন, অসতর্ক মুহূর্তে বুদ্ধিজীবীদের দম্ভ ও জাত্যাভিমান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

২৬. প্রমোদ সেনগুপ্ত, 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ' দ্রষ্টব্য।

২৭. Kaye, vol. II, p. 234

২৮. *Ibid*, p. 256

২৯. ড. মজুমদার ও সেন এইসব হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক গণবিদ্রোহগুলির উল্লেখ খুব সামান্যই করেছেন এবং যেটুকুও বা করেছেন, তা বিকৃতভাবেই করেছেন। ড. মজুমদার দিল্লি, লখনৌ, বিশেষ করে রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহগুলিকে কষ্টকল্পিত ভাবে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। সর্বত্র, বিশেষ করে রোহিলখণ্ডে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেছিল, এ সবগুলি ছিল কতকগুলি গোঁড়া ধর্মান্ধ লোকের কাণ্ডকারখানা। (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজেরা কিভাবে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করেছিল এবং কিভাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল আমরা অন্যত্র তা আলোচনা করেছি।) ড. মজুমদার বলেছেন, "সাহাবাদের বিদ্রোহের চরিত্র রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।" (*British Paramountcy*, etc. p. 552) সাহাবাদে—যেখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো চিহ্নই ছিল না—সেখানেও গণ-বিবেদ্রোহকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার এই অপপ্রচেষ্টা মানসিক অসাধুতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

৩০. Duff, *Indian Rebellion*, p. 223

৩১. "Every eye was turned towards Delhi and Lucknow and news of every kind was eagerly sought and paid for. Di‹astrous rumours of the wildest kind, hostile to the British Government were prevalent and always acceptable to the fanatical and warlike classes of population, letters of the most treasonable and seditions character were intercepted from Aurangabad, Bhupal, Ahmedabad, Belyaum and Mysore and there cannot be a doubt that had a popular leader arisen, Hyderbad would have been of sedition, but fortunately no one of rank, wealth and position could rise after the unsuccessful attempt on the Residency in July 1857, which was the culminating point of our troubles in Hyderabad". (Briggs, *The Nizam*, p. 86)

৩২. Hindu, *Native Fidelity...*, pp. 13, 58, 130

৩৩. Forrest, *History* ., Introduction, p. xxxvi

৩৪. Cunningham, H. S., *British India and its Rulers*, p. 162

৩৫. *Sepoy Mutiny*..., p. 277

৩৬. "Very few rebels cared for life or seemed to care to purchase it. The often courted death defiantly, like the Spartans" (*Theories of the Mutiny*, p. 83)

শব্দসূচি

—

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা

১৯৮৪